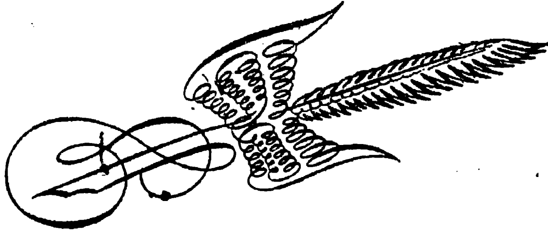
প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী : অন্নদা মুন্সী
অলংকরণ : সুবীর সেন

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬২

মুদ্রক : ক্ষীরোদ চন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭



সূচীপত্র

এই লেখকের

উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়
ছায়া মানবী
অগ্নিরথের সারথি
একালিনী নায়িকা
কালো রাত
কান্নাহাসির দোলা

ছোটগল্প

নির্জন গৃহকোণে
যথাপূর্বং
সেই মেয়েটি
বনহরিণী
চন্দ্রমল্লিকা

অনুবাদ

রেজর্স এজ
মাদার রাশিয়া
ওয়ান ওয়ার্লড
বিপ্লবী যৌবন
অন্ধকার দিন
ডোরিয়ান গ্রের ছবি
আর্চবিশপের মৃত্যু
ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী
রোমান হলিডে

জীবনী

জর্জ বার্নাড শ
অসকার ওয়াইলড
বিশ্বসাহিত্যের লেখক

উৎসর্গ

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বন্ধুবরেষু

মুখবন্ধ

এই সংকলন গ্রন্থটিতে বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠগল্প সংযোজিত হল। বলাবাহুল্য এই গল্প সংকলনের একুশটি গল্প ভিন্ন আরো প্রচুর শ্রেষ্ঠগল্প আছে এবং সেইসব গল্পগুলির প্রতিটি সমগ্র বিশ্বের গল্প সাহিত্যের পথচিহ্ন হিসাবে গৃহীত হতে পারে। এই গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড মাত্র। এই জাতীয় আরো গল্পের সংকলন সবশুদ্ধ পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশ করার সংকল্প আছে।

এই গল্পগুলি নির্বাচনে যে সব বিখ্যাত বিদেশীগল্প ইতিপূর্বে অনেকবার বাংলায় অনূদিত হয়েছে তা যথাসম্ভব বর্জন করার চেষ্টা করেছি। এমন কয়েকজন লেখকের গল্প এই খণ্ডে আছে যাঁদের রচনা বাংলায় অনূদিত হয়নি। গল্পগুলি নির্বাচনে গল্পের সর্বজনীন আবেদনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, বিষয় বৈচিত্র্য এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতার জন্যও কিছু গল্প নির্বাচিত হয়েছে।

গ্রন্থটির পরিকল্পনায় এবং সম্পাদনার ব্যাপারে মৌচাক সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার নানাবিধ মূল্যবান পরামর্শ দানে সহযোগীতা করেছেন তজ্জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, এ ছাড়া যে সব বন্ধুবান্ধব আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

১. আঁরি রেণে আলবেয়র গী ছ মঁপাসা (১৮৫০-১৮৯৩)

মঁপাসার জীবন সংক্ষিপ্ত এবং বিয়োগান্ত, তথাপি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীর ছোটগল্পের আঙ্গিকে এবং উপজীব্যে যে বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে তার আংশিক কৃতিত্ব এই ফরাসী মনীষীর। বাল্যকাল থেকেই মঁপাসার লেখক হওয়ার বাসনা ছিল, এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার সযত্নে তাঁকে গল্প রচনায় কলাকৌশলে দীক্ষিত করেন। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার বাস্তব উপন্যাস রচয়িতাদের পুরোধা। মঁপাসার রচিত দুখানি উপন্যাস *Une Vie* (১৮৮৩) এবং *Pierre and Jean* (১৮৮৮) দীর্ঘ কাহিনীর ক্ষেত্রে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচায়ক। মঁপাসার জীবনের শেষ দুটি বছর বড়ই কষ্টকর, হতাশা, ব্যাধি এবং আংশিক উন্মাদরোগ তাঁকে পীড়িত করে। ৪৩ বছর বয়সে প্যারিসের এক বেসরকারী আরোগ্যশালায় দেহাবসান হয়।

২. আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪)

জাঁকোস আনাতোল থিব 'আনাতোল ফ্রাঁস' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর লেখকজীবনের গোড়ার দিকে এই নামই তাঁর আসল নাম হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রাঁসের জন্ম প্যারিসে এবং এই শহরের আশেপাশেই জীবন কাটিয়েছেন! তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মত ছিল উদারনীতিক। তাঁর সবচেয়ে প্রখ্যাত গ্রন্থাবলী হল *Red Lily, Thais, Penguin Island* ইত্যাদি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী উপন্যাসিক হিসাবে আনাতোল ফ্রাঁসের স্বীকৃতি ছিল। তিনি ফ্রেঞ্চ আকাদেমীর সদস্য ছিলেন এবং ১৯২১-এ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

৩. এন্টন শেখভ (১৮৬০-১৯০৪)

শেখভ একজন প্রাক্তন-দাসের (Serf) সন্তান, তাঁর জন্ম টাগান রোগ শহরে। মস্কৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রি লাভ করার পর শেখভ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প পাঠাতে লাগলেন এবং তাঁর প্রথম ছোটগল্পের বই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ হল এবং কালক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-গল্প লেখকদের অন্যতম হিসাবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করলেন। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় সুগভীর মানবিকতাবোধ, সুনিপুণ শ্লেষ এবং দার্শনিকের সংশয়।

৪. লিও টলষ্টয় (১৮২৮-১৯১০)

ককেস্সে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় টলষ্টয় সর্বপ্রথম গল্প রচনা সুরু করেন। ক্রিমিয়ান ওয়ারে তিনি যোগদান করেন এবং পরে সেণ্ট পিটসবার্গে বসবাস করেন। মানবসমাজ সম্পর্কে আশাভঙ্গের যে হতাশা তা টলষ্টয়ের রচনায় সুস্পষ্ট। অসংখ্য গল্প তিনি রচনা করেছেন। তিনি মহৎ উপন্যাস এবং গল্প রচনার সময় কিষানদের লেখাপড়া শেখানোর কাজও করেছেন। টলষ্টয়ের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মজীবন তাঁর সাহিত্যজীবনকে কিঞ্চিৎ ম্লান করে দিলেও কালের মাপকাঠিতে লিও টলষ্টয় অমরত্ব লাভ করেছেন।

৫. ম্যাকসিম গোর্কী (১৮৬৮-১৯৩৬)

প্রকৃত নাম আলেকসী ম্যাকসিমোভিচ পেসকফ্। বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্যের জনক। অনাথ বালক। শ্রমিক ও কৃষক সম্পর্কিত তাঁর কাহিনীগুলি প্রকাশ মাত্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রুশ বিপ্লবের আগেই তাঁর খ্যাতি য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। গোর্কীর প্রথম জীবন সারা রাশিয়া পর্যটনে কেটে যায়—ন' বছর বয়স থেকেই তিনি অনেক রকমের কাজ করেছেন এবং লোভাতুরের মত যা পেয়েছেন পড়েছেন। বাউণ্ডুলের মত এই পর্যটনের অভিজ্ঞতা তার ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও আত্মজীবনীকে প্রচুর বিষয়বস্তু দান করেছে। গর্কী প্রথম জীবনে যে শ্রেণীর সামাজিক ব্রাত্যদের দেখেছেন তাদের কথাই লিখেছেন। গর্কীর ছোটগল্প এবং উপন্যাস বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, পৃথিবীর সর্বত্র। ১৯৩৬-এ ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। ‘পতিতা’ গল্পটিতে গর্কীর সহানুভূতিশীল মনের নূতন পরিচয় পাওয়া যায়।

৬. গ্যাব্রিয়েল দ্য' আনুনৎসিও (১৮৫৩--১৯৩৮)

দ্য' আনুনৎসিও কবি ও উপন্যাসলেখক হিসাবে খ্যাত, ইতালীর আড্রিয়াটিকে জন্ম। তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ ১৮৭৯-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতেই প্রতিভার পরিচয় ছিল। কিন্তু জোরালো ভাষা ও ধ্রুপদী গদ্যর জন্য সৈনিক কবি দ্য' আনুনৎসিও'র খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 'ক্যানডিয়ার মৃত্যু' গল্পটির মধ্যে এক দরিদ্র-রমণীর জীবন সংগ্রামের বিয়োগান্তকাহিনী পাওয়া যায়।

৭. কত্যেল মেনডিস (১৮৪১-১৯০৯)

মেনডিস বোর্দো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কবি হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং পারনাসিয়ানদের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তিনি সব রকম লিখতে পারতেন। তবে উপন্যাস, নাটক এবং ছোটগল্পেই তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধি। তাঁর রচনার মধ্যে একটা আশ্চর্য অলৌকিকত্ব আছে। 'হারানো তারা' গল্পটির মেনডিসের বিস্ময়কর রচনাশৈলীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই গল্পের মধ্যে আঙ্গিক ও পরিবেশনভঙ্গী লক্ষ্য করার বস্তু।

৮. সমরসেট মম (১৮৭৪-)

প্যারিসে ১৮৭৪-এ জন্ম। প্রথমে ক্যাণ্টারবেরি ও পরে হাইডেলবার্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে নাট্যকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *Liza of Lambeth* ১৮৯৪-এ রচিত। সমরসেট মমের ছোট উপন্যাসগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর অনেকগুলি গল্প বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠগল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত। সমরসেট মমকে এ যুগের মঁপাশা বলা হয়। তাঁর গল্পকথনের ভঙ্গী অনন্যসাধারণ। সমরসেট মমের 'রেজর্স এজ', "অফ হিউম্যান বণ্ডেজ", "মুন অ্যাণ্ড সিকস্‌পেন্স" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৯. জঁা পল সারত্রে (১৯০৫-)

জন্ম প্যারিসে। পিতা নৌ-বিভাগের কর্মী। বাল্যে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে মাতামহের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিক্ষা। স্নাতক হয়ে সমসাময়িক জার্মান দর্শন সম্পর্কে গবেষণার জন্য জার্মানীতে গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে অধ্যাপনা সুরু করেন ফ্রান্সে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক হয়ে ম্যাজিনো

লাইনে প্রতিরক্ষা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ থেকে সর্বতোভাবে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ আমেরিকা ভ্রমণ। *Les Temps Modernes* পত্রিকা সম্পাদনা করেন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তারও অনেক আগে ১৯৩৮-এ প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেই উপন্যাসের নাম 'লা নসে'—এই উপন্যাসে যে দর্শনের বীজ বপন করা হয়েছে তার নাম *L' existentialism*—বা অস্তিত্ববাদ। ১৯৬৪-তে নোবেল প্রাইজের জন্য নির্বাচিত হয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের নাম সাঁ জিনে এবং আত্মজীবনীর নাম দি ওয়ার্ডস।

১০. **ষ্টিফেন ক্রেন** (১৮৭১-১৯০০)

নিউইয়র্কের নিউ জারসি অঞ্চলে জন্ম। উপন্যাস লেখক, গল্প রচয়িতা সাংবাদিক ও কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। লাকায়েত কলেজ ও সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ম্যাগি' (পথের মেয়ে)-বাস্তব ভিত্তিক। ষ্টিফেন ক্রেন কিন্তু খ্যাতির শিখরে উঠলেন আমেরিকার সিভিল ওয়ারের পটভূমিকায় রচিত "দি রেড ব্যাজ অব কারেজ" গ্রন্থটির জন্য। এরপর তিনি যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসাবে গ্রীক-তুর্ক এবং স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধে প্রেরিত হন। 'ওপেন বোট অ্যাণ্ড আদার টেলস' তাঁর বাস্তবধর্মী গল্পের সংকলন। তাঁর রচনায় বৈপরীত্য এবং প্রতীকের সমন্বয় ঘটেছে। দেশে পারিবারিক জীবনের অসঙ্গত সমালোচনায় উত্যক্ত হয়ে জীবনের শেষ কয়েক বছর ইংলণ্ডে কাটান, মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে জার্মানীতে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়।

১১. **নরম্যান মেইলর**

নিউ জারসীর লং বীচে জন্ম এবং ব্রুকলিনে মানুষ। হার্ভাডের স্নাতক হওয়ার পর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম গল্প *The Greatest Thing in the World*—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে *Story Magazine* পুরস্কার লাভ করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নেকেড এ্যাণ্ড দি ডেড' তাঁকে সমকালীন মার্কিন লেখকদের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে। তাঁর *Barbary Shore* ও *Deer Park* গ্রন্থ দুটিও খ্যাতিলাভ করেছে। বর্তমানে নিউইয়র্কে বাস করেন। 'নগ্ন ও মৃত' মূল কাহিনীর সংক্ষেপিত অনুবাদ।

১২. মিখাইল জোসচেংকো (জন্ম ১৮৯৫—)

সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে লাল ফৌজে যোগদান করেন, সেই সময় আহত হন। পরে কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হন। বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকারের অনেক উচ্চপদে কাজ করেন, যথা ডাইরেক্টর অব পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস থেকে শশক পালন। শেষ পর্যন্ত একমাত্র সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ছোটগল্প শ্লেষাত্মক এবং সোভিয়েটতন্ত্রের সমালোচনামূলক। সোভিয়েট আমলাতন্ত্রের সমালোচনামূলক ব্যঙ্গরচনার অপরাধেই স্তালিন আমলে এই লেখককে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

১৩. আয়ান ম্যাকলীন হান্টার

প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা করেন। পরে চিত্রনাট্যকার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'রোমান হলিডে' রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পুরষ্কার লাভ করেছে। এই গল্পটি ছায়াচিত্রে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে হলিউডে বাস করেন।

১৪. জেমস জোনস

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটির জন্য' ন্যাশান্যাল বুক এওয়ার্ড লাভ করেন। জেমস জোনস ইলিনয়ের রবিন্সন শহরে বাস করেন, সেখানেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ। এই সংকলনের গল্পটি মূলকাহিনীর সংক্ষেপিত অনুবাদ।

১৫. ও' হেনরী (১৮৬২-১৯১০)

উইলিয়ম সিডনী পোর্টার ছদ্মনাম ও' হেনরী হিসাবেই খ্যাত। নর্থ ক্যারোলিনার গ্রীনসবরোয় জন্ম, এবং ন্যু ইয়র্কে মৃত্যু। টেক্সাসের সংবাদপত্রের লেখক হিসাবে সাহিত্যকর্ম সুরু। দক্ষিণ ও পশ্চিমের পটভূমিতে প্রথম দিকের গল্পগুলি রচিত, কিন্তু পরবর্তী জীবনে যে নাগরিক জীবনের পরিমণ্ডলে দিন যাপন করেছেন সাহিত্যে তাই রূপায়িত হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, আঙ্গিক ও রচনাশৈলীতে ও' হেনরী মঁপাসার সমধর্মী তাই তাঁকে 'আমেরিক্যান মঁপাসা' বলে উল্লেখ করা হয়।

১৬. আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯ ১৯৬১)

জন্ম সিকাগোর এক মধ্যবিত্ত পল্লী ইলিনয়ের ওক পার্কে। বাবা ছিলেন ডাক্তার ও শিকার-বিলাসী। এ যুগের লেখকের মধ্যে হেমিংওয়ে

একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই কথাই তাঁর সাহিত্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানুষের এই নৃশংস বর্বরতার ছবি তিনি রূপায়িত করেছেন। এমিলি জোলার মত তাই হেমিংওয়ে সম্পর্কে সমালোচকদের অনুযোগ তিনি বড় খোলাখুলি বলেন। ডি, এচ, লরেন্সের দেখা পৃথিবী আর হেমিংওয়ের দেখা পৃথিবী একই রকম। *The old man and the Sea* (১৯৫৭) গ্রন্থটির জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন এবং ১৯৬১তে আত্মহত্যা করেন।

১৭. **আলবার্তো মোরাভিয়া** (১৯০৭—)

রোমে জন্ম, পিতা ছিলেন স্থপতি। নয় থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত নিরন্তর রোগ ভোগ করেছেন। বাল্যকালেই ফরাসী, জার্মান এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯২৫-এ প্রথম উপন্যাস রচনা কালে তিনি বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে লণ্ডনে ও প্যারিসে কাজ করতেন 'লা ষ্টাম্পা' ও 'লা গেজেটা ডেল পপ্পলো' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে। ফ্যাসিবাদের প্রতাপে মোরাভিয়ার অনেক গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়। তখন তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। ইতালী যখন জার্মান অধিকৃত তখন তিনি পাহাড়ে আত্মগোপন করেন এবং ১৯৪৪-এ অবতরণ করেন। বর্তমানে তিনি রোমের কাপ্রি দ্বীপে বাস করেন। ইতালীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকার হিসাবে স্বীকৃত।

১৮. **প্যাণ্টালেমন রোমানফ** (১৮৮৪-১৯৩৬)

রুশ বিপ্লবের কালে যে সব গল্পলেখক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন রোমানফ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম দিকের ছবি পাওয়া যায়। বর্তমান গল্পটি 'অন দি ভলগা' নামক গল্প সংকলন থেকে গৃহীত।

১৯. **ওয়ালটার কফ্‌মান** (১৯২৪—)

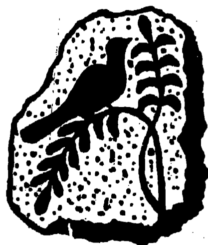
শৈশবে হিটলারের বন্দীশালায় জনক-জননীর জীবনাবসানের পর, তিনি কোনোক্রমে অষ্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে যান এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। এখন পূর্বজার্মানীর অধিবাসী। সৈনিক ডকশ্রমিক, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছেন। যে গল্পটি এই সংকলনে সংগৃহীত সেটি তাঁর জীবনের প্রথম রচনা এবং বাস্তবভিত্তিক।

২০. আলবেয়র কামু (১৯১৩-১৯৬০

আলজিয়ার্সের মাণ্ডোভাই অঞ্চলে শ্রমিক পরিবারে জন্ম। পিতা ফরাসী, মাতা স্প্যানিস। চার বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে বাল্যকালে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৩৭-এ কর্মজীবনে প্রবেশ। ১৯৪৫-এ প্যারিসে মুক্তিফৌজ টহলদারী বাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধের সময় *Combat* পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। নোবেলপুরস্কার প্রাপ্তি ১৯৫৯। ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে মোটর দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসে নাটক রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গেই যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। সুস্থ হওয়ার মুখে সুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আলজিরিয়া থেকে ফ্রান্সে গিয়ে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন, পারীর পতনের পর আবার আলজিরিয়ায় ফিরে স্কুল মাষ্টারি করেন। সমকালীন সাহিত্যে আলবেয়র কামু এক বিরাট বিস্ময়। মাত্র সাতচল্লিশ বছরের জীবনে বিশ্বসাহিত্যে এমন সুগভীর আলোড়ন আর কোনো লেখক সৃষ্টি করতে পারেন নি।

২১. উইলিয়ম সারোয়ান (১৯১৮—)

কালিফোর্নিয়ায় আর্মেনিয়ান পরিবারে জন্ম। ছোটগল্প ও নাটক লেখক হিসাবে প্রখ্যাত। গল্পগুলির মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য সব লেখকের সঙ্গে স্বতন্ত্র। সংক্ষিপ্ত বাক্যে এবং ইঙ্গিতে তিনি গল্পের কাঠামো গড়ে তোলেন। সরসতার সঙ্গে সুগভীর শ্লেষ তাঁর রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে *The Daring Youngman on the Flying Trapeze, Inhale and Exhale, The Human Comedy* প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।



বিশ্ব সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ গল্প



গী দ্য মঁপাসা

মৌলিক যন্ত্রণা

ফুলের মরশুম, বাগিচায় বসন্তের আনন্দ উজ্জ্বল উপস্থিতি সুস্পষ্ট। দুজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বাগানে পদচারণা করছিলেন। দু'জনেই ছেলেবেলার বন্ধু। একজন ক্যাবিনেট সদস্য, অপরজন সেনেটের সভ্য। এঁরা দুজনেই সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী, বাস্তবভাবী এবং চিন্তাশীল।

আলোচনা চলছিল সমকালীন রাজনীতি নিয়ে। সে আলোচনায় এতটুকু কল্পনা নেই। বেশ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টা হয়ে উঠল নিছক ব্যক্তিগত এবং যুক্তিতর্কের চেয়ে সেটাই বেশী আকর্ষনীয় মনে হোল। কথায় কথায় উভয়ে ফেলে আসা সোনালি দিনের স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হলেন। বসন্তের মধুর বাতাসে দুই আত্মবিভোর প্রাণী নীরবে বেড়াতে থাকেন।

প্রাচীরগাত্রে নানা রঙের ফুল, মৃদু সৌরভে ভরপুর। পাশেই একটি ফোটা ফুলের সৌরভ বসন্তের দখিনা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে—মন্ত্রীমহোদয় প্রাণভরে গ্রহণ করলেন পুষ্প-পরাগ, মুখ তুলে তাকালেন সেই ফোটা ফুলের দিকে, যেন নিবিড় বেদনায় ঝরে পড়ছে।

তিনি বললেন,—"দেখো, এই পুংকেশরগুলি শত যোজন উড়ে গিয়ে নবীন প্রাণের সঞ্চার করবে—সিক্ত করবে স্ত্রীকেশরকে, উন্মেষিত হবে নবাংকুর। ছোটো একটা বীজ থেকে জাগবে অংকুর। আমাদের মত মরণশীল ওরা—আবার আমাদের মতই জন্ম দিয়ে যায় উত্তরসাধকের।" বুকভরে ঘ্রাণ নিলেন তিনি, 'দেখ, গাছটা কি অদ্ভুত। ও নিষ্ক্রিয় হয়ে সৃষ্টি করে—আর বংশধরদের ত্যাগ করছে নিরাসক্ত ভাবে, তাদের সম্বন্ধে ওর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।"

আমরাও তো তাই করি।

"তা বটে, মানুষও মাঝে মাঝে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে যায় তার শিশুসন্তানকে, কিন্তু প্রভেদ কোথায় জানো, মানুষ সে কাজ সজ্ঞানে করে।"

"না, আমি তা বলিনি। মানুষের সমাজে এমন শিশু কি নেই যাদের জন্মকোষ্ঠিতে পিতৃপরিচয় উল্লিখিত নয়। তাদের জন্ম হয় অবহেলায়! তাদের জনকের সঙ্গে এই গাছটার কোথায় তফাৎ? তুমি কি নিশ্চয় করে বলতে পারো, আঠারো থেকে চল্লিশের মধ্যে যত রমণীর সংস্পর্শে এসেছ, অন্ধকামনার আবেগে যৌন-উপভোগ করেছ, সেই সব অবৈধ সংসর্গের একটাও ফলবতী হয়নি? কে জানে তোমারই সৃষ্টি কোনো হতভাগা হয়ত জেলে পচ্ছে, চুরি করা আর ছুরিমারা তার পেশা, অথবা তোমারই মেয়ে, অন্ধকারে কোন চোরা-গলিতে দাঁড়িয়ে তার দেহবিপনীর খরিদ্দারকে আহ্বান জানাচ্ছে। আর যদি নেহাত কপালগুণে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কেউ তাকে বাঁচিয়ে থাকে, তাহলে হয়ত—কোথাও রাঁধুণীগিরি করে কোনো রকমে দিন কাটায়। মনে রেখো, পথের মেয়েদের অমন একটা দুটো ছেলেমেয়ে থাকে যাদের পিতৃ-পরিচয় নেই। দশ থেকে কুড়ি ফ্রাঁর বিনিময়ে যৌন-বিহারের ফল ওই অনাথ শিশুগুলো, এই অবাঞ্ছিতের দল হল কারবারের লোকসানের দিক। জানো, কে জন্ম দিয়েছে ওদের? আমরা সবাই—ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত, সভ্য ও সৎ নাগরিকবৃন্দ। এইসব যত ভিখিরি আর পকেটমার দেখতে পাও, সমাজের যত নোংরা জঞ্জাল, এরা আমাদেরই সন্তান।

এমনই এক লেলিহান কামনার ইতিহাস কাঁটার মত বিঁধছে আমার বিবেককে। আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছে একটা স্মৃতির দংশন। তার চেয়েও জঘন্য একটা সন্দেহ, একটা অনিশ্চয়তা আমাকে সর্বদা দহন করছে। এর সমাধান কোনোদিনই করতে পারবো না।

আমার বয়স তখন বছর পঁচিশ হবে। আমি আর আমার এক বন্ধু ঠিক করেছিলাম পায়ে হেঁটে দেশ দেখবো। স্থির হল ব্রিটানীতে যাবো। আমার সেই বন্ধুটি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

পনের কুড়ি দিন ধরে আমরা কোাৎ দ্যু নোর্দ আর ফিনিস্তারের এখানে সেখানে পরমানন্দে বেড়ালাম। তারপর এলাম দ্যু নানেজ। তখন মার্চ মাস। সেখান থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার সময় পৌছলাম অন্তরীপের কাছাকাছি,

ত্রিপালিস—সমুদ্র যেখানে তরঙ্গে উত্তাল। আমরা একটা গ্রামে রাত কাটালুম। কি যেন নামটা—।

পরদিন সকালে বন্ধুটি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলো না, সারাদেহে তার অসহ্য ক্লান্তি। বিছানা কথাটা অবশ্য নিতান্ত অভ্যাসের বশেই উচ্চারণ করছি, খড়ের আঁটি বিছিয়ে আমরা শুয়েছিলাম। ওভাবে ঐখানে জ্বরে পড়ে থাকা অসম্ভব জেনে আমি তাকে টেনে তুললাম, তারপর কোনোক্রমে বিকাল চারটে নাগাদ আদিয়ানে পৌছলাম, পরের দিন আমার বন্ধুটি একটু সুস্থ বোধকরায় আবার আমরা পথে নামলাম। কিন্তু দুপুরের আগেই ও আবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। অতিকষ্টে আমরা শেষে "পন্ত্-লাবিতে" এসে উঠলাম।

ভাগ্যক্রমে একটা পান্থ-নিবাস পেয়ে গেলাম। বন্ধুকে বিছানায় শুইয়ে কুইম্পার থেকে ডাক্তার আনতে পাঠালাম, ডাক্তার এসে বললেন জ্বর খুব বেড়েছে, কিন্তু তিনি রোগটা ঠিকমত ধরতে পারলেন না।

পন্ত্-লাবিতে গেছ কখনও? যাওনি? জায়গাটাকে ব্রিটানীর উপনিবেশ বলা যায়! ওদের চাল চলন, আচার ব্যবহারে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সবটুকু এখনও অটুট রয়েছে। এতটুকুও বদলায়নি।

• আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজো প্রতি বছরই আমি সেখানে যাই।

সেখানে একটা প্রাচীন দুর্গ আছে তার স্তম্ভমূলে হ্রদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বিরাট গভীর হ্রদ—কালো জল, তাকালে কেমন ভয় ভয় করে। হ্রদের উপর ভোরবেলা বুনো হাঁসেরা ভীড় করে। শহরটার পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলছে, ঐ হ্রদটা থেকেই বেরিয়েছে নদীটা। পথঘাট—বাড়ীগুলো পুরোনো, ছোটো, মধ্যযুগীয় ধারায় তৈরী। লোকগুলো এখনও মাথায় বিরাট লম্বাটুপি চাপায়, গায়ে সূঁচের সূক্ষ্মকাজ করা ফতুয়া। গোটা চারেক জামা গায়ে দেয়, একটার উপর আর একটা, একেবারে নীচেরটা আধহাত চওড়া, কাঁধ পর্যন্ত একটা পট্টি; আর সবার উপর একটা খাটো মেরজাই। মেয়েরা সবাই বেশ সুন্দর আর গোলগাল। তাদের বুকের উপর কষে বাঁধা শক্ত কাপড়ের চোলি—জামার প্রবল পীড়নে সমুন্নত বক্ষের নিটোল গঠনের আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। মাথার সাজ আরো অদ্ভুত। কানের দুপাশ দিয়ে দুটো কাজকরা পট্টি জড়ানো। চুলগুলো টান করে পেছনে আঁচড়ানো। কাঁধের ওপর থেকে

সেগুলো ঘুরিয়ে এনে মাথায় চূড়া করে বাঁধা, আর তাতে আবার সোনা রূপোর চিরুণী আঁটা।

হোটেলের পরিচারিকার বয়স বছর আঠার হবে। ওর চোখ দুটি হালকা নীল আকাশের মত—দুটো কালো বিন্দুর মত দুই আঁখিতারা।

—সুগভীর মর্মস্পর্শী দৃষ্টি। হাসিভরা মুখে সুষম দাঁতের সূক্ষ্ম সারি—দেখে মনে হয় পাথরেও কামড় বসাতে পারে। একবর্ণও ফরাসী জানত না, মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন ছিল তার নিজস্ব ব্রিটানী ভাষা।

এদিকে আমার বন্ধুটির সেরে উঠার কোন লক্ষণই নেই। ঘোরাঘুরি দূরে থাক, ডাক্তার বলে গেলেন পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে। কাজে কাজেই রোগশয্যার পাশে আমার দিন কাটতে লাগল। পরিচারিকাটি যখন তখন আসে যায়, কখনও আমার খাবার নিয়ে, কখনো রোগীর পথ্য হাতে করে।

প্রায়ই ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাসা করতাম ; মনে হতো না বিরক্ত হয়েছে! কিন্তু, আমরা কেউই কথা বলতে পারতাম না, দুজনের কেউ কারো ভাষা জানি না যে।

সেদিন অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম। বন্ধু ঘুমিয়ে পড়লে উঠে নিজের ঘরে ঘুমাতে যাচ্ছি—ঠিক আমার দরজার সামনেই তার সঙ্গে দেখা, সে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল! অকস্মাৎ, কি করছি কিছু না ভেবেই, রসিকতার ভঙ্গীতে দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। বেচারীর বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই আমার ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজাটা বেশ করে বন্ধ করে দিলাম! বিস্মিত, ভীতি বিহ্বল চোখে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর গলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছে—কিন্তু এতটুকু শব্দও বেরোচ্ছেনা। একটা কেলেংকারীর আতংক ওর গলা চেপে ধরেছে যা জানাজানি হলে মালিক ওকে দূর করে দেবে। তার চেয়েও বেশী শাস্তি—হয়ত ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবে। প্রথমটা খেলার খেয়ালে শুরু হলেও বন্ধ ঘরে তাকে একলা পেয়ে অন্ধকামনার তাড়নায় আত্মহারা হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে আমরা ধ্বস্তাধস্তি করতে লাগলাম, যেন দুই কুস্তিগীর। আঁচড়ে কামড়ে-ছিঁড়ে উভয়ে লড়াই করছি। দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঘেমে উঠেছি দুজনে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা কামোন্মত্ত পশুশক্তির বিরুদ্ধে তার এই প্রচণ্ড প্রতিরোধ। মাঝে মাঝে টেবিল, চেয়ারে কিংবা দেয়ালে ধাক্কা লাগছিল। আওয়াজে পাছে কারো ঘুম ভেঙ্গে

যায়—এই ভয়ে তুইজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়া চড়া বন্ধ করে ফেলি। এই ক্ষণিক বিরতির পর আবার সুরু হয় আমাদের সেই বিরামবিহীন সংগ্রাম।—আমার পুনরাক্রমণ আর তার আত্মরক্ষা। তারপর ক্রমে ওর দম ফুরিয়ে এল, নিঃশেষে শক্তিক্ষয় করে নিস্পন্দ দেহে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। আর বাধা দিতে পারল না।

সময় থমকে থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য, পাশবিকতার উদ্দাম উন্মাদনায় তখন আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েই সে ছুটে পালিয়ে গেল। এর পরের কয়েক-দিন তার দেখাই পেলাম না। আমাকে আর কাছে ঘেঁষতেই দেয় না সে। আমার বন্ধু ইতিমধ্যে সেরে উঠল। ঠিক করলাম, আর নয়, পরের দিন সকালেই চলে যাবো।

সেদিন মাঝরাতে আমাকে নীরবে অনুসরণ করে সে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। নগ্ন পা—গায়ে স্লিপিং গাউন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে, তুহাতে আমাকে টেনে নিল সবল আলিঙ্গনে। সারারাত ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। আমার ভাষা জানে না—শুধু চোখের জলে মনের কথা বোঝাতে চায়। মধুরা রমণীর পক্ষে যেমনটি সম্ভব সেইভাবে আমাকে সে পরিচর্যা করেছে। আর ভোরের আলোয় দেখেছি তার সুগভীর ব্যথাভরা তুটি চোখের জল। সেই আমাদের শেষ দেখা।

ঘটনাটি ভুলে যেতে অবশ্য আমার বেশী সময় লাগেনি। তাছাড়া পথে বেরোলে ওরকম তুটো একটা তুচ্ছ ব্যাপার ঘটেই থাকে। আর হোটেলের দাসীরা অতিথিদের পরিচর্যা করবে—এটা একরকম স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরা যায়।

এরপর তিরিশ বছর কেটে গেছে। পন্ত্‌লাবিতে এর মধ্যে আর যাইনি—ভুলে গেছি একেবারে। সেবার ১৮৭৬ সালে ব্রিটানীতে যেতে হোল; আমার একটা থীসিস লেখার জন্য কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়েছিল। আবার এলাম সেই শহরে। দেখলাম, আশ্চর্য! কিছুই বদলায়নি। সেই পুরোনো তুর্গ—ধোঁয়াটে দেওয়ালগুলো ছুঁয়ে চলেছে সেই নীল ঢেউ; আর সেই পুরোনো সরাইখানায় একটু আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে মাত্র। আমি ঢুকতেই মিষ্টি চেহারার তুটি অষ্টাদশী ব্রিটানী তরুণী হাসিমুখে এগিয়ে এল—বুকে কাঁচুলী, মাথায় রূপোর কাঁটা, কানের পাশে রেশমী কাজ করা সেই রকম লম্বা ঝালর।

সন্ধ্যায় আমি ডিনারে বসলাম—ম্যানেজার তদারক করছিল। হঠাৎ দুর্বুদ্ধি হল, জিজ্ঞেস করলাম তাকে—পুরনো মালিকদের বিষয় কিছু জানো নাকি—মানে এর আগে যারা এখানে ছিল? বহুদিন আগে একবার এখানে দিনকয়েক কাটিয়েছি—সে প্রায় বছর তিরিশ হবে।

—তখন আমার বাবা মালিক ছিলেন, সে উত্তর দিল।

তারপর আমি তাকে বললাম—আমার বন্ধু অসুস্থ হওয়ায় আমাকে এখানে কিছুদিন থেকে যেতে হয়েছিল।

সে বলে উঠল—মনে পড়েছে আমার বয়স তখন ছোট, খোকা হবে। আপনি ছিলেন ঐ কোনের ঘরে—আর আপনার বন্ধু ঐ বড় ঘরটায়—সেই ঘরটায় এখন আমি থাকি।

তখনই সেই কিশোরী পরিচারিকার কথা আমার মনে জেগে উঠল। আমি প্রশ্ন করলাম তোমার বাবার আমলে যে মেয়েটি এখানে পরিচারিকার কাজ করতো তার কথা তোমার মনে আছে?—খুব ভাল মেয়ে, বড় বড় টানা চোখ আর সুন্দর দাঁত ছিল মেয়েটির।

সে জবাব দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ—প্রসব করার সময় সে মারা যায়।

উঠানে একটা রুক্ষ, রুগ্ন, খোঁড়া মজুর গোছের মানুষ—তার দিকে আঙুল দেখাল—ঐ তো তার ছেলে।

—আচ্ছা!—মায়ের মত মোটেই সুন্দর হয়নি—বরং বাপটার আকৃতি পেয়েছে বোধহয়—কি বল?—নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলাম।

—তা হবে। ম্যানেজারটা বললো,—কিন্তু, কোন শালা যে ওর বাপ কে জানে মশাই। কিছুতেই নাম বললো না বেচারী। ওর যে এমন কেউ আছে—তা কেউ কখনো টের পায়নি। যখন জানতে পারা গেল ওর ছেলে হবে, সবাই অবাক—প্রথমে তো কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি।

আমার মেরুদণ্ডে একটা হিমপ্রবাহ নেমে গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আমার শ্বাস বন্ধ করে দেয়। চাপা আতংকের পূর্বাভাষ আমাকে যেন যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভয়ার্ত চোখ তুলে উঠানের সেই লোকটার দিকে তাকালাম। দুহাতে দুটো বালতি নিয়ে খোঁড়া পাটাকে টেনে ঘোড়ার জন্য জল বইছে। একটা নোংরা ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়ানো—জট পাকানো একমাথা রুক্ষ চুল মুখের ওপর ঝুলে পড়ছে

ম্যানেজার বলে চলছে—ও হতভাগা কোনো কাজের নয়। আস্তাবলটায়

মত সহজ মানুষ হলে তবু ভাল হত। কিন্তু কি করবেন—মা বাপ নেই, চালচুলোও নেই। বাবা দয়া করে রেখেছিলেন ওকে, কিন্তু যাই হোক,—পেটের ছেলে তো আর নয়।

চুপ করে রইলাম, কোন উত্তর দিলাম না। সেই ঘরটায়, সেই চেনা বিছানায় শুয়ে সারারাত আর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারিনি। মনের গভীরে ভেসে উঠেছে ছেলেটার ছবি—আস্তাবল সাফ করছে দুহাতে। যন্ত্রণায় কাৎরেছি—ও যদি সত্যি আমারই ছেলে হয়? হয়ত আমিই ওর পিতা? আমিই ওর মাতৃহন্তা। কিছুতেই ভেবে শেষ করতে পারলাম না। অসম্ভব নয়, হয়ত নিশ্চয়ই তাই।

মনে মনে স্থির করলাম লোকটাকে পরদিন ডেকে ওর সঠিক বয়সটা জেনে নেব। কয়েকটা মাসের বাঁধাধরা হিসাব—তাহলেই তো গণ্ডগোল মিটে যায়। পরের দিন ডেকে পাঠালাম ছেলেটাকে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ঠিক ওর মায়ের অবস্থা—একটু ফরাসী বলতে পারে না। বোবার মত অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একেবারে নির্বোধ;—আমার হয়ে একজন পরিচারিকা তার বয়স জিজ্ঞাসা করলো—বলতে পারলে না নিজের বয়স। একটা জানোয়ারের মত ভঙ্গী করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো—কেবল ওর মোটা, শক্ত আঙুলের চাপে টুপিটাকে পাকাচ্ছে আর জড়িতস্বরে অর্থহীন কতকগুলো অস্ফুট আওয়াজ করছে। দেখতে চাইনি, তবু চোখে ধরা পড়ল, চোখে আর ঠোটের কোনে ওর মায়ের সেই হাসির আদল।

ম্যানেজার ওর জন্মসার্টিফিকেট খুঁজে নিয়ে এল। দেখা গেল এই হতভাগ্য জীবটি পৃথিবীর আলো দেখছে আমার পান্ত-লাবি ত্যাগের ঠিক আটমাস ছাব্বিশ দিন বাদে। কারণ আমার ঠিক মনে আছে আমি লোরিয়েঁ পৌছেচি পনেরই আগষ্ট তারিখে। সার্টিফিকেটে সুস্পষ্ট হরফে লেখা রয়েছে—"পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত; মায়ের নাম,—জেন কেরাদেক।"

আমার বুকের মধ্যে অশান্ত স্পন্দন সুরু হয়েছে, উত্তপ্ত রক্তের উচ্ছ্বাসে মুখে কথা নেই। নির্বাক বিস্ময়ে সেই পশুসদৃশ মানবের চোখে তাকিয়ে রইলাম। ওর জটপাকানো চুলগুলো আস্তাকুঁড়ের নোঙরা খড়গুলোর থেকেও যেন কুৎসিৎ মনে হচ্ছিল। অস্বস্তিতে চোখ নামাল সে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায়, একটু আপ্যায়নের ভঙ্গীতে হেসে ছেলেটা যেন পালিয়ে বাঁচলো।

সেদিন সারাবেলা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালাম। স্মৃতির বিবর্ণ পাতা

অনুশোচনার বেদনায় রক্তাক্ত করে ফেললাম। কিন্তু হায়! কি হবে শুধু ভেবে—ভেবে কোন ফল নেই। ভাল মন্দ প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় যুক্তির নিরিখে বিচার করি। আমিই ওর জনক—?—না আমি নয়? লাভ হল না কিছুই, সন্দেহের জালে আরও জড়িয়ে পড়তে হল। বার বার ফিরে আসতে হল সেই ভয়ংকর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। ক্রমশঃ একটা দৃঢ়বিশ্বাস মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল—এই হতভাগ্য প্রাণীই আমার ঔরসজাত সন্তান আমিই ওর জন্মদাতা পিতা।

সন্ধ্যায় খেতে পারলাম না কিছু। অরুচির গ্লানি বুক ঠেলে উঠতে লাগলো। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না চোখে। শেষরাতে একটু তন্দ্রা এসেছে সবে, এমন সময় দুঃস্বপ্নের আতংকে চীৎকার করে দুহাতে বুক চেপে উঠে বসলাম—ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। দেখলাম—জানোয়ারটা আমাকে আঙুল দেখিয়ে হাসছে দাঁত বার করে,—ডাকছে 'বাবা' বলে। তারপর হঠাৎ যেন একটা কুকুর হয়ে গেল, ছুটে এসে আমার পায়ের গোছটা সজোরে কামড়ে ধরলো। আমি ছুটে পালালাম—ও ক্ষিপ্রগতিতে তাড়া করে আসছে—কিন্তু কুকুরের মত ডাকছে না—মানুষের ভাষায় চেঁচিয়ে আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এসে উপস্থিত হল। সেখানে সেনেটের সদস্যবৃন্দ আমার পিতৃত্বের বিচার করবার জন্য সমাসীন। তাদের মধ্যে একজন জোর গলায় বলে—"কোনো সন্দেহ নেই—কি রকম মিল দেখছো?"

আমি অন্তরে অনুভব করলাম—এই হতভাগা আমারই মত দেখতে। এই ধারণা আমার মনে গেঁথে গেল।

ঘুম ভেঙে যেতে অস্থির হয়ে পড়লাম—ওকে আবার দেখতে চাই—নিজের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণভরে দেখতে চাই।

রবিবার সকাল। গির্জার পথে ওর সঙ্গে দেখা। পাঁচ ক্রাঁ ওর হাতে দিয়ে বেশ খুঁটিয়ে দেখলাম। টাকাটা হাতে নিয়ে মুখে অসহায়ের অক্ষম হাসি ফুটে ওঠে। আবার অস্বস্তিতে ছটফট করে—তারপর অস্পষ্ট কতকগুলো শব্দ বিড়বিড় করে বলতে বলতে দৌড়ে পালাল। হয়ত ধন্যবাদ জানাল। নিজের মনে মনে সেদিনটাও যন্ত্রণায় কাটালাম।

রাত্রে হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালাম। খুব সন্তর্পণে আমি

কৌশল করে নিস্পৃহ গলায় তাকে জানালাম যে ওই অনাথ ছেলেটার উপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। ওর জন্য কিছু একটা করতে চাই।

ম্যানেজার উপদেশ দিল—ওর জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না মশাই, লাভ তো হবেই না, বরং আপনারই হাঙ্গামা বাড়বে। আমাদের এখানে দুমুঠো খেয়ে আস্তাবলেই একধারে পড়ে থাকে। ওই কাজই ওর পোষায়। ওর বেশী আর কিই বা খরচ ওর? পুরোনো জামা প্যাৎলুন থাকে তো একটা বরং দিতে পারেন—তবে হতভাগা দুদিনেই তা কুটি কুটি করে ফেলবে।

আমি আর কিছু বল্লাম না, একটু ভেবে দেখি। খানিক পরে হতভাগাটা মদে চুর হয়ে ফিরে এল। আরেকটু হলেই আস্তাবলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সে গোলমাল মিটলে পর কোদাল দিয়ে একটা খুঁটি খুলে দিল। তারপর খোলা উঠানে একগলা কাদায় শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার দেওয়া টাকায় ওর এই উপকার হল।

পরেরদিন ম্যানেজার এসে অনুরোধ করল ওকে আর টাকাকড়ি না দিতে। মদের নেশায় ও পাগল হয়ে যায় আর পকেটে পয়সা থাকলে মদ খাবেই। সে বলল—যদি ওকে একেবারে মেরে ফেলতে না চান, তাহলে ওকে আর পয়সা কড়ি কিছু দেবে না দয়া করে।

লোকটা জীবনে পয়সা পায়নি—যদি বা কেউ কখনও দয়া করে কিছু ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে সেটা নিয়ে সটান সরাবখানায় ঢুকে পড়া ছাড়া আর কিছু ওর মাথায় আসে না।

ঘরে ফিরে আমি একটা বই খুলে বসলাম। পড়ার ভাণই করছি শুধু—একটা লাইনও পড়তে পারি না। কেবল দেখছি ওই পশুটাকে—আমার ছেলে—আমার নিজের ছেলে। খুঁজছি ওর মাঝে আমার সাদৃশ্য। শেষে দেখতে দেখতে মনে হল কপালের রেখায় যেন মিল রয়েছে। ওর আর আমার মধ্যে যেন অনেক অদৃশ্য সাদৃশ্য ঢাকা পড়ে রয়েছে ওর জট পাকানো নোঙরা চুল আর ময়লা পোষাকের অন্তরালে।

আর বেশীদিন থাকতে পারলাম না। লোকের মনে হয়ত সন্দেহ জাগবে। তাই ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত মনে। আসার সময় ম্যানেজারের কাছে কিছু টাকা জমা রেখে বলে এলাম সে টাকা যেন এই অনাথ ছেলেটার কল্যাণে ব্যয় করা হয়। গত ছ'বছর ধরে এই এক চিন্তা নিশিদিন আমার মনকে

বিষিয়ে তুলেছে, এই সর্বনাশা অনিশ্চয়তা, এই নিদারুণ সমস্যায় আমি নিপীড়িত। প্রতি বছর, দুর্নিবার আবেগের টানে ফিরে যাই সেই পঙ্কিল বস্তিতে। বসে বসে দেখি জন্তুর মত ও আস্তাকুঁড়ে কাজ করছে, দেখি আর নিষ্ফল চেষ্টা করি ওর প্রয়োজনে লাগবার। এ ভাবেই আজও প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। প্রতিবার ফিরে আসি মনে গভীরতর সংশয়ের যন্ত্রণা নিয়ে। আমার দুঃখের বোঝা আরও বেড়ে যায়। মনে নিদারুণ অবসাদ নেমে আসে।

চেষ্টা করেছি ওকে লেখাপড়া শেখাবার। কিন্তু আশ্চর্য নির্বোধ লোকটা। চেষ্টা করেছি ওর পরিশ্রমের মাত্রা কমাতে, ফলে ওর মদের মাত্রা বেড়ে গেছে। কিন্তু ওর গোবরভরা মাথায় একটা বুদ্ধি বেশ খেলেছে—নতুন পোষাক দিলে সেগুলো বেচে কি করে মদের পয়সা জোগানো যায় তা ওকে শেখাতে হয় নি। ওর মনিবকে ঘুষ দিয়েছি যাতে করে ও গালাগাল কম খায়! যাতে ওর একটু যত্ন নেয়। আমার এত চেষ্টায় শেষটায় ম্যানেজার বেশ অবাক হয়ে গেল। সে বললে—ওর যতই ভাল করতে যাবেন ততই আরও খারাপ হবে। ওকে ঠাণ্ডা রাখতে গেলে কয়েদির মত রাখা ছাড়া উপায় নেই। হাতে কাজ থাকলে ঠিক থাকে, আরামে বসে থাকলে মাথায় বেশী দুর্বুদ্ধি চাপে, আপনি পুণ্য অর্জন করতে চান, ভাল কথা, দেশে দুঃস্থ অনাথের অভাব আছে নাকি? এমন কাউকে সাহায্য করুন, যে আপনার সৎকর্মের মর্যাদা বুঝবে।

কিই বা উত্তর দেব? আমার মনে নিরন্তর যে সন্দেহ দোলা দিচ্ছে যদি ঘুণাক্ষরেও এরা তার আভাস পায়, তাহলে আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের মতলব বের করবে। আমাকে পথে বসাবে। আমার পিছনে বাবা [illegible] বলে লোক দেখিয়ে চেঁচাবে—ঠিক স্বপ্নে যেমন দেখেছিলুম!

শুধু নিজের উপর ঘৃণা হয়। আমিই ওর মাকে হত্যা করেছি। আমিই তো অপরিণত প্রাণীটার এই সর্বনাশের মূল, এই নরকের কীটটার আবর্জনায় জন্ম, আস্তাকুঁড়ে বেড়ে উঠেছে। যদি ওর জন্ম হত আর পাঁচজনের মত, আর সকলের মতই সহজ ভাবে মানুষ হত। ওর এই অস্বাভাবিক, অসামাজিক জন্মই হয়ত ওর মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক!

তুমি ধারণাও করতে পারবে না, কি অদ্ভুত, কি অসহনীয় অনুভূতি আমার মনে জাগে যখন ওর দিকে চেয়ে ভাবি আমিই জন্মদাতা, পিতা আর

পুত্রের অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ বন্ধনে ও আমার সঙ্গে জড়িত। বংশক্রমের অনিবার্য সূত্রে, রক্তে ও মাংসে, নানারূপে ও আমারই এক প্রতিলিপি মাত্র। ওর শরীরের কোষে কোষে আমারই দেহাশ্রিত রোগের জীবাণু। ওর শিরায় শিরায় আমারই প্রথম যৌবনের সেই উন্মাদ কামনার প্রতিধ্বনি।

ওকে চোখে চোখে রাখবার একটা দুর্দমনীয় বিকৃত বাসনায় আমার মনটা লোভাতুর হয়ে ওঠে। অথচ ওকে দেখলেই বুকের ভিতরটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়।

জানালা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকি ওর দিকে—ও আপন মনে কোদাল চালায়,—সার তোলে, গাড়ী বোঝাই করে, আমি আপন মনে বলি—ঐ আমার খোকা—সোনা আমার—আমার বুকের মানিক।

মাঝে মাঝে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে দুহাতে ওকে বুকে টেনে নেবার অদম্য বাসনায় ব্যাকুল হই, তবু ওকে একবারও স্পর্শ করিনি, কিছুতেই ছুঁতে পারিনি।'

শিক্ষাবিদ্ এইবার থামলেন।

তাঁর রাজনীতিজ্ঞ বন্ধু মন্ত্রীমহোদয় মৃদুস্বরে বললেন—হুঁ, অনাথশিশুদের জন্য আমাদের আরো একটা কিছু পরিকল্পনা করা উচিত।

বাসন্তী বাতাসে মাধবীবিতান দুলে উঠল—একরাশ হলুদ রেণু উড়ে এসে তাঁদের মুখ চোখ ভরিয়ে দেয়।

রাজনীতিজ্ঞ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন—

এইসব সত্ত্বেও কিন্তু বলব—পঁচিশের সেই বসন্ত দিনগুলি বড় মধুর।



আনাতোল ফ্রাঁস

আঁদ্রে

ডাক্তার ত্রেভিয়েরকে তুমি তো চিনতে। তাঁর উজ্জ্বল প্রকাণ্ড মুখখানা এবং সেই আশ্চর্য চাউনি নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। তাঁর হাত এবং মন সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসকেরই উপযুক্ত ছিল। কঠিন অবস্থার মধ্যেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা সেকালে সকলেই করত। অপারেশন্ থিয়েটারে একদিন তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচার করছিলেন ; অর্ধেক অপারেশন্ শেষ না হতেই রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল—গা ঠাণ্ডা, দেহে রক্ত চলাচলের লেশমাত্র আভাষ পাওয়া যায় না—ক্রমে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। তখন ত্রেভিয়ের তাকে দুই হাতে তুলে নিলেন, নিজের বুকের সঙ্গে তার বুক ঠেকিয়ে তার সেই রক্তাক্ত দেহে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন। তারপর তিনি আবার ছুরি ধরলেন এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সুদক্ষভাবে সেই অস্ত্রোপচার শেষ করলেন। রোগীর দেহে আবার স্বাভাবিক রক্ত চলাচল শুরু হল—রোগীটি সে যাত্রা বেঁচে গেল। অস্ত্রোপচারের পোষাক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রেভিয়ের্ আবার সেই সরল, সহজ সাধারণ মানুষ !

তাঁর উঁচু গলার দরাজ হাসি সবার ভালো লাগত। আমি যে অপারেশনের কথা বললাম, তার কয়েকমাস পরেই একটা অস্ত্রোপচারের পরে ছুরি পরিষ্কার করার সময় তাঁর হাতে সামান্য একটু খোঁচা লাগল। এ সম্বন্ধে তখনই কোনো ব্যবস্থা না করায় সেই দুষ্টক্ষতের বীজাণু দেহে ঢুকল আর দু দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর—স্ত্রী ও একটি শিশু রেখে গেলেন।

আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে সেই সময় প্রতিদিনই বুলয়'র বাগানে ফারগাছের নীচে শোকের কালো পোষাকে একটি তরুণীকে দেখা যেত—তিনি লেস্ বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে চোখ নীচু হয়ে তাকিয়ে থাকতেন একটি শিশুর দিকে, শিশুটি তার সব খেলার সরঞ্জাম, কোদাল, ঠেলাগাড়ি আর ছোট ছোট মাটির ঢেলার মাঝখানে হামা দেয়। এই তরুণীটি মাদাম্ ত্রেভিয়ের্।

রবিরশ্মি তার উষ্ণ, পাণ্ডুর মুখের ওপর স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিত, দেহ ও অন্তরের পরিপূর্ণতার প্রাচুর্য কালো চোখের ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ত। সস্নেহ দৃষ্টিতে শিশুটির লাল চুল আর নীল চোখের দিকে সে চেয়ে থাকত—এ যেন তার পরলোকগত স্বামীরই প্রতিচ্ছবি!

শিশুটি মোটাসোটা, গোলাপের মত গায়ের রং। কিন্তু সে যতই বড় হতে থাকে, ততই তার শরীর রোগা হতে থাকে—গাল দুটি রক্তহীন হয়ে কেমন লাল্‌চে দাগে ভ'রে গেল।

জননী চিন্তিত হলেন। মাঝে মাঝে যখন সে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে মা যেখানে বসে লেস্ বুনছেন তার কাছাকাছি এসে পড়ত, মা তখন তাকে সেই অবস্থায় ধ'রে ফেলতেন এবং উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে ভ্রূ কুঁচকে তার রক্তহীন মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়তেন। রাত্রিতে সামান্য একটু শব্দ হলেই বিছানা থেকে খালি পায়ে উঠে গিয়ে ছোট্ট খাটখানার উপর ঝুঁকে পড়ে ছেলের দিকে মা তাকিয়ে থাকতেন।

মাদাম ত্রেভিয়েরের স্বামীর পুরাণো বন্ধু ডাক্তাররা তাঁকে বললেন ভয়ের তেমন কারণ নেই। শিশুটি একটু বেশী দুর্বল। হাওয়া বদলের জন্য ওকে কোন ফাঁকা জায়গায় কিছুদিন রাখা দরকার।

মাদাম্ ত্রেভিয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে গেলেন ব্রল্‌এ। তুমি তো জানই যে ত্রেভিয়ের ছিল চাষীর ঘরের ছেলে এবং বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুল থেকে ফেরার পথে সে মার্ল পাখীর বাসা খুঁজে বেড়াত।

ধোঁয়ায় অন্ধকার খাবার ঘরটির কড়িকাঠ থেকে শূয়োরের ঠ্যাং ঝুলছে—সেখানেই পরস্পরের সম্ভাষণ বিনিময় হ'ল। ত্রেভিয়ের গিন্নী চিমনীর পাশে বসে রান্না করতে করতে পারী নগরীবাসিনী এই পুত্রবধূ ও তার আয়াটির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন। কিন্তু বাচ্ছা নাতিটিকে তাঁর ছেলের শিশুবয়সের অবিকল প্রতিকৃতি বলে মনে হ'ল। নাতি আঁদ্রেকে বৃদ্ধ ত্রেভিয়ের

দেখে খুবই খুশি হলেন। রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই আঁদ্রে ঠাকুরদাকে বিদায় চুম্বন দিয়ে ঠাকুরদার হাঁটুর উপর সোজা হ'য়ে ব'সে তাঁর গালে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে—দাদু, তোমার গাল ভাঙ্গা কেন?

—আমার দাঁত নেই ব'লে—

—কেন তোমার দাঁত নেই?

—আমার দাঁতগুলো কালো হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই একদিন ক্ষেতে ছড়িয়ে দিয়েছি—দেখি আবার সেগুলো সাদা হয়ে গজায় কিনা!—

শুনে আঁদ্রে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। ঠাকুরদার গাল আর তার মায়ের গাল একেবারে আলাদা ধরণের!

শহরবাসিনী পুত্রবধূ আর তার ছেলেকে বাড়ীর সব চাইতে ভালো ঘরখানা দেওয়া হ'ল। এই ঘরে ত্রেভিয়ের দম্পতীর বিয়ের খাট রাখা ছিল, তাঁরা একবার মাত্র এই খাটে শুয়েছিলেন; আর ছিল কাপড় চোপড়ে ঠাসা এক্ কাঠের একটি চাবি বন্ধ বড় আলমারী। যে ছোট্ট খাটখানা আগে এ বাড়ীর শিশুদের শোবার জন্য ব্যবহার করা হত, ঘরের এক নির্জন কোণে, যেখানে তাকের উপরে চাটনী, আচার প্রভৃতির পাত্র সাজিয়ে রাখা আছে, তার নীচে পেতে দেওয়া হ'ল। মাদাম্ ত্রেভিয়ের নিপুণা গৃহিনীর মত নিজে দেখবার জন্য বার বার ওপরে উঠে অনুসন্ধান ক'রে দেখতে লাগলেন—তাঁর পায়ের চাপে দেবদারু কাঠের তক্তা মচ্‌মচ্ করতে লাগল; কাপড় রাখবার জন্য একটি আলনাও কিন্তু সেইখানে খুঁজে পেলেন না।

কড়ি বরগা দেওয়া ছাদের ভিতরের দিকটা এবং দেয়াল চুণ দিয়ে শাদা রং করে দেওয়া হয়েছিল। যে সব রঙীন ছবিতে ঘরখানা সাজানো, মাদাম ত্রেভিয়েরের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না; কিন্তু খাটখানার উপরের দিকে খোদাই করা একটি চিত্র-ফলক তাঁর নজরে পড়ল। কতকগুলি শাদা পাজামা আর কালো পোষাকপরা শিশু, হাতে মোমবাতি, সার বেঁধে সবাই একটি গম্ভীর ধরণের গির্জায় প্রবেশ করছে। ছবিখানার নীচে খোদাই করে লেখা—"নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমি এই বিজ্ঞাপন দিলাম যে পিয়ের আজেনর্ [illegible] [illegible]লের গির্জায় সমবেত মাস প্রার্থনার জন্য সর্বপ্রথম আনা হয়েছিল [illegible] ১৫ই মে। [illegible] পাদরী গঁতিয়ের।"

বিধবা মাদাম্ ব্রেভিয়ের পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন,—বুদ্ধিমতী, শুদ্ধচিত্ত রমণীর দীর্ঘনিশ্বাস—প্রেমাশ্রুর মত জগতের এক অমূল্য সম্পদ। যাকে ভালোবাসা যায় তার নাকি কখনও মৃত্যু ঘটে না। প্রেম মৃত্যুহীন।

শোবার সময় আঁদ্রের পোষাক খুলে দিয়ে তাকে বললেন—'এস, এখন উপাসনা করি', তখন আঁদ্রে ধীরে ধীরে বলল—'তোমাকে আমি ভালোবাসি।' এইভাবে বালিশে মাথা রেখে দুই হাত মুঠা করে সে শান্তমনে শুয়ে পড়ল।

ভোর বেলা জেগে উঠে আঁদ্রে পিছনের উঠানের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল—আবিষ্ট হয়ে সে দেখতে লাগল মুরগী, গরু, ঘোড়া আর শুয়োর। সব চেয়ে তার ভালো লাগল শুয়োরটিকে আর তার এই ভালোলাগা দিনের পর দিন বেড়ে চলে। খাবার সময় তাকে অনেক কষ্টে গায়ে খড়-কুটো আর গোবর লাগান অবস্থায় ধ'রে আনা হত। চুল মাকড়সার জালে ভরা, জুতায় কাদা-গোবর মাখান, হাত দু'খানি নোংরা, হাঁটু ছড়ে যাওয়া, গাল দুটি লাল, মুখ বেশ খুশি খুশি, হাসি ভরা!

মা রাগ করে বলতেন—'আমার কাছে এস না, ক্ষুদে দৈত্য কোথাকার!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদরের আর সীমা থাকত না। টেবিলের সামনে ছোট টুলের উপর ব'সে সে যখন মুরগীর পায়ের বড় হাড় কামড়াত, তখন মনে হত যেন একটি শিশু হারকিউলিস্ তার গদা কামড়ে খাচ্ছে। সে একমনে খেয়ে যেত, আর মাঝে মাঝে আগড়োম বাগড়োম বকতে থাকত।

—'আচ্ছা, মা, সবুজ মুরগী কাকে বলে?'

মা ধীরে ধীরে উত্তর দেন—'বোধ হয় টিয়াপাখীকে।' এমনই করে আঁদ্রে তার ঠাকুরদার হাঁসগুলোর টিয়াপাখী হিসাবে নামকরণ করত; আর সে কোনটাকে কি বলত কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু কোনো কিছু তাকে বললে তা সে সহজে মেনে নিত না।

—'মা, জান, দাদুভাই আমাকে কি বলেছে? বলেছে যে মুরগীগুলোই নাকি ডিম দেয়। আমি কিন্তু জানি তা নয়। বাগানের ঐ ফলের গাছগুলোতে ডিম হয় আর সেগুলো মুরগীর কাছে তা দেওয়ার জন্য ধরে এনে দেয়। তুমি তো জান, মা, মুরগীর তো আর হাত নেই যে ডিম তৈরী করবে!'

এই ভাবে আঁদ্রে প্রকৃতির সব কিছু তন্ন তন্ন ক'রে বুঝতে থাকে। মায়ের সঙ্গে বাড়ী বেড়াতে বেড়াতে তার মনের ভাব অনেকটা রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মত

হয়ে যায়। একদিন তার মা রাস্তার পাশে ওক্ গাছের নীচে বসে যখন লেস বুনছিলেন তখন আঁদ্রে বেশ একটা বড় ছুঁচো দেখতে পেল। ছুঁচোটা প্রাণভয়ে সরে পড়েছিল। মা চীৎকার করে বললেন—'আঁদ্রে, এদিকে এসো—ঐ দেখ গাছের উপরে চেয়ে।' সে চেয়ে দেখল একটি কাঠবিড়াল ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মা ঠিকই বলেছিলেন—জীবন্ত কাঠ বিড়াল মরা ছুঁচোর চেয়ে ঢের ভালো দেখতে। কিন্তু সেটা চট ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল। আঁদ্রে মাকে জিজ্ঞাসা করল ওদের কি ডানা আছে।

ঠিক এই সময় পথ দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল তার বেশ পুরুষালি চেহারা, মুখে সাদাসিধে লাল্‌চে দাড়ি। লোকটি মাথা থেকে টুপি খুলে মাদাম ত্রেভিয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—সুপ্রভাত, ভালো আছেন? আপনার সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল! এটি আপনার ছেলে বুঝি? ভারি শান্তশিষ্ট ছেলে তো! আমি শুনেছি আপনি ত্রেভিয়ের কর্তা মশায়ের বাড়ীতে আছেন, মাফ করবেন, আমি ওঁদের বহুদিন ধরেই জানি।

—আমরা এখানে এসেছি কারণ আমার এই ছেলেটির একটু খোলা জায়গায় থাকা দরকার। কিন্তু আপনি? আমার মনে পড়ে আমার স্বামী যখন বেঁচেছিলেন, তখন আপনি এদিকেই কোথাও থাকতেন—না?

তরুণী বিধবার কথা শেষ হবার পর লোকটি গভীর সমবেদনার সুরে বলল—মাদাম্, আমি সব জানি' আর সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে গভীর শোকের ভঙ্গীতে মাথাটি ঈষৎ নত করে—তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলতে থাকে—

—সে সব কী আনন্দের দিনই ছিল! তখন সব লোকজন ছিল কত চমৎকার —সবাই এখন একে একে চলে গেছে! এটা এখানকার অধিবাসীদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। শুধু আমি এখনও রয়েছি চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে— বারবিজ অঞ্চলের সবাই আমাকে তাই বলেই জানে। আমিও তাদের সকলকেই জানি—এরা সবাই লোক ভালো।

—আপনার ছবি আঁকা কি রকম চলছে?

—আমার ছবি?...একা একা যতটুকু হয় কিছু কিছু করছি।

এমন সময় আঁদ্রে উভয়ের মাঝখানে এসে হাজির হ'ল।

—'মা, মা একটা বড় পাথরের নীচে অনেকগুলি ঈশ্বরের [illegible] রয়েছে—প্রায় একলাখ হবে, সত্যি বলছি মা।'

মা রূঢ় ভাবে ধমক দিলেন—চুপ কর বাঁদর ছেলে,—যাও খেলা কর গিয়ে।

শিল্পীদের সেই বন্ধু পরম উৎসাহে মধুর গলায় এইবার বলতে লাগল—এভাবে পুনরায় দেখা হওয়া কী আনন্দের! বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন সুন্দরী মাদাম্ ত্রেভিয়্যের কেমন আছেন। আমি তাদের জানাব যে আপনি আজো সেই সুন্দরী মাদাম্ ত্রেভিয়্যেরই আছেন—এখন বরং অনেক বেশী সুন্দরী হয়েছেন। তা হলে আসি, নমস্কার।

সু প্র ভা ত—

আঁদ্রে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল—মা, সব জীবই কি ঈশ্বরের তৈরী?—আচ্ছা, শয়তানের তৈরী কি কোনো জীব নেই? তুমি কথার জবাব দিচ্ছ না কেন মা?

সে মায়ের ঘাঘরা ধ'রে টানতে লাগল—মা তাকে বল্লেন,—আঁদ্রে, যখন আমি কারো সঙ্গে কথা বলি, তখন তার মাঝে এসে কথা বলতে নেই। বুঝেছ?

কেন?

কারণ তার নাম অসভ্যতা।

আঁদ্রের চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল এসে জমেছিল—কিন্তু মায়ের চুমো আর আদরে তার মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। এইভাবে আরও একটি আনন্দের দিন কাটে। ভিজে আকাশের বুকে রবিরশ্মির খেলা গ্রামে চমৎকার দেখা যায়, মন খুশীতে ভরে ওঠে।

এর কয়েকদিন পরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—সেইদিন মঁসিয়ে লাসেল গাম্-বুট প'রে এসে তরুণী বিধবার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল।

—নমস্কার, মাদাম! কর্তামশাই আগের মতই বেশ শক্ত ও সুস্থ আছেন আশা করি!

—দেহ ভাল,—কিন্তু পা যেন আর আগের মত চলছে না।

—আর কর্ত্রীঠাকরুণ? সর্বদাই রান্নাবান্না নিয়ে আছেন! আপান তো সুপ্ রান্না করতে ভালবাসেন—এমন রান্নাও আর হয় না!

এইসব ঘরোয়া কথাবার্তায় কর্ত্রী হাসতে লাগলেন—আর তাঁর রেখাঙ্কিত কপালের নীচে চোখের মণি যেন কাঁপতে লাগল।

আঁদ্রেকে দুই হাঁটুর উপর বসিয়ে লাসেল্ তার গাল টিপতে লাগল—কিন্তু সে উঠে গিয়ে তার দাদুভাইটির কোলের উপর বসে পড়ল।

—দাদু, তুমি হলে ঘোড়া আর আমি ঘোড় সওয়ার। জোরসে চলো—হট্ হট্—।

এই সময় লাসেল্ আর বিধবা মাদাম ত্রেভিয়ের দুজনের মধ্যে দুই চারিটি কথা হ'ল—তার মধ্যেই দুজনের কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল—গ্রীষ্মকালের উষ্ণ রাত্রিতে যেন আকাশ আর ধরণীর মাঝখানে বিদ্যুতের জ্বালা।

পরে, শ্বশুরকে হাল্কা সুরে তরুণী জিজ্ঞেস করল বাবা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে ?

—একে আমি শিশুকাল থেকেই জানি, আর এর বাপকে আমাদের এ দিকে সবাই চিনত? এরা সম্পন্ন গৃহস্থ। মঁসিয়ের কারখানায় ষাটজনের বেশী কারিকর কাজ করে।

এইবার উপযুক্ত সুযোগ বুঝে লোকটির সম্পর্কে আঁদ্রে তার মনোভাব প্রকাশ করল—ভদ্রলোকটি খুব খারাপ। মা তাড়াতাড়ি ধমক দিয়ে বললেন—এই রকম অসভ্যের মত কথা না ব'লে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

এরপর থেকে সব সময়েই পথে ঘাটে মাদাম ত্রেভিয়েরের সঙ্গে লাসেলের দেখা হতে লাগল। ইদানীং মাদাম ত্রেভিয়ের কেমন অশান্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—বাতাসে গাছের পাতার মরমর আওয়াজে চমকে ওঠেন। হাতের আধবোনা লেসের কাজ ফেলে রেখে দু'হাতের মাঝখানে মাথা রেখে কী যেন সব আকাশপাতাল চিন্তা করেন।

শরৎকালের এক সন্ধ্যায় সমুদ্রে ঝড় উঠ্ল এবং প্রচণ্ড গর্জনে বাড়িঘর কাঁপিয়ে সারা দেশময় সেই ঝড় ছড়িয়ে পড়ে। তরুণী মাদাম ত্রেভিয়ের আয়াকে ডেকে চিমনীতে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে আঁদ্রেকে শুইয়ে দিতে গেলেন। ছেলেকে যখন গরম মোজা পরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন ঝড়ের প্রচণ্ড আওয়াজ আর কাচের জানালার ওপর বৃষ্টির জলতরঙ্গ শুনে সে মায়ের কাঁধের ওপর মুখ রেখে দুই হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বলল—

—মা, আমার কেমন ভয় করছে।

মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বললেন—ভয় কী সোনামণি,

ঘুমিয়ে পড়ো। তারপর অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে একখানি পুরাতন চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন।

পড়তে পড়তে তাঁর মুখ রক্তিম হয়ে উঠে; বুক থেকে একটা উষ্ণ নিশ্বস বেরিয়ে আসে। পড়া শেষ হলে তিনি ইজি চেয়ারটায় চুপ করে প'ড়ে রইলেন। হাত দু'খানি অসাড়, নিশ্চল—সমস্ত দেহমন যেন কী এক স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। ভাবতে লাগলেন—লোকটি আমাকে কত ভালবাসে। কত সৎ, কত সরল, কত মহৎ! শীতের রাত এভাবে একা একা কাটান ভারী কঠিন। —ওঁর ব্যবহার কী নম্র, বিনীত!—যেভাবে প্রেম নিবেদন করেছেন—ত থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় লোকটির হৃদয় কত উদার!'

তারপর চোখ পড়ে মৃত স্বামী পিয়ের ত্রেভিয়েরকে গির্জায় নিয়ে যাওয়ায় সেই খোদাই করা বিজ্ঞপ্তিতে—

'নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি যে—পিয়ের আজেনরর ত্রেভিয়ের·········'

সে মাথা নীচু ক'রে। আবার নতুন ক'রে ভাবতে থাকে—

• একজন নারী একা একা একটি ছেলেকে কখনই মানুষ করে তুলতে পারে না। প্রয়োজন আর এক বলিষ্ঠ বাহুর। আঁদ্রে তবু একটি নতুন বাপ পাবে।

—মা

বিছানা থেকে এই ডাকটি শুনে জননী শিউরে উঠলেন।

—আঁদ্রে, আজ রাতে তুমি বড় বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছ।

—আমি একটা কথা ভাবছিলাম মা।

—না ঘুমিয়ে কেবল তোমার ভাবনা! কী ভাবছিলে?

—আমার বাবা তো স্বর্গে গিয়েছেন,—না?

—হাঁ বাবা।

—আর ফিরে আসবেন না?

—না, সোনামনি। তিনি আর আসবেন না।

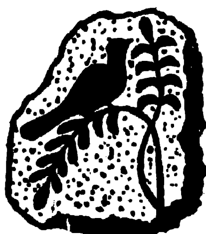
—তবে তিনি না ফিরে এলেও খুসী হবেন। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।

ঘুমন্ত পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে জননী অসহায় ভাবে দু হাতে মাথা চেপে ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। বাইরে দুরন্ত হাওয়ার মাতন। মাদাম ত্রেভিয়ের অনেক পরে উঠে দাঁড়িয়ে আঁদ্রের বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ঘুমাও সোনা! তোমার বাবা আর কোনোদিন ফিরবে না।

ফিরে কিন্তু এল এক নতুন বাবা। মঁসিয়ে লাসেলের মূর্তিতে নতুন পিতা। আঁদ্রে আবার ধীরে ধীরে সেই রকম শীর্ণ রক্তহীন হয়ে পড়ে। কোনো ব্যাপারেই তার আর সেই চাঞ্চল্য নেই। উৎসাহ নেই, সে মুহ্যমান।

শেষ পর্যন্ত আঁদ্রে অনেক সামলেছে। তবে আগে তার সমস্ত ভালোবাসা ছিল জননীর ওপর এখন সেই ভালোবাসা সব গিয়ে পড়েছে গভর্নেসের ওপর। তাকেই সে মার মত ভালোবাসে।

তবে আঁদ্রে জানে না যে গভর্নেসেরও এক গোপন প্রণয়ী আছে।





লিও টলস্টয়

দুঃখের দেওয়ালী

ধীবর পল্লীতে কালোছায়া নেমে এসেছে। ঘরের বাইরে বেশ নিবিড় অন্ধকার। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাসের শন্ শন্ আওয়াজ ঘরে বসে শোনা যায়। সমুদ্র থেকে এই প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া আসছে, তাই বাইরে এই দানবের তাণ্ডব। ঘরের ভেতরটা তেমন ঠাণ্ডা নয়। বেশ উষ্ণ আমেজ।

জেলেদের ঘরে ঘরে অগ্নিকুণ্ড বসানো আছে, তার ভেতর গন্ গন্ করছে আগুন। বিছানায় শুয়ে আছে, পাঁচ পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, আর জেলেগিন্নী বসে বসে জেলেনৌকার ছিঁড়ে যাওয়া পালে তালি দিচ্ছে। তকতকে করে নিকিয়ে রেখেছে ঘরদোর, চারদিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

জেলে সেই কখন ভোরবেলা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে এখনও ঘরে ফেরেনি মাছ ধরে। মাঝে মাঝে এমন হয়। ভয় করে জেলে-বউটার। সমুদ্রের মেজাজ কখন কেমন থাকে কে জানে।

অনেক দিনের পুরান ঘড়িটা কিন্তু চুপচাপ বসে নেই, ঘড়িতে ঠিক বেজে যাচ্ছে, দশটা-এগারোটা। এখনও জান্নার স্বামী কেন ফিরছেন না কে জানে। ভয় জাগে মনে।

জান্না মনে মনে ভাবে, ওদের অভাবের সংসার, তাই জেলেকে এত খাটতে হয়, নইলে এই জল ঝড় মাথায় করে কে তাকে বাইরে যেতে দিত। জেলে-নিজেও খাটে কম নয়, তবু দুবেলা আহারের জোগাড় হয় না। এতগুলি ছেলে মেয়ে, তাদের উপযুক্ত জামা কাপড় নেই, গরম নেই, ঠাণ্ডা নেই, সব সময় খালি পায়ে ছুটাছুটি করছে। এত কষ্ট তবু জান্না মুখ বুজে সব কাজ করে যায়। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে এইটাই বড় কথা। 'ঈশ্বর জেলেকে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরিয়ে দিন।'

ছেলেমেয়েরা খেতে পায়না ভালো করে। পরণের জন্য উপযুক্ত কাপড়-চোপড় নেই, তবু ঈশ্বরের করুণায় ওরা যে নীরোগ এই কি কম কথা। কিন্তু জেলে এখন কোথায় ঘুরছে কে জানে, সমুদ্রের কোন গভীরে গিয়ে পড়েছে হয়ত। উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠে জান্না।

রাত অনেক হল। জান্না উঠে দাঁড়ায় লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখে আকাশ কেমন, দুরন্ত সমুদ্র একটু শান্ত হল কিনা। এখান থেকে লাইট-হাউস দেখা যায়, সেখানে আলো জ্বলছে কিনা দেখার জন্য এগিয়ে গেল জান্না।

কোথাও কিছু নেই।

সমুদ্রের বুকে একটা কুটাও দেখা যাচ্ছে না।

সহসা জান্নার মনে পড়ে পাশের বাড়ির জেলে গিন্নীর কথা, সন্ধ্যার পর তাকে আর একবার দেখতে যাবে কথা দেওয়া ছিল, বেচারীর স্বামী নেই, দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটায়। কদিন ধরে অসুখে পড়েছে। সেই সময় দেখে এসেছে জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে।

জান্নার মনে হয় এখনই একবার দেখে আসা উচিত।

পাশের বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয় জান্না। সাড়াশব্দ নেই। দরজাটা ভেজান ছিল, একটু ঠেলতেই খুলে গেল।

ছোট্ট কুঁড়ে, আগুন জালিয়ে ঘর গরম করবে কে, তাই চারিদিকে ঠাণ্ডা কণকণে ভাব। প্রতিবেশিনীকে দেখার জন্য লণ্ঠনটা তুলে ধরে জান্না। একেবারে দোরগোড়ায় পড়ে আছে যেন একটা কাষ্ঠখণ্ড, নিস্পন্দ নীরব।

লণ্ঠনটা আরো এগিয়ে নিয়ে মুখটা ভাল করে দেখে জান্না। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে পড়েছে, একটা হাত বিছানা থেকে শূন্যে ঝুলছে।

অনেকক্ষণ মারা গেছে বেচারী। ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেঁদে মার কাছেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা যে তাদের আর নেই সেটুকু বোঝার শক্তি তাদের নেই। ওদের গায়ে একটা পুরাণো কাঁথা চাপা দেওয়া, মা হয়ত এই সময়টুকুই পেয়েছেন। গভীর ঘুমে ওরা অচৈতন্য।

জান্না আস্তে আস্তে ওদের তুলে নিয়ে নিজের গায়ের কাপড় দিয়ে চাপা দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়ে মশারিটা ফেলে দেয়। জান্নার মুখে এতটুকু রক্তের চিহ্ন নেই। সে কেমন শাদা হয়ে গেছে। ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। আবেগের মাথায় ওদের নিয়ে ত' এল, কিন্তু জেলে ঘরে ফিরলে কি বলে জবাবদিহি করবে। নিজেদেরই পাঁচটা, তার ওপর আবার এই দুটো। তাদেরই কি পেটপুরে খেতে দিই, এদের কি দেব। ভাবনা ও উদ্বেগে আকুল হয়ে নীরবে বিছানায় বসে রইল জান্না।

অনেক পরে বৃষ্টি থামল। আকাশটা থমথমে ভাব। তবে বাতাসের শন্‌শনানি এখনও কমেনি, সমুদ্র তখনও গর্জন করছে। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার মতো দরজা খুলে ঘরে ঢুকল—জেলে। দীর্ঘকায় বাদামী চেহারা। রোদে পুড়ে জলে ভিজে আকৃতিটা বেশ পোড় খাওয়া।

ঘরে ঢুকেই জেলে বলে ওঠে, 'আমি রে জান্না!'

জান্না খুসীতে ভরে উঠে জবাব দেয়—'ফিরলে! বাবা। যে ভয় করছিল আমার।' তারপর আর কথা বলতে সাহস হয়না জান্নার। জেলের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতেও তার ভয়।

জেলে আপন মনেই বলে চলে—'কি বেয়াড়া বর্ষা নেমেছে। শীতকালে এমন হলে কি করে আর কাজকাম চলবে! কিছুই নেই কপালে, তার ওপর জালটা ছিঁড়ে ফর্‌ফাঁই। বলি তোদের খাওয়া দাওয়া কিছু জুটেছে, না সারাদিন এমনই চুপচাপ বসে আছিস। কি করলি সারাদিন?

'আমি! আমি'—ভয়ে মুখটা ম্লান হয়ে যায় জান্নার, গলার স্বর শুখনো। এসব সামলে নিয়ে আবার বলে—'আমি, আমি আর কি করব। জালখানা মেরামত করলাম, পালটায় তালি দিলাম। ভারী ভাবনা ছিল, তোমার কথা খালি ভেবেছি আর কেঁদেছি।'

জান্না এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

একটু দম নিয়ে সাহস করে জান্না শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, 'জানো ওবাড়ির

গিন্নী আজ চোখ বুজিয়েছে। মুখ দেখে মনে হয় সহজে মরেনি। জ্বলে পুড়ে মরেছে। জানো ত' ওর দুটো ছেলেমেয়ে, তাদের দুঃখেই যেন ওর দম বন্ধ হয়ে গেছে।'

জান্না চুপ করে যায়।

জেলে কি যেন চিন্তা করে খানিকক্ষণ, তারপর বলে, 'তাহ'লে ওঠ ওদের ছেলেমেয়ে দুটো এখানে নিয়ে আয়। এভাবে একা একা ফেলে রাখা যায় না। আমাদের যা হয় করে ঠিক চলে যাবে।'

জান্না কিন্তু নীরব।

এতটুকু নড় চড় নেই।

জেলে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে 'কিরে! উঠছিস না কেন? নিয়ে আসতে কি ভরসা হচ্ছেনা। কি হয়েছে, জান্না, অমন করছিস্ কেন?'

মশারিটার একটা দিক তুলে ধরে জান্না।

কান্নাভরা কণ্ঠে জবাব দেয়—ওদের আমি অনেকক্ষণ নিয়ে এসেছি কেমন ঘুমিয়ে আছে দেখ।



আন্তন শেখভ

দর্পণের মুখ



আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে অনেকদিন পরে সেই ড্রয়িংরুমটায় ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতেই নাকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগ্‌ল। বাতি জ্বালাতেই কয়েকটা নানা সাইজের ইঁদুর এদিক ওদিকে ছুটে পালাল। এই ঘরখানায় গত একশো বছরেও বাতি জ্বালানো হয়নি। ঘরের ভেতর গিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করার সঙ্গে হাওয়ায় ঘরের একপাশে জড়ো করা একরাশ কাগজপত্র নড়ে উঠল। কাগজগুলি প্রাচীনকালের সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় চিত্রকলার কিছু বিগলিত অংশ। দেয়ালগাত্রে পূর্বপুরুষদের যে সব তৈলচিত্র টাঙানো আছে কালের নিষ্ঠুর স্পর্শে তা মলিন হয়ে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে যেন বিদ্রূপ ভরা ভঙ্গীতে বলছেন—কি হে দু চার ঘা খাবে নাকি!

আমাদের উপস্থিতিতে সেই পোড়ো ঘরখানা যেন সরগরম হয়ে উঠল। একবার একটু কাশতেই সারা ঘরটায় সেই আওয়াজ অনুরণিত হল। আমার পূর্ব পুরুষদের নীরব জিজ্ঞাসার উত্তর যেন প্রতিধ্বনিত হল।

ঝড়ো হাওয়ার দাপট কান্নার গোঙানির মত শোনায়, পাথরের দেয়াল চিমনির ভেতর থেকে কে যেন গভীর হতাশায় কেঁদে উঠছে। বৃষ্টি পড়ছে, সেই বৃষ্টির জল বন্ধ জানালার ওপর অন্ধকারে মাথা ঠুক্‌ছে। এ যেন কার সুগভীর আর্তনাদ।

আমার গলা দিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, পূর্ব-পুরুষদের আহ্বান জানিয়ে স্মরণ করলাম। যদি লিখ্‌তে পারতাম তাহলে হয়ত এই সব ছবিগুলি দেখে একটা সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করতাম, ওঁদের জীবনের ওপর দিয়ে কত না

কাহিনী, কত বৈচিত্র্যভরা ঘটনা ঘটেছে। যেমন আমার ঠানদিদির এই ছবিখানা। এই কুশ্রী আকৃতির রমণীকে নিয়েও একটা সরস কাহিনী শোনা যায়। ঠানদিদির পাশেই টাঙানো ছিল একাটা প্রকাণ্ড আরশি, সেইদিকে আমার স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লাম—দেখেছ, কেমন মজার আয়না। কালো মোটা ব্রোঞ্জের সুন্দর ফ্রেমে আঁটা একটি প্রাচীন আমলের আয়না।

এই আয়নাটার নাকি আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি। আমার ঠানদিদির মৃত্যু ঘটে শুধু এই আয়নার জন্য। অনেক টাকা দিয়ে আরশিটা কেনা হয়েছিল, আর কোনোদিন তিনি আয়নাখানা তাঁর কাছ থেকে সরাতে দেননি। দিন নেই রাত নেই, খালি ঐ আরশিটার দিকে চেয়ে আছেন, এমন কি খাওয়া দাওয়ার সময়ও নজর ঐ দিকে। তিনি যখন ঘুমাতে যেতেন তখন খাটের পাশে আয়নাখানা টাঙানো থাকত। আর তাঁর হুকুম ছিল মৃত্যুর পর কফিনে যেন আরশিটা দেওয়া হয়, হয়ত তাই করা হত, কিন্তু ঠানদিদির এই নির্দেশ পালন করা গেল না, কফিনের মধ্যে আয়নাটা ঢোকানো গেলনা। ঠাকুমার হুকুম শেষপর্যন্ত তাই আর পালন করা সম্ভব হলনা।

আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন—ঠানদিদির বুঝি খুব ছিম্‌ছাম্ থাকার বাতিক ছিল। প্রসাধনের খেয়াল অনেকের এমন থাকে!— হয়ত তাই, তবে আরো ত' আয়না ছিল, তবু এইটাকেই বা কেন এত ভলোবাসতেন। আরশির অভাব' কি এই বাড়িতে, তা নয়, এর ভেতর নিশ্চয়ই কোনো একটা অলৌকিক রহস্য ছিল। লোকে বলে এর ভেতর কোনো প্রেতাত্মা বাস করেন, আমার ঠানদিদির হয়ত এই সব দিকে আগ্রহ বেশী ছিল। কথাগুলি হয়ত নিছক গাল-গল্প, তবে আমার বিশ্বাস ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধা আরশিটার ভেতর অন্য কিছু রহস্য জড়ানো আছে।

আরশিটার গা থেকে ধুলো ময়লা সাফ করে সেদিকে নজর দিয়েই আমি অট্টহাস্য করে উঠলাম। আমার সেই হাসি সারা ঘরখানায় প্রতিধ্বনিত হল। আয়নাখানা সাধারণ ধরনের নয়। বাঁকা-চোরা। এমন ধরনের আয়না যে তাতে মুখ দেখলেই মনে হবে নাক-চোখ সব কেমন বেঁকে-চুরে-গেছে। আমারও নাকটা হেলে পড়েছে, একেবারে বাঁ গাল ঘেষে, চিবুকটা বেশ দুদিকে ভাগ করা, একটা পাশ কেমন নেমে গেছে। বিশ্রী কাণ্ড! বল্লাম ঠানদিদির আমার বলিহারী রুচি বলতে হবে।

আমার স্ত্রী অতিশয় দ্বিধাভরা মন নিয়ে ধীরে ধীরে আরশিটার দিকে

এগিয়ে গেলেন। তারপর সেই অয়নায় নিজের মুখখানি ভালো করে দেখলেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার। ঠিক সেই সময়টায় একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল। আমার স্ত্রীর-গায়ের রঙ কাগজের মত শাদা হয়ে গেল আর তাঁর দেহখানি থর থর করে কাঁপতে থাকে। তারপর তিনি একটা বিকট আওয়াজ করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে বাতিদানটা মাটিতে পড়ে গেল। বাতিটাও একেবারে নিভে গেল। সমস্ত ঘরখানা অন্ধকারে ভরে উঠল। তারপর একটা ভারী জিনিস মাটিতে পড়ার আওয়াজ, অর্থাৎ আমার স্ত্রীর পতন ও মূর্চ্ছা।

এদিকে বাইরে অশান্ত ঝড়ের সেই-আওয়াজ আরো নিদারুণ হয়ে উঠল, ইঁদুরগুলি অন্ধকারে সাহস পেয়ে এদিক-সেদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল, কাগজ-পত্রগুলিতে খস্‌খসে আওয়াজ-হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে জানলার খড়খড়ির খানিকটা খুলে গেল—আতংকে আমার প্রাণ উড়ে যায়। যাই হোক জানলার ফাঁকে এতক্ষণে চাঁদের আলোর মৃদু আভা দেখা গেল। ঝড় থেমে এসেছে।

আমি আমার স্ত্রীকে কোলে করে পুর্বপুরুষদের সেই ঘর থেকে কোনো-রকমে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্ত্রীর চৈতন্য ফিরে এল পরদিন সন্ধ্যায়।

যেই একটু চেতনা হয়েছে অমনি তিনি বলে উঠলেন—কই, আমার সেই আয়নাটা কোথায়? দাও শীগ্‌গীর,—আমার আয়না দাও বল্‌ছি।

তারপর সারা সপ্তাহ ধরে তাঁর মুখে আর কিছু রোচে না, চোখে ঘুম নেই, খালি সেই আবদার—আমার আরশি কই! আরশিটা দাও—'

শেষ পর্যন্ত কান্না সুরু করলেন। রাগে মাথার চুলগুলি টেনে ছিঁড়তে সুরু করলেন, বিছানায় ছটফট করতে থাকেন। ডাক্তার আমাকে বললেন যে উনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে কোনো মুহুর্তে হার্টফেল করতে পারেন, শরীরের অবস্থা বেশ আতংককর। আমি আর কি করি, ভয়কে জয় করে নীচের সেই ঘরে গিয়ে আমার ঠানদিদির আয়না নিয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম এবার আর তাঁর আনন্দ ধরে না, তারপর সেটা বুকে নিয়ে উন্মাদিনীর মত তাকে চুমা খেতে সুরু করলেন আর মাঝে মাঝে মুখটা দেখে নেন। দুটি চোখ বিস্ফারিত করে কি গভীর আগ্রহে যে তিনি আয়নায় মুখ দেখতে লাগলেন কি বল্‌ব।

তারপর দশ বছর কেটে গেছে। বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না। তিনি নিয়তই আয়নায় মুখ দেখছেন—এক মিনিটও সেটি কাছ ছাড়া করছেন না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে বলেন—এই কি আমি। কি আশ্চর্য! এই কি আমার চেহারা।

এই বলার সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে ওঠে একটা আনন্দের আভাষ। একটা নতুন উদ্দীপনা জেগে ওঠে। আবার বলেন—এইত আমি। সবাই মিথ্যাবাদী। এই আরশিটাই শুধু সত্য কথা বলে। যারা অনাত্মীয় তারা মিথ্যা বল্‌বে এ আর আশ্চর্য কি, আমার স্বামী পর্যন্ত মিথ্যাবাদী। হায়রে! আমি যদি আরো আগে এই আয়নাটা পেতাম। এইভাবে আপনাকে যদি আগে দেখতে পেতাম তাহলে কি আর অমন সৃষ্টিছাড়া মানুষটাকে নিয়ে ঘর বাঁধি। এই কি আমার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত মানুষ। আমার প্রকৃত স্বামী হওয়ার যিনি যোগ্য তিনি পরম রূপবান। তিনি হতেন বনেদী ঘরের মানুষ, শৌর্যে-বীর্যে গরীয়ান পুরুষ। এমন বীরপুরুষই ত' আমার গলায় মালা দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি!

একদিন আমার স্ত্রীর পিছনে বসে বসে এমনই প্রলাপ শুনছি। হঠাৎ নজরে এক অপরূপ মূর্তি ফুটে উঠল। সেই দিন সব রহস্যের সমাধান ঘটল। আরশির সেই গভীরে এক পরমাসুন্দরী রমনী। এমন আশ্চর্য ঐশ্বর্যময়ী রূপসী রমণী আর কখনো দেখিনি। রূপ ও লাবণ্যের কি অপূর্ব সমাবেশ, কি অপরূপ রূপ। কোন্ ইন্দ্রজালস্পর্শে আমার এই কুরূপা স্ত্রীটি এমন সুন্দরী হয়ে উঠলেন। এ কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাব?

উত্তর সহজেই মিলল। আয়নাটা বাঁকা। আর সেই অসমান আরশিতে আমার স্ত্রীর কুশ্রী মুখখানি সব দিক থেকে এমন মিলে মিশে গেছে যে তাঁর মুখের কুৎসিৎ অংশগুলির দোষ চাপা পড়ে গিয়ে তিনি এমন সুশ্রী হয়ে উঠেছেন। দুই আর দুয়ে চার হয়, এ অনেকটা সেই রকম। দুই না থাকে যদি তাহলে দুই আর বাড়ে না। এখন আমরা দুজনে আয়নায় তাকিয়ে বসে আছি। অদ্ভুত কৌশলে আমার সেই কুশ্রী স্ত্রী এমন লাবণ্যময়ী রমণীতে রূপান্তরিত আয়না থেকে মুখ আর সরাই না। এদিকে আমার নাকটা ঢলে পড়েছে বাঁ গালে, দাড়িটা দুফাঁক হয়ে দুদিকে হেলে গেছে, কিন্তু আমার স্ত্রী এই দর্পণে অপরূপা।

ভয়ে আতংকে আমি কুঁকড়ে গেছি।



ম্যাকসিম গোর্কি
পতিতা

আমার এক পরিচিত বন্ধুর কাছে কাহিনীটি শোনা, তিনি বলেছিলেন :

"আমি যখন মস্কৌ শহরে ছাত্রহিসাবে পড়াশোনা করি, তখন আমার বাসার ঠিক সামনেই এমন একজন স্ত্রীলোক থাকত যার স্বভাব চরিত্র সন্দেহজনক, জাতে পোলিস, আর তার নাম টেরেসা। লম্বা, শক্ত-সমর্থ, শনের রঙের চুল। ভ্রু দুটি বেশ কালো এবং ঘন। আর বেশ চওড়া প্রশস্ত মুখ, যেন কুড়ুল দিয়ে কুঁদে তৈরী, তার চোখের চাউনি পশুসুলভ, মোটা গভীর কণ্ঠস্বর। তার চলাফেরার ভঙ্গীটা যেন গাড়োয়ানদের মত। বাজারের মেছুনিদের মত এই পুরুষালি আকৃতি আমার মনে কেমন ভয় জাগিয়ে তুলত। আমি বাড়িটার চিলে কুঠুরীতে থাকতাম, সে থাকত ঠিক অপর দিকটায়। সে বাসায় আছে জানলে আমি আমার কামরার দরজা খোলা রাখতাম না, অবশ্য কদাচিৎ এই অবস্থা ঘটত। মাঝে মাঝে উঠানে বা সিঁড়িতে দেখা হয়ে যেত। তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসত, তা দেখে ওকে কেমন বিতৃষ্ণ মনে হত। মাঝে মাঝে ও একটু নেশা করত, তখন ওর চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল দেখাত, মাথার চুল এবং কাপড়-চোপড় বিস্রস্ত, আর বিশেষ করে হাসিটা অতি কুৎসিৎ। এই রকম অবস্থায় সে আমার চোখের পানে তাকিয়ে বলত—এই যে পড়ুয়া মশাই, কেমন আছো ?

তার এই বোকার মত হাসিটার জন্য তার ওপর আমার অশ্রদ্ধা আরো বেড়ে যেত। তার এই সান্নিধ্য এড়ানোর জন্য আমি বাসাবদল করতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু আমার ঘরটা ছিল অতিশয় চমৎকার, ঘর থেকে বাইরের দৃশ্যও

চমৎকার দেখা যেত, নীচের রাস্তাটাও বেশ শান্ত এবং নির্জন। তাই এইটু সয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

একদিন সকালে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছি, সেদিন আর ক্লাস করা গা নেই, কি করে কামাই করা যায় মনে মনে সেই অছিলা ভাব্‌ছি। এম সময় আমার দরজাটা খুলে গেল, এবং চৌকাঠের ওপাশ থেকে পোল-রমণী পুরুষালি পরুষ কণ্ঠ শোনা গেল—নমস্কার। পড়ুয়া মশাই!

আমি জান্‌তে চাইলাম—কি দরকার তোমার?

লক্ষ্য করলাম, ওর মুখের ভাব বিহ্বলতায় ভরা, কেমন একটা কাকুতি ভাব সেই মুখে। ওর পক্ষে এই ভঙ্গিমা একটু অসাধারণ বটে।

সে বল্‌ল—পড়ুয়া মশাই, দয়া করে আমার একটা উপকার করতে হবে অনুগ্রহ করে যেন অরাজী হবেন না।

সেইভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হল, এ আর কিছু নয়, কোনো একট অজুহাতে আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা। মনকে সতর্ক করলাম—সাবধান!

সে কম্পিতকণ্ঠে বল্‌ল—দেখো আমার দেশে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। মনে মনে ভাব্‌লাম—জাহান্নমে যাও, যদি লিখ্‌তে বলো, লিখে দেব। তারপর তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলে গিয়ে বস্‌লাম, কাগজ কলম বাগিয়ে নিয়ে বল্‌লাম—এসো, এদিকে এগিয়ে এসে বসে কি লিখতে হবে বলে যাও!

সে এগিয়ে এল, বেশ সাবধানে একটি চেয়ারের প্রান্তসীমায় বস্‌ল—তারপর আমার দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

প্রশ্ন করলাম—কাকে লিখতে হবে?

সে জবাব দেয়—বলেসলাভ কাপসাট। সেভেনুটসিয়ানি শহর, ওয়ারশ রেলপথ!

—বেশ কি লিখ্‌তে হবে বলো!

প্রিয়তম বোলেস—আমার হৃদয়ের আনন্দ। আমার ভালোবাসার ধন! বিধাতার জননী তোমাকে রক্ষা করুণ! সোনামণি! কেন আমাকে চিঠি দাওনা? অনেকদিন এই দুঃখিনী ক্ষুদে পাখিটাকে কেন চিঠি দাওনি?— ইতি—টেরেসা।"

আমি ত' হাসি আর চেপে রাখতে পারিনা। দুঃখিনী ক্ষুদে পাখি বটে! প্রায় ছ ফুট লম্বা, হাতের পাঞ্জা যেন প্রাইজ পাওয়া বক্সিং খেলোয়াড়ের মত,

আর মুখটা এত কালো যে মনে হয় যেন এই ক্ষুদে পাখিটা সারা জীবন ধরে শুধু চিম্‌নী পরিস্কার করেছে, কোনোদিন গা-ধোওয়ার সুযোগ পায়নি। যাই হোক, কোনো মতে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলি, এই বোলেসট্‌ লোকটি কে?

—পড়ুয়া মশাই। বোলেসট্‌ নয় বোলেস্—! একটু যেন বিরক্ত ভাব, আমার এই ক্রুটীপূর্ণ উচ্চারণে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর বল্‌ল—আমার ভালোবাসার লোক!

—ভালোবাসার লোক!

—কেন? এতে এত অবাক হওয়ার কি আছে? আমার মত মেয়ের কোনো ভালোবাসার লোক থাকতে নেই।

ইনি হলেন মেয়ে। এ পর্যন্ত যা শুনেছি সহ্য হয়েছে। কিন্তু এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু এসব ব্যাপারে সবই সম্ভব। প্রশ্ন করলাম—

—অনেকদিন ধরেই তোমাদের এই ভালোবাসা চল্‌ছে নাকি?

—তা প্রায় ছ বছর হবে!

আমি উঠ্‌লাম—বেশ! চমৎকার! নাও তোমার চিঠিটা নিয়ে পালাও।

একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এই প্রেমপত্রের মধ্যেই এমনই কোমলতা ছিল যে টেরেসা ভিন্ন আর কেউ হলে বোলেসের স্থান গ্রহণ করতে আমার আপত্তি ছিল না।

আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেরেসা বলে ওঠে—পড়ুয়া মশাই, অশেষ ধন্যবাদ! আমি যদি কিছু সেবা করতে পারি আদেশ করবেন।

—না, ধন্যবাদ। কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই!

—আপনার প্যাণ্ট বা সার্ট সেলাই করার প্রয়োজন হতেও ত' পারে?

এই কথায় আমি বেশ চটে উঠ্‌লাম। পেটিকোট-ধারিনী রমণীর এই কথায় আমার গাল লাল হয়ে উঠল, আমি বেশ তীক্ষ্ণ গলায় জানালাম তার সাহায্য আমার এতটুকু প্রয়োজন নেই। তখন সে চলে গেল।

সপ্তাহ দুয়েক বোধহয় কেটেছে, একদিন সন্ধ্যায় জানলার ধারে বসে আছি, শীষ দিচ্ছি আর ভাবছি কি ভাবে নিজের হাত থেকেই নিস্কৃতি পাব, কেমন একঘেঁয়ে লাগ্‌ছিল সেদিনের আবহাওয়া, যতদূর নোঙরা হওয়া সম্ভব, তত নোঙরা। এই সন্ধ্যায় বাসা থেকে বেরিয়ে যে একটু বেড়িয়ে আসব সেই উপায়ও নেই, আর কিছু করার না থাকায় আত্ম-বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলাম

এ কাজটাও অতিশয় উত্তেজনাবিহীন ব্যাপার কিন্তু আর কিছু করারও ছিল না। সহসা দরজাটা হাট করে খুলে গেল—হা ভগবান! কে আবার এল!

—পড়ুয়া মশাই, খুব ব্যস্ত নাকি?

—হুম্—। ও না এসে আর কেউ এলে তবু হ'ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিনা টেরেসা! চড়া গলায় প্রশ্ন করলাম—না, ব্যস্ত নই, তোমার কি দরকার বলো! তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করি—

—আবার কি সেই বোলেসকে লিখতে হবে নাকি?

—না, এইবার চিঠিটা হবে বোলেসের কাছ থেকে আমাকে লেখা—

—কি! কি বল্লে?

—মাফ করো, পড়ুয়া মশাই, আমারই বোকামি, এই চিঠিটা আমার জন্য নয়, আমার এক বন্ধুর জন্য, তার এক ভালোবাসার পাত্রীর নাম টেরেসা, ঠিক আমার মত নাম, তার জন্যই এই চিঠিটা লিখতে হবে পড়ুয়া মশাই! সেই টেরেসার নামে চিঠিটা হবে—

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। বেশ ঘাবড়ে গেছে, ভয়ও পেয়েছে মনে হল, তার আঙুলগুলো কাঁপছে, প্রথমটা যদিও বুঝতে পারিনি ওর কি হয়েছে, শেষপর্যন্ত কিন্তু বুঝে নিলাম।

আমি ওকে বল্লাম—দেখো বাপু! তুমি আমার কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বল্ছ। বোলেস্ বলেও কেউ কোথায় নেই। আর তোমার জানাশোনা আর কোনো টেরসাও নেই। এসব আমার এখানে আসার জন্য একটা ছুতো মাত্র। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমার কাছে এভাবে এসে ঘুর ঘুর করলে কোনো ফল হবেনা। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, রাখতেও চাইনা, বুঝলে?

ওর মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠল, বুঝলাম ও ভীষণ ভয় পেয়েছে এবং ঘাবড়িয়ে গেছে, ওর ঠোঁট দুটো বিশ্রীভাবে নড়ছে, কি যেন বল্তে চায়, । বলতে পারছে না। এ সবের পিছনে কিছু একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু সেই ব্যাপারটি কি।

ও সহসা সুরু করে—পড়ুয়া মশাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল, শুনতে পেলাম ওর দরজাটা সজোরে বন্ধ করল, নিঃসন্দেহে বুঝলাম বেচারী ভীষণ

রেগে গেছে। সমস্ত বিষয়টি চিন্তা করে স্থির করলাম ওকে প্রবোধ দিয়ে ফিরিয়ে আনি। যেমনটা ও বল্‌ছে সেইরকম না হয় লিখে দিই।

ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টেবলে মাথা গুঁজে বসেছিল, হাতদুটি দিয়ে কপালটা ধরা। ' আমি বল্‌লাম—টেরেসা, আমার একটা কথা শুন্‌বে কি ?

গল্পটার ঠিক এই জায়গাটায় পৌঁছালেই আমি কেমন যেন হয়ে যাই, কেমন বিশ্রী এবং অপ্রস্তুত মনে হয়। যাক আমার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক, ও জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার আমার উক্তির পুনরাবৃত্তি করি—শুন্‌ছো মেয়ে, আমার কথা শোনো—

সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, তার চোখ দুটো জ্বলছে, আমার কাঁধে হাত দুটি রেখে সে ফিস্‌ফিস করে, কিংবা তার সেই মোটা গলায় গুঞ্জন ধ্বনি করে বলে—

—দেখো পড়ুয়া ভাই! যদি বোলেস বলে কেউ না থাকে, তোমার কি! যদি টেরসা বলেও কেউ কোথায় না থাকে? কি এসে যায়? আমার জন্য কাগজে কয়েকটা আঁচড় টানতে তোমার এত কষ্ট? তোমার এই কাজ!, তোমাকে ভালোছেলে বলে জানতুম বরাবর। আর তোমার পেটে পেটে এত—! সত্যি বোলেস বলে কেউ নেই, আর কোন টেরেসাও নেই, কিন্তু তাতে এ পৃথিবীর কি ক্ষতি বল?

এই অভ্যর্থনায় বিশেষ উত্যক্ত হয়ে বল্‌লাম—আমাকে একটু বল্‌তে দাও, তাহলে এই বোলেস বলে কি কেউ নেই?

—না-নেই! কিন্তু তাতে তোমার কি হে?

—আর টেরেসাও নেই?

—না কোনো টেরেসাও নেই, একমাত্র এই আমি আছি!

—তোমার কথার একটি বর্ণও বুঝি না। তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালাম। আমাদের দুজনের মধ্যে কার মতিভ্রম হয়েছে তাই ভাবি! সে আর একবার টেবলে ফিরে গেল, ড্রয়ারটা ঘাঁটল কিছুক্ষণ ধরে, তারপর আমার কাছে ফিরে এসে আহত গলায় বলল—এই নাও, এই চিঠি তুমি লিখে দিয়েছিলে, ফিরিয়ে নাও তোমার চিঠি! আমার জন্য আর একখানা চিঠি লিখে দিতে তুমি রাজী নয়। তোমার চেয়ে দয়ালু হয়ত অন্য কেউ থাকতে পারে, সেই লিখে দেবে আমার হয়ে চিঠিপত্র।

চিঠিখানা চিন্‌তে পারি, ওর হয়ে বোলেসকে আমি লিখেছিলাম।

বল্‌লাম—দেখো টেরেসা। এসব কাণ্ডর মানে কি আমাকে বল্‌তে হবে! কেন তুমি লোকধরে ধরে চিঠি লেখাও? যদি সেগুলি ডাক বাক্সে না ফেল্‌বে চিঠিলেখার কি প্রয়োজন?

—কোথায় পোষ্ট করব? কার কাছে?

—কেন! এই বোলেসকে?

—কিন্তু, সে ত নেই, তার কোনো অস্তিত্ব নেই!

সত্যি আমি তার কথার একবর্ণও বুঝিনা। মনে হয়েছিল যে থুতু ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

অত্যন্ত আহত গলায় সে বল্‌ল—আচ্ছা তোমার কি বাপু! তার অস্তিত্ব নেই। সত্যিই নেই—, তারপর সে হাতদুটো এমন ভাবে প্রসারিত করল যে সেও যেন বুঝছে না কেন বোলেসের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। একটু থেমে সে আবার বলে ওঠে—কিন্তু আমি যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমি কি মানুষ নই, আর পাঁচজন মানুষের মত আমার কি বাঁচার অধিকার নেই! কিন্তু আমি যদি তাকে চিঠি দিই কার কি এসে যায়?

—আমাকে বল্‌তে দাও, কাকে লিখবে?

—কেন এই বোলেসকেই!

—সে ত' নেই, তার অস্তিত্বই নেই!

হায়রে হায়! হা আমার ভগবানের মা! যদি নাই থাকে, তোমার কি বাপু! সে নেই, কিন্তু আমার কাছে সে আছে। আর টেরেসা, এই আমি, সে আমাকেই চিঠি লেখে, আর আমি, তার জবাব দিই!

বুঝলাম! মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। খুবই লজ্জিত হলাম, আমার কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে একজন মানুষ বাস করে। সারা পৃথিবীতে তাকে ভালোবাসার, তার দুঃখে সমবেদনা জানবার কেউ নেই! তাই বাধ্য হয়ে তাকে নিজে নিজেই একটা বন্ধু আবিস্কার করতে হয়েছে।

—এইত, তুমি আমার জন্য বোলেসকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলে, আমি আমি আর একজনকে দিয়ে সেটা পড়িয়েছি, যখন সেটা পড়তে শুন্‌তে থাকি তখন আমার মনে হল সত্যি একজন বোলেস আছে। আমি তাই

...লসকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখাতে চাই টেরেসাকে, সেই টেরেসা আমি!

পেলাম ও আমাকে লিখবে চিঠি। তারপর সেই চিঠিখানা যখন আমাকে পড়ে

শোনানো হবে, আমার মনে হবে যে একজন বোলেস আছে। আর আমার জীবনটা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। আমার সেই পরিচিত বন্ধু বল্‌তে লাগলেন। মরুকগে যাক! লম্বা কাহিনী সংক্ষেপ করে বলি, সেই থেকে আমি সপ্তাহে দুবার নিয়ম করে বোলেসকে এবং বোলেসের কাছ থেকে টেরেসাকে চিঠি লিখতে থাকি। আমি চমৎকার জবাব লিখতাম টেরেসার জন্য। প্রেমাবেগপূর্ণ ভাষায় ভরিয়ে দিতাম চিঠির প্রতিটি লাইন। আর সেই চিঠি শুনে টেরেসা তার মোটা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। এর বিনিময়ে সে আমার কাপড়, জামা মোজা সেলাই করে মেরামত দিত!

তিন মাস পরে কি একটা কারণে ওর জেল হল। এতদিনে সে নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।

আমার বন্ধু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেল্‌লেন, আকাশের দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর শেষ করলেন :—"আমার মনে হয় মানুষ যত তিক্ততার তীব্র সুরা পান করে ততই তার প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। আর আমরা, আমাদের বস্তাপচা ছিন্ন সততায় সারা অঙ্গ ঢেকে পরস্পরের দিকে আত্মতুষ্ট ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছি, আমাদের সাধুতা সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত। অপরের মনোভংগী উপলব্ধির শক্তি নেই।

সমগ্র ব্যাপারটি অতিশয় নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আমরা বলি পতিতা—কিন্তু কি এবং কারা এই পতিতা? প্রথমতঃ ওরা আমাদের মতই রক্ত মাংসের মানুষ, একই অস্থি মজ্জা। আমাদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? অথচ যুগ যুগ ধরে আমরা একই কথা শুনে আস্‌ছি! আমরা সেই সব কথায় কানও দিই, অথচ এসব কথা কি নির্বোধের মত তা বুঝি। আসলে আমরাও পতিত মানুষ বরং ওদের চেয়ে ঢের বেশী পরিমানে পতিত, আমরা এক গভীর খাদের নীচে পড়ে গেছি, সেই খাদ হল আত্মতুষ্টির খাদ। আমরা আমাদের অপাপবিদ্ধ অমলিনতার অহঙ্কারে ডুবে আছি। সমস্ত বিষয়টি কি কুৎসিত। আমরা আমাদের চড়াগলার মানবিকতার বাণীর পেষনে দুরাচারি হয়ে পড়েছি! কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, এ সব বস্তু প্রাচীন শৈলশিখরের মত পুরাতন—এত প্রাচীন যে একথা উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়। অতি প্রাচীন —সত্যি অতিশয় প্রাচীন।

কর্ত্তেল মেনডিস্

হারানো তারকা



আমার সনেটের পঞ্চম চরণ সবে শেষ করতে যাব এমন সময় পরিচারক এসে জানালো—মঁসিয়ে, দুজন দেবদূত বাইরে অপেক্ষা করছেন, তাঁরা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

আমি প্রশ্ন করি—তোমাকে তাঁরা কার্ড দিয়েছেন ত'?

—হাঁ, হুজুর, দিয়েছেন।

কার্ড পড়ে দেখি একটিকে লেখা আছে 'হেলিয়াল' অপরটিতে 'জাফায়েল'। নিঃসন্দেহে দুজন দেবদূতই বটে! বল্‌লাম—বেশ, নিয়ে এসো তাঁদের।

এমন দুজন উচ্চাঙ্গের অতিথির সম্বর্ধনা আমি সানন্দেই করলাম। দুজনের অঙ্গেই বিরাট পাখ্‌না প্রতিটি পাখনায় সাতটি করে পালক। তার মধ্য থেকে ভোরবেলাকার একটা মৃদু কোমলতা করে পড়েছে, আর তাতে মাখানো আছে রামধনুর সাতটি রঙ। দেহের যেটুকু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে তা অতি স্বচ্ছ, তুষার সদৃশ, তাতে কিঞ্চিৎ গোলাপ আভা। আমি হাত দুলিয়ে তাঁদের বসবার অন্য অনুরোধ জানিয়ে সবিনয়ে জানতে চাইলাম তাঁদের এই আগমনে আমাকে এইভাবে সম্মানিত করার হেতু কি!

হেলিয়াল বল্লেন—সংক্ষেপেই সারা যাক্, প্রায় ষোলো বছর আগে জুলাই মাসের এক আনন্দ উজ্জ্বল রজনীতে আমি আর জাফায়েল একটু বিলিয়ার্ড খেলছিলাম, খেলাটা জমেছিল আকাশের গায়ের সবুজ কার্পেটে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—মাফ করবেন। আমার ধারণা আকাশটা নীল।

—হ্যাঁ, আকাশ অন্তহীন, তার স্থানে স্থানে, রঙটা নীল বটে, তবে অন্য অংশে সবুজ, বিশেষ করে শহরের প্রান্তে কিংবা পারস্য দেশের মত উন্মুক্ত অঞ্চলে, সেখানটা এমন সবুজ যে দেখলে চোখ জুড়োয়।

আমি আর কিছু বলি না।

হেলিয়াল বল্‌তে থাকেন—আমাদের খেলায় বল হল দুটি অতি সুন্দর নক্ষত্র। আমরা বেছে নিয়েছিলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম—আর কিউ? কি দিয়ে বল মারছিলেন!

—ধূমকেতুর লেজ। কাজে কাজেই, খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। আমি প্রায় জিতে এসেছি, এমন সময় এক প্রচণ্ড মার দিয়ে বল দুটি একেবারে কিনারা পার করে দিলাম—

—একেবারে কিনারা পার হয়ে বাইরে পড়ল?—আমি প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ, দিগন্তের পার। আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কারণ, বুঝতেই ত পারছেন স্বর্গরাজ্য থেকে দু দুটো তারা খসে পড়া একটা রীতিমত গুরুতর ঘটনা। স্বর্গরাজ্যের রাষ্ট্রপাল হুকুম দিলেন যে যতক্ষণ না ঐ হারানো তারা দুটিকে যথাস্থানে আবার ফিরিয়ে এনে রাখা হচ্ছে ততক্ষণ স্বর্গীয় কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদে আমরা অংশ গ্রহণ করতে পারবো না। বুঝতেই পারছেন, বিগত ষোলো বছর ধরে আমরা স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছি এই তারা খোঁজার কাজে, সম্ভাব্য সকল স্থানেই সন্ধান করছি, কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। আমরা এখন চির নির্বাসন গ্রহণ করবো প্রায় স্থির করে ফেলেছি, এমন সময় সংবাদ পেলাম মর্তধামের এক তরুণীর চোখদুটি নাকি তুলনাহীন, তিনিই আপনার প্রিয়তমা। গুজবে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ঐ রকমই ত মনে হয়। যতদূর শুনেছি, তাতে বুঝেছি তাঁর চোখদুটি মর্তের মানবীর নয়, সেই স্বর্গীয় তারা দুটিই তাঁর চোখ, তারই সন্ধানে আমরা দিশেহারা। আশাকরি তিনি এখন সে দুটি ফেরৎ দিতে অরাজী হবেন না।

এ কথা শুনে আমি ত' বিস্ময়ে হতবাক। আমার প্রিয়তমার চোখ দুটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে এই ভয়ংকর সম্ভাবনায় আমি আতংকিত হলাম। কিন্তু দেবদূতের স্বর্গীয় সম্পত্তি-প্রত্যার্পণ করার শক্তি আমার হাতে, তাঁদের সহায়তা করা আমার কর্তব্য। আমি মামজেল মেসাঁজকে ডেকে পাঠিয়ে অল্প কথায় ঘটনাটি বুঝিয়ে দিলাম।

তিনি কিন্তু এতটুকু বিস্মিত আতংকিত বা আশ্চর্যও হলেন না। কয়েক

সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে তিনি অতিথিদের দিকে ফিরলেন, তারপর তাঁর চোখের পাতা দুটি যথাসম্ভব তুলে ধরে বল্লেন—হে, রমণীয় দেবদূত! দেখুন ভালো করে, এই কি আপনাদের সেই হারানো তারা?

ওরা কাছে ঘেঁষে এল। অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে মেসাঁজের স্বচ্ছ চোখ দুটি নিরীক্ষণ করল। তারপর নিজেদের মধ্যে কিছুকাল মৃদু গলায় কি সব আলোচনা করল, জুরিগণ যেমন মতামত বিনিময় করে থাকেন এ যেন অনেকটা সেই রকম। তারপর হোলিয়াল বল্লেন—না, এ সেই ষোলো বছর আগেকার হারানো তারা নয়। সে তারা অবশ্য সেই জুলাই রজনীতে অতিশয় উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু তার দ্যুতি এত দীপ্তিময়, এত জ্যোতির্ময় ছিল না।

তারপর ওরা দুজনে গভীর হতাশাভরে চলে গেলেন। আমি প্রকৃত দুঃখবোধ করলাম ওদের জন্য, তবে তারা যে আমার প্রিয়তমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেনি তার জন্য অবশ্য আমি আনন্দিত।

আর মেসাঁজ? সে ত' একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বল্‌ল—কি, কেমন ঠকিয়েছি বলোত? সত্যি আমার মার কাছে অন্ততঃ একশবার শুনেছি আমার জন্মের ঠিক একটু পরেই, দুটি তারা খোলা জানলা দিয়ে সোজা চলে এসে একেবারে আমার চোখের মণিকোঠায় পড়েছিল।

কিন্তু, দেবদূতরা যখন আমাকে বেশ ভালো করে দেখছেন, তখন আমি কি করেছি জানো—, তখন আমি মনে মনে সেই পরমক্ষণের কথা ভেবেছি, যখন তুমি আমার ঠোঁটে প্রথমতম চুমার রেখা এঁকে দিয়েছিলে।

আমি বেশ ভালোভাবেই জানতাম যে জীবনের সেই পরম-লগ্নের চিন্তার আনন্দ যখন আমার চোখে ভেসে উঠ্‌বে তখন তার সঙ্গে সেদিনকার সেই তারা কেন,—স্বর্গের যে কোনও পরম রমণীয় সম্পদও ম্লান হয়ে যাবে।



গাব্রিয়েল দ'আনুনৎসিও

ক্যানডিয়ার মৃত্যু

ঈষ্টারের ভোজের তিনদিন পরের ঘটনা, লোমোনিকা ভবনে প্রাচুর্য এবং আড়ম্বরের দিক থেকে এই ভোজ একটা বৃহৎ ব্যাপার, বহু অতিথি আমন্ত্রিত হন, খাদ্য ও পানীয়ের মহাধূম। ডনা ক্রিষ্টিনা লামোনিকা টেবলের ঢাকনা, রূপার বাসনপত্র প্রভৃতি তৈজসাদি দেখে শুনে গুনে ড্রয়ারে তুলছেন। ভবিষ্যৎ ভোজের জন্য একেবারে সব তৈরী থাকবে।

যথারীতি সঙ্গে আছে তাঁর পরিচারিকা মারিয়া বিসাচিয়া, সে সাহায্য করছে। আর আছে রজকিনী ক্যানডিডা মারকানডা, সাধারণতঃ ক্যানডিয়া নামেই পরিচিত। সাইড-বোর্ডের ওপর রূপার বাসনপত্র ঝক্‌ঝক্ করছে—বৃহৎ পাত্র এসব, গেঁয়ো স্যাকরার হাতে গড়া একটু মোটা ধরণের কাজ। এই জাতীয় বাসনপত্র পুরুষানুক্রমে বড় পরিবারের বংশধররা ভোগ করে। সাবান জলের টাটকা গন্ধে ঘরটা ভরপুর হয়ে আছে।

ঝুড়ি থেকে টেবল ক্লথ, তোয়ালে ইত্যাদি একে একে তুলে মারিয়ার হাতে দিচ্ছে আর গিন্নীমাকে জানিয়ে দিচ্ছে সব ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে অক্ষত অবস্থায়। মারিয়া ড্রয়ারে তুলে রাখছে আর গিন্নীমা তারপর ল্যাভেণ্ডার ছড়া দিচ্ছেন, খাতায় ঠিক ঠিক সংখ্যা টুকে রাখছেন সেই সঙ্গে। ক্যানডিয়া দীর্ঘাঙ্গিনী। শীর্ণা স্ত্রীলোক বয়স প্রায় পঞ্চাশ, পিঠটা কিঞ্চিৎ বেঁকেছে, জাত ব্যবসার খাতিরে যেমন হয়। হাত দুটো বেয়াড়া রকম লম্বা. আর মাথাটা যেন কচ্ছপের পিঠে শীকারী পাখির মত। মারিয়া বিসাচিয়া অরটোনার অধিবাসী। কিঞ্চিৎ স্থুলাঙ্গী, রঙটা বেশ তাজা, চোখ দুটো অতি-পরিষ্কার

তার কথা বলার ভঙ্গীটা বেশ মিঠে, সর্বদাই পেষ্ট্রী, সিরাপ আর আচার বানানো হাত দুটি বেশ সতর্ক এবং হালকা। ডনা ক্রিষ্টিনাও ঐ অরটোনার মানুষ। লেখাপড়া শিখেছেন বেনিডিকাটিন কন্ভেণ্টে। আকৃতিটা খর্ব, বক্ষোদেশ একটু উদার ভাবেই বিশাল, মুখময় ব্রণ-মেছেতার দাগ, নাকটা লম্বা, দাঁতগুলি খারাপ, চোখদুটি ভারী সুন্দর, দেখলে মনে হবে যেন নারীর বেশে কোনো ধর্মযাজক।

তিনটি রমণী অতিশয় যত্ন নিয়ে কাজ করছেন। সমস্ত অপরাহ্নটাই এই কাজে কাটছে। সহসা, ক্যানডিয়া তার শূন্য ঝুড়িটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে আর ঠিক সেই সময় ডনা ক্রিশ্চিনা ছোট রূপার জিনিস গুন্তে গিয়ে দেখলেন একটি চামচ কম পড়ছে।

গভীর নিরাশায় তিনি বলে উঠলেন—মারিয়া, মারিয়া,—একটা চামচ পাওয়া যাচ্ছে না। তুমিই বরং নিজেই গুণে দেখ!

মারিয়া বলে—বাঃ সে কি করে হবে গিন্নীমা! বেশ আমিই দেখ্ছি। এই বলে সে আবার গুন্তে থাকে, চেঁচিয়ে সংখ্যা গণনা করে, আর ডনা ক্রিষ্টিনা মাথা নাড়েন। রূপার জিনিসগুলির মতোই চমৎকার মিঠে আওয়াজ।

শেষ পর্যন্ত মারিয়া বল্ল—তাইত, সত্যি একটা কম পড়ছে! এখন উপায়? সে নিজে সবদিক থেকে সন্দেহাতীত। পনের বছর ধরে সে তার বিশ্বস্ততা আর সততার প্রমাণ দিয়ে এসেছে, ডনা ক্রিষ্টিনার সঙ্গে এক সঙ্গেই সে ওরটোনা থেকে এসেছে সেই তাঁর বিয়ের সময়। এমন কি বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ার সেও যেন এক সরিক, গোড়া থেকেই এ বাড়িতে সে আধিপত্য বিস্তার করেছে, অবশ্য তার মূলে ডনা ক্রিশ্চিনার প্রশ্রয় আছে। ডনা ক্রিশ্চিনার মন ধর্মীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাঁর জন্মস্থানের সাধুসন্তের প্রতি তিনি ভক্তিমতী, আর আছে কুটিল বুদ্ধি। পেশকারা এবং তার যা কিছু তার বিরুদ্ধে এই দাসী আর গিন্নীর একটা অশুভ মৈত্রী আছে, বিশেষ করে এখানকার সাধুসন্তের প্রতি। নিজের দেশের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য বর্ণনার সুযোগ ওরা কখনো ফাঁক দেয় না, ব্যাসিলিকার সৌন্দর্য, সান টোমাসোর ঐশ্বর্য, সেখানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাঁকজমক, সেই সঙ্গে তুলনা করে সান কেটোর দারিদ্র্য, এদের শুধুমাত্র একটা রূপার ক্রস আছে।

ডনা ক্রিষ্টিনা বল্লেন—ওদিকটা বরং একবার ভাল করে দেখে এসো।'

মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনুসন্ধানের পরিধি বিস্তার করতে।

রান্নাঘরের প্রতিটি আনাচ কানাচ, বারন্দা—কিন্তু সবই বৃথা, খালি হাতে সে ফিরে এল। 'না কোথাও নেই।'

তারপর দুজনে একসঙ্গে চিন্তা করে স্মৃতি মন্থণ করে অনুসন্ধান চালায়। উঠানের সঙ্গে গিয়ে যে বারান্দাটা মিশেছে সেটা দেখা হল, কাপড়কাচার জায়গার পিছনকার বারান্দায় শেষ চেষ্টা হল। দুজনে যখন উচ্চৈস্বরে হা হুতাশ করছে, তখন এবাড়ি-ওবাড়ির জানালার এক একটি উৎসুক মাথা জেগে ওঠে, তারা প্রশ্ন করে—

"কি হল গো ক্রিশ্চিনা গিন্নী! আমাদের একটু বলো দেখি।

ডনা ক্রিষ্টিনা আর মারিয়া দুজনে অনেক হাত পা নেড়ে, অনেক কথা বলে সব ঘটনা ব্যক্ত করে।

তারা বলেঃ হা ভগবান! তাহলে এ অঞ্চলে দেখছি চোরের আমদানি হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সমগ্র পেস্কারায় এই চুরির কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। নর-নারী সবায়ের মুখে এক কথা। কে চুরি করতে পারে, কার এই কাজ। এই খবর যখন সুদূর সান আন্তোনিয়োর ঘরে ঘরে পৌছালো তখন আরো পল্লবিত। তখন আর শুধু সমান্য একটা খুদে চামচ নয়। লামোনিকাদের সমস্ত রূপার বাসনপত্র চুরি হয়েছে এই খবর ছড়ালো।

আবহাওয়াটা চমৎকার। বারান্দায় গোলাপ ফোটার সময় হয়েছে। এক জোড়া পাখি খাঁচায় গান ধরেছে, বহিবাতাসের এই উষ্ণ স্পর্শে পুলকিত মহিলাবৃন্দ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুরির গল্প করতে থাকেন।

হাত কচ্‌লিয়ে ডনা ক্রিশ্চিনা বলেন—কে এ কাজ করলে ভাই!

ডনা ইসাবেলা সারটেল, তাকে সবাই আড়ালে বলে শীকারী বিড়াল। তাঁর চালচলনটাই শীকারী পশুর মতো নোঙরা এবং কুৎসিৎ। কর্কশ গলায় সে প্রশ্ন করেঃ হাঁ গা ক্রিশ্চিনা গিন্নি তোমার সঙ্গে আর কে ছিল, আমার যেন মনে হল ক্যানডিয়াকে দেখলাম।

ডনা ফেলিসেটা মার্গাসান্টা বলে উঠল—আ! তাই বলো!

খালি বক বক করে বলে ওর নাম দিয়েছে সবাই 'ম্যাগপাই'। সে আবার বলে, আহা! ওর কথা তোমরা ধরোনি ত'। তোমরা কেউ লক্ষ্য করোনি তা ছাড়া তোমরা ওর সম্বন্ধে আর কি জানো। আমরা ওর কথা সব বলতে পারি—ওর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা—' ভালো কাপড় কাচে সন্দেহ

নেই, পেসকারায় ওর মত ধোপানি নেই, একথা নিশ্চয়ই বল্‌ব। তবে বাছা, ওর একটু হাতটান আছে, এই ওর দোষ! তোমরা ত' তা জানানো।

—আমার কাছ থেকে একবার একজোড়া তোয়ালে সরিয়েছে,—আর আমার কাছ থেকে হাতমোছা ন্যাপকিন—আমার একটা নাইট গাউন,—আর আমার তিনজোড়া মোজা—আমার একটা নতুন পেটিকোট—সে সব আর ফেরৎ পেলাম না ভাই—আমি ও নয়!—আমিও আর কিছু ফেরৎ পাইনি।

"তবে, আমি ভাই তাড়িয়ে দিইনি! কোথায় কাকে পাবো বলো! সিলভেষ্ট্রায় আর লোক কোথায়?"

"ওহো!"

"এনজেল আনটোনিয়া! আফ্রিকার ঐ লোকটা!"

"এক ভস্ম আর ছার—"

"সইতেই হবে, উপায় কি!"

"কিন্তু! তা বলে রূপার চামচটা যাবে!"

"একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়াল।"

"ক্রিশ্চিনা গিন্নী, তুমি ছেড়ে কথা কোয়ো না দিদি, হাল ছেড়োনা!"

"বল কি! ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেব কি দেব না আমরা ঠিক করব। ডনা ইসাবেলা, সে কাজটা আমাদের।" মারিয়া শেষ পর্যন্ত বলে উঠল।

অন্য সব সহযোগী দাস-দাসীদের ওপর সর্বদাই তার একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব।

এই ভাবে জানালায়-বারান্দায় কলরব বেড়েই চলে। মুখে মুখে কথাটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে!

এর পরদিন সকালে এক গাদা কাপড় গামলায় ভিজিয়ে দিচ্ছে ক্যানাডিয়া এমন সময় পল্লী চৌকিদার বিয়াজিও পেসে দরজায় এসে দাঁড়াল।

সে ধোপানীকে বল্‌ল—মহামান্য মেয়র তোমাকে এখনই তলব করেছেন।

ক্যানডিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল—সে আবার কি?

—মাননীয় মেয়র মহোদয় তোমাকে এখনই তাঁর এজলাসে ডেকেছেন!

ক্যানডিয়া তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চায়—আমাকে ডেকেছেন? আমাকে? আমার কাছে কি দরকার?

ক্ষুদে চৌকিদার বলে—আমি সে সব খবর জানিনা, যেমন হুকুম হয়েছে তাই বল্‌ছি।

—"কি তোমার হুকুম ?" ধোপানী তার স্বাভাবিক একগুঁয়েমি বশতঃ তবু প্রশ্ন করে যায়। এই ব্যাপারটি সত্যি বলে বিশ্বাস হয় না। সে প্রশ্ন করে, মেয়র আমাকে ডাকছেন ? কেন ? কি করেছি আমি ? আমার আগে সব জানা দরকার ! আমি যাবো না ! আমি কিছু করিনি।

ক্ষুদে চৌকিদারের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে শুধু বলল—তাই নাকি ! তুমি যাবে না ? বেশ দেখা যাবে !

এই কথা বলে সে কোমরের প্রাচীন তরবারিটা স্পর্শ করে কি সব গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

ইতিমধ্যে সেই গলিপথের যারা এ সব কথাবার্তা শুনে ফেলেছিল তারা একে একে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখে ক্যানডিয়া সজোরে কাপড় কাচছে। ওরা সবাই রূপার চামচের সংবাদ শুনেছে তাই সবাই অর্থসূচক ভঙ্গীতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে আর আবছা কথা বলে, ক্যানডিয়া তা বুঝতে পারে না। কিন্তু এই সব হাসি এবং কথাবার্তা তার মনে কেমন একটা অস্পষ্ট ভীতি সঞ্চার করে।

তারপর আবার চৌকিদারের আবির্ভাব হল, এবার সঙ্গে আর একজন পাহারাওলা।

চৌকিদার হুকুম করে, ভালো ভাবে পা ফেলে চলে এসো—

ও কোনো কথা না বলে হাত মুছে নীরবে তাদের অনুসরণ করে।

বড় রাস্তায় পার্কের কাছে সবাই ব্যাপারটা দেখার জন্য থমকে দাঁড়ায়। ক্যানডিয়ার একজন শত্রু রোজা পাণুরা তার দোকানের দোরগোড়া থেকে ঘৃণা ভরে বলে।—চোরাই মালটা বার করো—'

ধোপানী এই নিষ্ঠুরতায় অভিভূত হয়ে কি যে জবাব দেবে ভেবে পায় না। মেয়রের এজলাসের সামনে অনেক নিষ্কর্মা লোক ভীড় জমিয়েছে তারা ক্যানডিয়াকে মেয়রের ঘরে ঢুকতে দেখল, সে মেয়রের সামনে হাজির হয়েই এক নিঃশ্বাসে বলে—কি চান, আমার কাছে ?

মেয়র ডন সিলা, লোকটি শান্তিপ্রিয়, রজকিনীর এই উদ্ধত কণ্ঠস্বরে তিনি ক্ষণেকের জন্য একটু বিব্রত হলেন। তারপর তাঁর সরকারি মর্যাদার রক্ষক তুটির দিকে একবার তাকালেন। এর পর শিঙের তৈরী নস্যদান থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বল্‌লেন—বস মেয়ে ! বসো !

ক্যানডিয়া কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। তার শুকচঞ্চুর মত নাক, রাগে ফুল্‌তে

থাকে, আর তার রেখাঙ্কিত গাল কাঁপতে থাকে, সে বলে—ডন শিলা, আমাকে বলুন, কি আমার অপরাধ !

—গতকাল তুমি ডনা ক্রিষ্টিনা লামোনিকার বাড়ি কাচা কাপড় দিতে গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কি ? কোনো কিছু কি হারিয়েছে ? সব একে একে গোনা হয়েছে, একটাও হারায় নি। এখন কি ব্যাপার বলুন।

—দাঁড়াও বাছা, একটু থামো। সেই ঘরেই রূপার বাসনপত্র ছিল—

ক্যানডিয়া অবস্থা বুঝে রাগে যেন বাজপাখির মত হয়ে গেল, শীকারে ছোঁ মারে আর কি ! তার সরু ঠোঁটগুলি কাঁপছে।

মেয়র বল্লেন—মা, সেই ঘরে যে সব রূপার বাসন ছিল তার ভেতর থেকে একটি চামচ ডনা ক্রিষ্টিনা খুঁজে পাচ্ছেন না ! বুঝলে বাছা ! তা তুমি কি ভুল করে নিয়ে গেছ ?

এই অপবাদের অনায্যতায় ক্যানডিয়া একটা ফড়িং-এর মতো লাফিয়ে উঠে। সে ত' কিছুই চুরি করেনি। সে বলে ওঠে—

—আমি ! আমি নিয়েছি ? কে একথা বলে ? কে দেখেছে ? ডন শিলা আপনার কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি। আমি চোর ! আমি ? আমি ?

তার ধিক্কারের আর শেষ নেই। এই অন্যায় অপরাধের বোঝা তার ওপর চাপাতে সে ভীষণ আঘাত পেয়েছে—কারণ এই অপরাধের সাজা কি সে জানে ?

মেয়র তাঁর বিচারের চেয়ারের গভীরে চেপে বসে বল্লেন তাহলে তুমিই নিয়েছ ? ধোপানী বলে—আপনার বিচার দেখে আমি হতভম্ভ হয়ে গেছি।

এই বলে সে তার শীর্ণ লম্বা হাত তুলে দুটো লাঠির মত শূন্যে আস্ফালন করে।

মেয়র বল্লেন—বেশ, তুমি এখন যাও, আমরা দেখি কি করা যায়।

ক্যানডিয়া অভিবাদন না জানিয়ে বেরিয়ে এল দোরগোড়ায় একেবারে অন্ধের মত। সে রাগে নীল হয়ে গেছে একেবারে। পথে বেরিয়ে জনতার দিকে নজর পড়ে, সে বুঝতে পারে যে জনমত ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে, কেউ তার নির্দোষিতা বিশ্বাস করে না। সে অস্বীকারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জনতা বিদ্রূপের হাসি হাসে। রাগে অপমানে জ্বলে সে ফিরে আসে—তারপর দোর-গোড়ায় পৌঁছে অসহায়ের ভঙ্গীতে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ডন ডোনাটো ব্রাণ্ডিমারতে পাশের বাড়ি থাকে, সে ঠাট্টা করে বলে—একটু জোরে জোরে কাঁদো। রাস্তার লোকজন শুনুক সবাই।

হাতে তার অনেক কাজ, তাই শেষ পর্যন্ত সে শান্ত হয়। হাতের জামা গুটিয়ে কাজে নামে। কাজ করতে করতে সে তার অস্বীকৃতির কথা, তার আত্ম-সমর্থনের কথা ভাবে, তার সহজাত স্ত্রী বুদ্ধি দ্বারা নিজের নিরপরাধতার কথা প্রমাণের একটা উপায় উদ্ভাবন করে।—মাথা খুঁড়ে সব রকম ভাবে, গেঁয়ো যুক্তি দিয়ে এমন কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করে যা অত্যন্ত অবিশ্বাসী মনকেও জয় করবে। তার হাতের কাজ শেষ হতে সে সর্বপ্রথম ডনা ক্রিষ্টিনার কাছে যাবে স্থির করল।

ডনা ক্রিষ্টিনার সঙ্গে দেখা হল না। মারিয়া বিসাচিয়া ক্যানডিয়ার উচ্ছ্বাস শুন্‌ল, সে শুধু মাথা নাড়তে থাকে, কিন্তু কোনো জবাব দেয় না, তারপর বেশ মর্যাদামণ্ডিত নীরবতায় ঘরে চলে যায়।

এরপর ক্যানডিয়া তার সব খদ্দেরদের কাছে একে একে গেল, প্রত্যেককে সব ঘটনা আনুপূর্বিক শোনালো। প্রত্যেকের কাছে নিজের সাফাই শোনালো। প্রতিবারেই একটা নতুন যুক্তি দেয়। তার কথাকে আরো বোধগম্য করার জন্য বিস্তারিত করে, যত সবাই অবিশ্বাস করে ততই সে উত্তেজিততর হয়ে ওঠে; সবই বৃথা, সে বুঝ্‌ল এখন থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কোনো পথ নেই। একটা অন্ধ হতাশা তাকে পেয়ে বসল—আর কি সে করতে পারে? আর কি বল্‌বে? কি বলার আছে?

ইতিমধ্যে ডনা ক্রিষ্টিনা সিনিজিয়াকে ডেকে পাঠালেন। এই স্ত্রীলোকটি যাদু জানে, কিছু মন্ত্র এবং ওষুধপত্রও জানে, প্রয়োজনে সবাই তাকে ডাকে। এর আগে সিনিজিয়া অনেকবার চুরি যাওয়া জিনিষপত্র উদ্ধার করেছে। সবাই বলে, চোরদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ আছে।

ডনা ক্রিষ্টিনা বল্‌লেন—আমার চামচটা খুঁজে দাও, তোমাকে বেশ মোটা বখশিষ দেব।

সিনিজিয়া বল্‌ল—বেশ তাই হবে! তবে চব্বিশ ঘণ্টা সময় চাই।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে সিনিজিয়া ফিরে এল, উঠানেই চামচটা পাওয়া গেছে, কুয়ার পাশে পড়েছিল।

তৎক্ষণাৎ সারা পেসকারায় সেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

তখন ক্যানডিয়া মারকানডা বেশ বিজয়গর্বে সবগুলি রাজপথ ঘুরে এল। সে যেন একটু লম্বা হয়ে গেছে। মাথা উঁচু করে আছে সে, সে হাসি হাসি মুখে সবার চোখের দিকে তাকাচ্ছে, ভাবখানা এই যে—কি আমি বলিনি! আমি ত' আগেই বলেছি। দোকানের লোকজন তাকে চলে যেতে দেখে কি যেন গজ্ গজ্ করে বলে তারপর একটু ঘৃণাসূচক ভঙ্গীতে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ফিলিপ্পো লা সেল্‌ভিকাফে দ আঙ্গেতে বসে ব্রাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল সে ক্যানাডিয়াকে ভেতরে ডাকল। তারপর হুকুম করে—

—ক্যানাডিয়াকে এক গ্লাস দাও, সেই সঙ্গে আমাকেও আর একটা।

ধোপানীর কড় মদের প্রতি লোভ, ঠোঁটে তার জল সরে। ফিলিপ্পো বলে —এক গ্লাস নিশ্চয়ই তোমার পাওনা, এ ত' আর অস্বীকার করা যায় না।

একদল কর্মহীন মানুষ কাফের বাইরে ভীড় করছিল। এদের সকলের মুখে শয়তানি মাখানো। ধোপানী যখন মদ্যপান করতে সুরু করেছে, তখন ফিলিপ্পো সহসা জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করল—

—কি বল ভাই তোমরা, ক্যানডিয়া আমাদের কি করে কি করতে হয় তা জানে, নয় কি? একেবারে শিয়ালের মত শেয়ানা! নয় কি?

এই বলে বেশ অন্তরঙ্গের মত ধোপানীর সবল কাঁধে চাপড় মারল। জনতা হেসে ওঠে। বামনাকৃতি মাগনাফাভে—সবাই তাকে 'বিগ্ বীনস্' বলে ডাকে, তার বুদ্ধিটা কাঁচা এবং একটু তোতলা, সে তার ডান হাতের আঙুলগুলি বা হাতের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে এক বিকট ভঙ্গী করে প্রতিটি কথায় থেমে থমকে বলে ওঠে—ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যানডিয়া—সি—সি—সিনিজিয়া।— এই বলে সে বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে কুৎসিত রসিকতা করে ক্যানডিয়া আর সিনিজিয়া যে চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই সে কথা বল্‌ল। আর সমবেত দর্শকবৃন্দ এই কথায় একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ক্ষনমুহূর্ত ক্যানডিয়া বিহ্বল হয়ে বসে রইল তার হাতে গ্লাসটি তখনও ধরা। তারপর সহসা সে বুঝ্‌ল—ওরা তার নির্দোষিতা বিষয়ে সন্দিহান। ওরা বল্‌তে চায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভের আশায় যাদুকরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে-ই গোপনে চামচ ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্ধ-ক্রোধে সে জলে ওঠে। রাগে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, ওদের মধ্যে যে দুর্বলতম তার ওপর ক্যানডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই কুঁজো বামনটার ওপর লাফিয়ে পড়ে, তারপর তাকে এলোপাথাড়ি কিল ঘুঁষি মারতে থাকে। আর জনতা এই মারামারি সুরু হতে এক একটি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উভয়কেই

ব্যঙ্গ করতে থাকে, অতি নিষ্ঠুর আনন্দে তারা মত্ত হয়ে ওঠে। যেন দুটো পশুর লড়াই দেখ্‌ছে, তাই দুই যুযুধান প্রাণীকে বাক্যে ও ভঙ্গীতে তারা আরো উত্তেজিত করে তোলে। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অতিশয় ভীত হয়ে 'বীগ্‌ বীনস্‌' পালাবার উপক্রম করে, একটা বানরের মত লাফাতে লাফাতে সে পালাবার চেষ্টা করে। এদিকে ধোপানী তাকে বাঘিনীর মত বিক্রমে আঁকড়ে ধরেছে। সে তাকে প্রচণ্ড গতিতে ঘোরাতে থাকে, যেন একটা সুতোয় বাঁধা ঢিল, অবশেষে সে ভীষণ আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে। কয়েকজন তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করে। ক্যানডিয়া সেই ধিক্কার-ধ্বনির ভেতর সেখান থেকে চলে এসে নিজের ডেরায় আশ্রয় নেয়। বাড়ি ফিরে সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল, কাঁদে আর আঙুল কামড়ায়, নিজের দুর্দশার নিদারুণ যন্ত্রণায় সে কাতর। কিভাবে সে এখন এই দুর্নাম থেকে আপনাকে মুক্ত করবে? কিভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে! যতই সে নিজের সততা প্রমাণে যুক্তি সন্ধান করার চেষ্টা করে, ততই সে হতাশ হয়ে পড়ে। উঠানে যাওয়াটা খুবই সহজ, ওখানকার দরজা কখনও বন্ধ করা থাকে না।

একতলা থেকে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত উন্মুক্ত—এই দরজা দিয়ে সবাই বেশ অবাধে সে পথে যাতায়াত করে। কেউ জঞ্জাল পরিষ্কার করে, কারো বা অন্য প্রয়োজন। সুতরাং তার যারা অভিযোক্তা তাদের কি করে বল্‌বে—আমি কি ভাবে ঐ উঠানে যেতে পারি? এই ধরণের অভিসন্ধি পুরণ করার উপায় অতি সহজ। ওদের বোঝানোর জন্য ক্যানডিয়া নতুন ধরণের যুক্তি চিন্তা করে। তার বুদ্ধিতে শান দেয়, তিনটি, চারটি, পাঁচটি যুক্তি খুঁজে সে বল্‌তে চায় সে চামচ কখনই কুয়ার ধারে যেতে পারে না—সে আশ্চর্য উদ্ভাবনি শক্তিতে এই সব চিন্তা করে বার করে। তারপর সে সব দোকান ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। সর্বপ্রকারে সবায়ের অবিশ্বাস ভাঙার চেষ্টা করে। সবাই ওর কথা শোনে, বেশ মজা পায় ওর যুক্তি শুনে। তারপর সব শুনে বলে—তা ঠিক বটে। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে এমন এক ভঙ্গী থাকে যা ক্যানডিয়াকে একেবারে খতম করে দেয়। তাহলে তার সব চেষ্টা বিফল, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। তথাপি সে অশেষ ধৈর্য সহকারে যুক্তি সন্ধান করে। সারারাত নতুন যুক্তি খোঁজে।

তারপর ধীরে ধীরে এই নিরন্তর মানসিক ক্লেশ তাকে জীর্ণ করে দেয়। তার মনোবিকার সুরু হয়। আর সে বেশীক্ষণ অন্য কোনো চিন্তা করতে পারে না, খালি সেই রূপার চামচটার কথাই ভাবে। নিজের কাজকর্ম অবহেলা

করার ফলে সে অভাবে পড়ে। লোহার পোলের নীচে নদীটার তীরে যায়, সেখানে অপর ধোপানীরাও কাপড় কাচে, ক্যানডিয়ার হাত থেকে সহসা কাপড় ছিট্‌কে পড়ে নদীর তরঙ্গে ভেসে যায়। আর ক্যানডিয়া আপন মনে একই বিষয় অনর্গল বকবক করে যায়। ওর বকবকানি চাপা দেওয়ার জন্য তরুণী ধোপানীরা গলা ছেড়ে গান ধরে। আর ছড়ার মাধ্যমে ওকে নিয়ে রঙ্গ করে। আর এদিকে ক্যানডিয়া উন্মাদিনীর মত চীৎকার করে। আর অঙ্গ ভঙ্গী করে।

তাকে আর কেউ কাজ দেয় না। দয়া পরবশ হয়ে কোনো কোনো পুরাণো মনিব বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে খাবার পাঠায়। ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করা তার স্বভাবে দাঁড়াল। ছিন্নবস্ত্রে পথে পথে ক্যানডিয়া কুব্জ পৃষ্ঠ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার যত সব ছোঁড়ার দল তার পিছু নেয় আর বলে—ও ক্যানডিয়া ক্যানডিয়া মাসী। একবার সেই চামচের কাহিনীটা বলো না! অচেনা পথিককে পথের মাঝে দাঁড় করিয়া ক্যানডিয়া তাদের সমস্ত ঘটনা বলে, আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখায়। অল্পবয়সীরা মাঝে মাঝে ওকে ডেকে পাঠিয়ে ওর কাহিনী শোনে, আর দু একটা পয়সা দেয়। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার করে শোনে। তার যুক্তির বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি দেয়। কিংবা ওর সব কথা শুনে নিয়ে, শেষে একেবারে চূড়ান্ত বাক্যবাণে তাকে আহত করে। অন্য ভিখারীরা এখন ক্যানডিয়ার সঙ্গী। বিরাম বিহীন উৎসাহে, অক্লান্ত ভঙ্গীতে, অপরাজেয় হয়ে সে বকে যায়। তার সব চেয়ে পছন্দসই বান্ধবী একজন কালা ভিখারিণী, তার দেহের চামড়া যেন ক্ষত-বিক্ষত, সে আবার এক পায়ে খোঁড়া।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে ক্যানডিয়া কঠিন ব্যাধিতে শয্যা নেয়। সেই কালা ভিখারিণী এখন তাকে দেখা শোনা করে। ডনা ক্রিষ্টিনা লামোনিকা তার জন্য কিছু কয়লা সানন্দ উপহার হিসাবে পাঠিয়েছেন।

রুগ্না রমণী ক্যানডিয়া শুয়ে শুয়ে সেই রূপার চামচের কথা বলে চলেছে। সে কনুয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। তারপর হাত দুটি আন্দোলিত করে তার যুক্তিকে জোরালো করার চেষ্টা করে। যখন তার সেই ঘোলা চোখ যন্ত্রণার অশ্রুতে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে তখনও সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলার চেষ্টা করে।

"মাদাম—আমি নয়, আপনি দেখুন—ঐ চামচটা—"



সমরসেট মম

স্যানাটোরিয়ম

যতদিন স্যানাটোরিয়মে ছিল এসেনডেন তার প্রথম ছ' সপ্তাহ তাকে বিছানাতেই শুয়ে কাটাতে হয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় যে সব নার্স তার দেখাশোনা করতো আর যে দাসীটি খাবার নিয়ে আসতো শুধু তাদের ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে পায়নি। লাংসে টি, বি হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়ার পথে বাধা ঘট্‌লো, তাই লণ্ডনের স্পেশালিষ্ট নর্থ স্কটল্যাণ্ডের এই স্যানাটোরিয়মে তাকে পাঠিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সেই প্রত্যাশিত দিনটি এল, এই দিনের জন্যই সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। ডাক্তার দাঁড়াতে আদেশ দিয়েছেন। অপরাহ্নে নার্স এসে সাজ-পোশাক পরিয়ে ধরে ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। তারপর পিঠের ধারে একটি বালিশ রেখে সারা অঙ্গে কম্বল মুড়ে দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের সোনালি রোদ উপভোগ করার সুযোগ দিয়ে চলে গেল। মধ্য-শীতের কাল। পাহাড়ের ওপর এই স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত, এইখানে বসে তুহিনাবৃত শহরের পরিপূর্ণ দৃশ্য পাওয়া যায়। সারাদিন ধরে এই গোটা বারান্দা জুড়ে ডেকচেয়ারে বসে আছেন আরো অনেকে। কেউ পাশের লোকটির সঙ্গে আলাপ করছেন, কেউ বা বই মুখে করে বসে। মাঝে মাঝে কাশির বেগে কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তারপর চোখে পড়ে উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে রুমালের দিকে তাকানো। এসেনডেনকে বসিয়ে চলে যাওয়ার সময় নার্সটি প্রোফেশনাল ভঙ্গীতে পাশের চেয়ারের অধিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে—আপনার সঙ্গে মিঃ এসেনডেনের আলাপ করিয়ে দিই, তারপর এসেনডেনের দিকে ফিরে বলে: ইনি মিঃ ম্যাকলিয়ড। ইনি আর মিঃ ক্যাম্বেল এখানটিতে সব চেয়ে বেশী দিন আছেন।

এসেনডেনের অপর পাশে অর্ধশায়িত রয়েছেন একটি সুদর্শনা তরুণী, মাথায় লাল চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ, মুখে রঙ মাখানো নেই, তবে ঠোঁটদুটি ঘোর লাল আর গালের রঙও চড়া। এর ফলে গায়ের রঙের শুভ্রতা আরো খুলেছে। যদিও অসুখের ফলেই এই হাল্‌কা গাত্রবর্ণ, তবু ভালো লাগে। মেয়েটির গায়ে একটি ফার কোট, আগাগোড়া কম্বলাবৃত, দেহের আর কিছুই দেখার উপায় নেই। মুখখানি আশ্চর্য ক্ষীণ। তার ফলে নাকটি তেমন বড়ো না হলেও চোখা দেখায়। এসেনডেনের দিকে মেয়েটি প্রীতিভরে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না, আর এই ভিড়ের ভেতর এসেনডেনের মনে কেমন কুণ্ঠা জাগে, কথা শোনার আশায় সে চুপ করে থাকে।

ম্যাকলিয়ড বলে—এই প্রথম বুঝি ওরা আপনাকে ছেড়েছে?

—হ্যাঁ।

—আপনার ঘরটা কোথায়? এসেনডেন জিজ্ঞেস করে।

—ছোট্ট ঘর। আমি এখানকার সব ঘর চিনি। সতের বছর আছি। এখানকার সব চেয়ে ভাল ঘরই পেয়েছি, আর তাইত আমার পাওয়া উচিত। ক্যামবেল আমাকে হটানোর চেষ্টা করছে। নিজে থাকতে চায় ওখানে, আমি কিন্তু নড়ছি না। আমার অধিকার আছে। ওর চেয়ে ছ' মাস আগে এখানে এসেছি।

অর্ধশায়িত ম্যাকলিয়ডের আকার দেখে সহজেই অনুমান হয় মানুষটি রীতিমত লম্বা। আর গায়ের চামড়া হাতে এঁটে বসেছে। গাল এবং কপাল খাদে নেমেছে। তার ফলে মাথার খুলির গঠনটা বোঝা যায়। শীর্ণ মুখের কঙ্কালসার নাকের আসরে চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম বড়ো মনে হয়।

এসেনডেন কি যে বলবে ভেবে পায় না, তাই বলে: সতের বছর। অনেক দিন!—সময় তাড়াতাড়ি কাটে! আমার ভালোই লাগে। প্রথম দিকটা, দু'এক বছর থাকার পর গ্রীষ্মকালে কোথাও যেতাম, এখন আর যাই না। এইটিই এখন আমার ঘর-বাড়ি। একটি ভাই, দুটি বোন, তাদের বিয়ে থা হয়েছে, আমাকে তাদের আর প্রয়োজন নেই। এটা জানবেন দু'চার বছর এখানে কাটিয়ে আবার সাধারণ জীবনে ফিরলে একটু কেমন কেমন মনে হবেই। বন্ধুরা যে যার সে তার হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আপনার আর কোনোটা মিল খায় না। কোনো সঙ্গতি নেই। সে এক বেয়াড়া অবস্থা। যাকে বলে বয়ারম্ভে লঘুক্রিয়া, সব কেমন ভ্যাপসা হট্টগোল। এখানে সবাই

একরকম সুখেই আছে। আমাকে কফিনে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে আর ছাড়ছি না।

এসেনডেনের চিকিৎসক বলেছিলেন উপযুক্ত যত্ন নিয়ে সতর্কভাবে চললে বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, সে তাই কৌতুহলভরে ম্যাকলিয়ডের দিকে তাকায়।

সে প্রশ্ন করে—সারা দিনটা কি ভাবে কাটান? কি করেন?

—করবো আবার কি? টি, বি হোল দিন-রাতের রোগ ভায়া! টেম্পারেচার নেওয়া হল ত' ওজন নাও। তাড়াতাড়ি পোশাক পরি, ব্রেকফাষ্ট সারি। খবরের কাগজে পড়ি। একটু বেড়াই। তারপর বিশ্রাম আছে। লাঞ্চ সেরে আবার ব্রিজ খেলি। এরপর আর একবার বিশ্রাম সেরে ডিনার খাই। তারপর ব্রিজখেলা এবং শোওয়া। এখানে বেশ চমৎকার একটা লাইব্রেরী আছে। সব রকম নতুন বই আমরা পাই। তবে বই পড়ার তেমন সময় হয়ে উঠে না। কথাবার্তা বলেই সময়টা কাটে। হরেকরকমের লোক এখানে আসে যায়, অনেক সময় সেরে উঠেছে মনে করে চলে যায়, আবার অনেককে ফিরে আসতে হয়। অনেকে আবার একেবারে পরপারে চলে যায়। কত জনকেই যেতে দেখ্‌লাম, যাবার আগে আরো কত দেখ্‌বো।

এসেনডেনের পাশের মেয়েটি সহসা বলে ওঠে—মিঃ ম্যাকলিয়ডে বাঁধার দেখে এভাবে হাসতে আর কেউ পারে না।

ম্যাকলিয়ড জবাব দেয়—তা জানি না, তবে মানুষের প্রকৃতি ত', তাই মনে-মনে খুশী হই, আমার বদলে অপরকে ওরা নিয়ে চলেছে। এতক্ষণে মনে হল মেয়েটির সঙ্গে এসেনডেনের পরিচয় নেই; তাই পরিচয়সূত্রে বলে—মিঃ এসেনডেনের সঙ্গে বোধকরি আলাপ নেই মিস বিশপ! মেয়েটি ইংরেজ, তবে খারাপ মেয়ে নয়।

এসেনডেন প্রশ্ন করে—আপনি কতদিন আছেন এখানে?

—দু'বছর। এই শেষ শীত। ডাঃ লেনক্স বলেছেন—কয়েকমাসের ভেতরেই সেরে উঠবো, তারপর আর এখানে থাকার প্রয়োজন হবে না।

ম্যাকলিয়ড বলে ওঠে, এর নাম নিছক বোকামি! আমি বলি—যেখানে ভালো আছ সেখানেই থাকোনা বাপু!

এই সময় লাঠিতে ভর দিয়ে এক ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মিস বিশপের নীল চোখে খুশির হাসি, সে বলে—মেজর মেজর

টেম্পলটন এসে গেছেন।—তারপর তিনি আরো কাছে এলে বলে—আপনাকে আবার দেখে ভারি আনন্দ হল।

—কিছু না, একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, এখন বেশ সেরে গেছি।—কিন্তু কথাক'টি মুখ থেকে বেরোনোর সঙ্গেই কাশি সুরু হল। খাটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর সেই ধাক্কাটা কমার পরই আবার মধুর হেসে উঠলেন। বললেন—কাশিটা কিছুতেই কমছে না, ধূমপানের শাস্তি। ডাঃ লেনক্স বলেন ছেড়ে দিতে। সে কি আর হয়, আমার পক্ষে ছাড়া শক্ত।

লোকটি দীর্ঘদেহ, সুদর্শন, একটু নাটকীয় আকৃতি। মুখটি অগভীর, চমৎকার কালো চোখ, আর সুন্দর ঘনকৃষ্ণ গোঁফের বাহার। গায়ে ফার কোট, তার অস্ত্রাখান কলার। ভদ্রলোকের চেহারাটা স্মার্ট তবে একটু চালবাজ। মিস বিশপ এসেনডেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়। আন্তরিকতার ভঙ্গীতে মেজর টেম্পল্‌টন কয়েকটি সৌজন্যসূচক বাক্য-বিনিময় করলেন। তারপর মেয়েটিকে অনুরোধ করলেন ভ্রমণের সঙ্গিনী হওয়ার জন্য। স্যানাটোরিয়মের পিছনে বেড়ানোর অনুমতি পাওয়া গেছে। ম্যাকলিয়ড চুপ করে ওদের এই যাওয়াটা লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন—কে জানে ওদের দুজনের ভেতর কি আছে। সবাই বলে অসুখে পড়ার আগে টেম্পলটনটা নাকি ছিল মেয়েদের যম।

এসেনডেন বল্‌ল—এখন আর সেই আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

—ও কিছুই বলা যায় না। এই ক' বছরে অনেক কাণ্ডই দেখ্‌লাম। ইচ্ছে করলে এন্‌তার কেচ্ছা শোনাতে পারি।

—তা পারেন নিশ্চয়ই। একটা শোনান না।

ম্যাকলিয়ড অর্থসূচকভঙ্গীতে হেসে বললেন—তা হলে একটা কাহিনী বলি শুনুন। তিন চার বছর আগে এখানে এক কড়া ধরনের স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁর স্বামী সাপ্তাহান্তিক অবসরে আসতেন লণ্ডন থেকে বিমানযোগে, স্ত্রীটিকে ভদ্রলোক ভালবাসতেন। ডাঃ লেনক্স বুঝেছিলেন মেয়েটি এখানে অন্য কারো সঙ্গে জুটেছেন। তাই একদিন আমরা শোবার পর মহিলাটির ঘরের দোর গোড়ায় পাতলা করে এক পোঁচ রঙ মাখিয়ে রাখলেন। পরের দিন সকালে সকলের স্লিপার পরীক্ষা করায় আসামী ধরা পড়লো। চমৎকার কায়দা, নয়? স্লিপারের মালিককে গলাধাক্কা খেতে হল। ডঃ লেনক্স এ সব বিষয়ে বেশ কড়া। এখানকার বদনাম রটবে—তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

—টেম্পলটন এখানে কতদিন আছেন ?

—তিন চার মাস। সব সময়েই বিছানায় পড়েছিল। লোকটার মতলব খারাপ। ইভি বিশপ যদি জড়িয়ে পড়ে মরবে। মেয়েটির সেরে ওঠার চান্স্ আছে। আমি অনেক দেখেছি এ সব, তাই বলতে পারি। আমি মুখ দেখেই টের পাই, সেরে উঠ্বে কি মরবে বুঝে নিই। এমন কি কতদিন বাঁচবে তাও বলতে পারি। কদাচিৎ আমার ভুল হয়। আমার হিসেবে টেম্পলটনের মেয়াদ আর দু' বছর।

ম্যাকলিয়ড এসেনডেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকায়, তারপর এসেনডেন উনি কি ভাবছেন বুঝে যদিও মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে তবু উদ্বেগ চাপতে পারে না। ম্যাক্লিয়ডের চোখে হাসি ভেসে ওঠে। এসেনডেনের মনে যে কি খেলছে তিনি বুঝ্তে পারেন। বলেন:—আপনি সেরে উঠবেন। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলে বলতাম না। রোগীদের মনে ঈশ্বর-ভীতি জাগানোর জন্য ডাঃ লেনক্স যে আমাকে চোখ রাঙাবেন এ আমি চাই না।

এরপর এসেনডেনের নার্স তাকে বেডে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এসে গেল। যদিও মাত্র একঘণ্টা এইভাবে বসেছিল তবু বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এসেনডেন, তাই আবার চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে তৃপ্ত হল। ডাঃ লেনক্স সন্ধ্যার দিকে এলেন। টেম্পারেচার চার্ট পরীক্ষা করে বললেন—মন্দ নয়। ভালোই ত'।

ডাঃ লেনক্স বেঁটে-খাটো চট্পটে এবং ভদ্রমানুষ! ডাক্তার হিসাবেও ভালো। চমৎকার ব্যবসাদার আর ভালো মেছুড়ে। মাছধরার মরশুমে এ্যাসিষ্টাণ্টদের হাতে রোগীদের ভার দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। রোগীরা একটু খুঁত-খুঁত করতো। কিন্তু ফিরে এসে যখন রোগীদের মুখ বদলানোর জন্য চারামাছ উপহার দিতেন তখন সব অনুযোগ মুছে যেত। বেশী কথা বলতে ভালোবাসতেন। এসেনডেনের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর খাঁটি স্কচ ভাষায় প্রশ্ন করলেন কারো সঙ্গে আলাপ বা আলোচনা হল কিনা। এসেনডেন বললেন—নার্স মিঃ ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ লেনক্স একথা শুনে হাসলেন,—বললেন:—প্রাচীনতম জীবিত বাসিন্দা। স্যানাটোরিয়াম আর তার অধিবাসীদের সম্পর্কে উনি আমার চেয়েও বেশী জানেন। কি করে যে উনি এত সংবাদ পান তা জানি না। এই বাড়ীর যে-কোনও বাসিন্দার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন কিছু গোপন কথা নেই যা উনি

জানেন না। আর কেচ্ছা সম্পর্কে এত সতর্ক ও আগ্রহশীল দৃষ্টি আর কারও নেই। ঠিক গন্ধ পান। ক্যামবেলের কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, তাঁর কথাও উঠেছিল।

—ক্যামবেলকে ঘৃণা করেন, আর ক্যামবেলও তাই। আশ্চর্য! অথচ এই দুটি প্রাণী এইখানেই সতের বছর আছেন। দুজনেরই একটি করে লাংস ঠিক আছে। এমন কি দুজনে এ-ওর ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। আমার কাছে যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে ছুটে আসে, আমি শুনতে চাই না। ক্যামবেলের ঘরটা ম্যাকলিয়ডের ঘরের ঠিক নীচে। সে বেহালা বাজায়। তাতে ম্যাকলিয়ড ক্ষেপে ওঠে। তার অভিযোগ ঐ একই সুর পনের বছর ধরে শুনছে। ক্যামবেল বলে ম্যাকলিয়ডের সুরের ণত্ব ষত্ব জ্ঞান নেই। ম্যাকলিয়ড চায় ক্যামবেলকে আমি থামাই, আমি তা পারি না। ওর অধিকার আছে বেহালা বাজানোর, শুধু সবাই যখন ঘুমায় সে সময়টুকুতে স্তব্ধ থাকলেই হল। আমি ম্যাকলিয়ডের ঘরটা বদলাতে চেয়েছি, সে তা চায় না। তার বক্তব্য ক্যামবেল ওকে এই ঘর থেকে শুধু তাড়াবার মতলবেই বেহালা বাজায়, এইটাই এখানকার সব চেয়ে ভালো ঘর, ক্যামবেল ওই ঘর পেলে ম্যাকলিয়ড মাথা খুঁড়ে মরবে। অদ্ভুত কাণ্ড! দু'জন মধ্যবয়সী লোক কি করে পরস্পরের জীবন এমন দুর্বিসহ করে তুলেছে বলুন তো। কেউ কাউকে ছেড়েও থাকবে না। একই টেবলে খানা খাবে, এক সঙ্গে ব্রীজ খেলবে, অথচ কোঁদল না করে একটা দিনও ওদের কাটবে না। মাঝে মাঝে ভয় দেখিয়েছি—দুজনকেই আমি হটাবো যদি একটু বিবেচকের মতো ওরা না চলেন। তাতে দুচার দিন বেশ চুপচাপ থাকে। ওরা এখান থেকে চলে যেতেও চায় না। অনেক দিন এখানে আছে, কেউ নেই ওদের যে একটা কানাকড়ি দেয়, বাইরের জগতে ওরা বেমানান। ক্যামবেল কয়েক বছর আগে দুমাসের ছুটি নিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। তার সইলো না। রাস্তার ভিড় দেখে তার ভয় করে।

দুই

শরীর একটু সারতে লাগল ধীরে ধীরে, এ্যাসেনডেন দু'চারজন সহযাত্রী রোগীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বুঝলো এ এক বিচিত্র জগতে সে এসে পড়েছে। একদিন সকালে ডাঃ লেনক্স বললেন, এখন থেকে ডাইনিং রুমে বসেই লাঞ্চ খেতে পারো। ঘরটি বিরাট, কিঞ্চিৎ নীচু, অনেকখানি খোলা জানলা, দিনরাত জানলাগুলি হাট করে খোলা, পরিষ্কার দিন হলে ঘরের ভেতর রোদের ঝলক এসে পড়ে। অনেক লোক, তাদের বাছাই করে নিতে সময় লাগে। সব রকমের মানুষই আছে, যুবা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ। কেউ ম্যাকলিয়ড এবং ক্যামবেলের মত অনেক দিন স্যানাটোরিয়মে আছেন, সেখানেই দেহ রাখার বাসনা! বাকী সবাই মাত্র কয়েক মাস এসেছেন। একজন মধ্যবয়সী চিরকুমারী আছেন, তাঁর নাম এটকিন, প্রতি বছর শীতে এসে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে গ্রীষ্মকালটিতে আত্মীয়-কুটুম্বদের সাহচর্যে দিন যাপনের জন্য অন্যত্র চলে যান। তাঁর বিশেষ কিছু বালাই নেই, এখানেই পুরোপুরি থাকলেই পারেন, তবে এখনও জীবন-পিপাসা অসীম। দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে কিঞ্চিৎ মর্যাদাও লাভ করেছেন, এখানকার অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক এবং মেট্রনের সঙ্গে বিশেষ দোস্তি আছে। সর্বদাই গল্প-গুজবের জন্য প্রস্তুত, তবে অল্পকালের মধ্যে জানা যায় যে যা তাঁকে গোপনে বলবেন তার কিছুই গোপন নেই, ঠিক চালান হয়ে গেছে। রোগীরা সবাই যে একত্রে বেশ আনন্দে আছে এবং ক্রমশঃ সেরে উঠছে, তাঁর কথা মেনে চলছে এ সব ডাঃ লেনক্সের পক্ষে জানা বিশেষ প্রয়োজন। মিস এটকিনের তীক্ষ্ণ চোখে কিছুই এড়ায় না, তাঁর কাছ থেকে যায় মেট্রনের কাছে, সেখান থেকে ডাঃ লেনক্সের কানে; অনেকদিনের পুরানো বাসিন্দা তাই ম্যাকলিয়ড এবং ক্যামবেলের সঙ্গে একই টেবিলে তিনি বসেন, সেই টেবিলে একজন প্রাচীন জেনারেলও বসেন পদাধিকার বলে। টেবিলটা অন্য টেবিলের চেয়ে বিভিন্ন নয়, এমন কি একটু বিচিত্র জায়গায় রাখাও নেই, শুধু পুরাতন বাসিন্দারা বসেন বলে সকলে এই জায়গাটাই বসবার পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করে, কয়েকজন মহিলা রীতিমত অভিযোগ করেন যে, মিস এটকিন গ্রীষ্মকালে তিন চার মাসের জন্য অনুপস্থিত থাকলেও যাঁরা সারা বছর এখানে থাকেন তাঁরা কেন অন্যত্র বসবেন। একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বৃদ্ধ অফিসর আছেন। তিনি অনেকদিন

স্যানাটোরিয়মে আছেন তবে ম্যাকলিয়ড বা ক্যামবেলের চেয়ে বেশী দিন নয়। একদা একটি প্রদেশের তিনি শাসক ছিলেন। আজ তিনি অপেক্ষায় আছেন ম্যাকলিয়ড বা ক্যামবেলের মৃত্যুর, তাহলে তিনি টেবিলে ঠাঁই পাবেন। এ্যাসেনডেনের সঙ্গে ক্যামবেলের পরিচয় হয়েছে। দীর্ঘদেহ, চওড়া মানুষ, মাথা-জোড়া টাক্। এমনই রোগা রোগা যে আশ্চর্য মনে হবে কি করে হাড় ক'খানা জোড়া লেগে আছে। আরামকেদারায় মুড়ে সুড়ে যখন বসেন তখন মনে হয় যেন পুতুল-নাচের পুতুল। ভদ্রলোক স্পর্শকাতর, চড়ামেজাজি মানুষ। এ্যাসেনডেনকে সুরুতেই প্রশ্ন করলেন:

—গানবাজনা ভালো লাগে নাকি আপনার!

—হ্যাঁ!

—এখানকার কেউ গান টান বোঝে না। আমি একটু বেহালা বাজাই। আপনার যদি আগ্রহ থাকে একদিন আমার ঘরে আসবেন আপনাকে বাজিয়ে শোনাব।

ম্যাকলিয়ড কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন—বললেন: কখখনো যাবেন না, সে এক অত্যাচার!

মিস এ্যাটকিন বললেন: এতটা রূঢ় হবেন না, উনি বেশ চমৎকার বাজান।

ক্যামবেল বললেন: এইখানে ক'জন সুরের তারতম্য বুঝতে পারেন?

ম্যাকলিয়ড উপেক্ষার হাসি হেসে চলে গেলেন। মিস্ এ্যাটকিন সামলাবার চেষ্টা করেন: —ম্যাকলিয়ড যা বলেন গায়ে মাখবেন না।

—না, কিছু না।

সেদিন অপরাহ্নে ক্যামবেল বারবার একই সুর বাজালেন। ম্যাকলিয়ড মেঝে ঠুকে প্রতিবাদ জানাল, ক্যামবেল তবু থামবার পাত্র নন, তিনি বাজিয়ে চলেছেন। তারপর ম্যাকলিয়ড একটি চিরকুট পাঠিয়ে জানালেন—মাথা ধরেছে, মিঃ ক্যামবেল দয়া করে যদি থামেন। মিঃ ক্যামবেল জানালেন তাঁর বাজাবার অধিকার আছে, মিঃ ম্যাকলিয়ডের ভালো না লাগলে না শুনলেই পারেন। এর পর উভয়ের যখন দেখা হল তখন কিঞ্চিৎ নরম-গরম কথা কাটাকাটি হল।

এ্যাসেনডেনের টেবিলে সুন্দরী মিস বিশপ, সেই সঙ্গে টেম্‌পেলটন আর লণ্ডনের জনৈক একাউন্ট্যান্ট হেনরী চেস্টার বসলেন। লোকটি মোটাসোটা, চওড়া কাঁধ। ছোট মানুষটি। দেখলে মনে হবেনা যে এঁর টি. বি. হতে

পারে। সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষ। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর। বিবাহিত, দুটি ছেলে আছে। শহরতলীতে সুন্দর বাড়ী আছে। প্রতিদিন সকালে শহরে যান, প্রভাতী সংবাদপত্র পড়েন, শহর থেকে ফিরে সান্ধ্য পত্রিকা নিয়ে বসেন। ব্যবসা এবং নিজের পরিবার ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনো আকর্ষণ নেই। নিজের কাজ ভালোবাসেন। অনেক পয়সা করেছেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার মত অবস্থা। প্রতি বছর একটা বরাদ্দ টাকা জমান। শনিবার বিকাল এবং রবিবারে গল্‌ফ খেলেন, আর প্রতিবছর আগষ্ট মাসে তিন সপ্তাহের জন্য ইষ্ট-কোষ্টে অবকাশ-যাপন করতে যান। ছেলেরা বড় হবে, তাদের বিয়ে থা হবে, তারপর ওঁরা স্বামী-স্ত্রী গ্রামে গিয়ে পরিণত বয়সে ওপারে পাড়ি জমাবেন এই বাসনা। এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁর জীবনের কাম্য নেই। তাঁর সমকালীন হাজার হাজার মানুষ স্বস্তির সঙ্গে এই জীবনই যাপন করে।

তারপর এই কাণ্ড! গল্‌ফ খেলতে ঠাণ্ডা লাগে, বুকে ঠাণ্ডা বসে গেল, কাশী সুরু হল, সে কাশী আর কমে না। চিরদিনই উনি বেশ শক্ত সামর্থ, কোনদিন ডাক্তারের ত্রিসীমানায় যান নি। অবশেষে স্ত্রীর আগ্রহে এক[illegible] ডাক্তারের কাছে যেতে রাজী হলেন। তারপর পেলেন সেই ভয়াবহ আ[illegible] ভয়ঙ্কর কাণ্ড! দুটি লাংসেই যক্ষ্মার আক্রমণ। বাঁচার একমাত্র উপায় অবি[illegible] স্যানাটোরিয়মে দৌড়ানো। স্পেশ্যালিষ্ট তাঁকে জানালেন যে বছর দু'য়েকে[illegible] মধ্যে তিনি আবার কাজে ফিরতে পারবেন। থুতুতে বীজাণু দেখালেন, এক্স-রে[illegible] ফটোতে লাংসের আক্রান্ত অংশের প্যাচ দেখালেন। ভদ্রলোক হতাশ হলেন। মনে হল অদৃষ্ট এক নির্মম, নিষ্ঠুর পরিহাস করেছে। যদি উদ্দাম জীবন যাপন করতেন, অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন, মেয়েদের নিয়ে মাতামাতি করতেন কিংবা গভীর রাত্রি পর্যন্ত হুল্লোড় করতেন তাহলে না হয় এসবের একটা অর্থ হ'ত। তাহলে অবশ্য এই তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তিনি এসবের মধ্যে নেই, তাই এই শাস্তি অন্যায়, অবিচার। নিজের কিছু নেই, পড়া-শোনার আগ্রহ নেই তাই শরীরের কথা ভাবা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এ এক বাতিক হয়ে উঠ্‌লো। সব লক্ষণগুলো উদ্বেগ সহকারে লক্ষ্য করেন। তাঁর থার্মোমিটার কেড়ে রাখা হল, কারণ দিনের মধ্যে বার বার টেম্‌পারেচার দেখছেন। তাঁর মাথায় ঢুকলো যে ডাক্তাররা তাঁর সম্পর্কে অতিশয় উদাসীন তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে তাদের আতঙ্কিত

করে তোলার চেষ্টা করলেন, সেই কৌশল কার্যকরী না হওয়াতে তিনি ক্ষেপে গিয়ে কলহপরায়ণ হয়ে উঠলেন। প্রকৃতিতে লোকটি অবশ্য বেশ সদানন্দময়, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ তাঁর, তাই নিজের কথা যখন ভুলে থাকেন তখন বেশ কথা বলেন এবং মন খুলে হাসেন। তারপর সহসা মনে হয় যে তিনি অসুস্থ মানুষ, তখন তাঁর চোখে জেগে ওঠে মৃত্যুভয়।

প্রতিমাসের শেষে তাঁর স্ত্রী কাছাকাছি একটি হোটেলে এসে দু-একদিন কাটিয়ে যান। ডঃ লেনক্স আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা তেমন সুনজরে দেখেন না। এর দরুণ রোগীদের মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। হেনরী চেস্‌টার যে ভাবে স্ত্রীর আগমনের অপেক্ষায় দিন কাটাতেন তা দেখ্‌লে কষ্ট হ'ত। তবে আশ্চর্য কাণ্ড, পত্নীর আগমনের পর তাঁর এই আনন্দ যেন হ্রাস পেত। মিসেস চেস্‌টার চমৎকার হাসিখুশী রমণী। তেমন সুন্দরী না হলেও পরিচ্ছন্ন এবং তাঁর স্বামীর মতই সাধারণ মানুষ। তাঁর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় তিনি সুগৃহিণী, জায়া এবং জননী। শান্ত, শিষ্ট, সুন্দর মানুষটি, কারো সাতে-পাঁচে নেই। এতদিনের নিস্তরঙ্গ গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে উনি শান্তিতেই ছিলেন। একমাত্র আগ্রহ ছিল সিনেমার ছবি দেখার আর নর বিরাট পণ্যশালার নীলাম দেখা, কোন দিন এসব তাঁর কাছে একঘেয়ে হয়নি। এতে তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেতেন। এ্যাসেনডেনের তাঁকে ভালো লাগত। যখন তিনি তাঁর ছেলের সম্পর্কে বা শহরতলীর ঘরকন্নার সংবাদ নিয়ে বকবক করতেন, তাঁর পড়শীদের গল্প বা আর সব খুঁটিনাটি আলোচনা করতেন, এ্যাসেনডন মন দিয়ে শুনতেন। একদিন পথে দেখা হয়ে গেল। চেস্‌টার চিকিৎসার ব্যাপারে স্যানাটোরিয়মে আটক ছিলেন, মহিলাটি একা। এ্যাসেনডেনই প্রস্তাব করল—চলুন দুজনে একটু হাঁটা যাক। কিছুক্ষণ নানা আলোচনা হল। তারপর সহসা মহিলাটি প্রশ্ন করলেন তাঁর স্বামী কেমন আছেন মনে হয়।

—আমার ত' মনে হয় বেশ সেরে উঠ্‌ছেন।—বল্‌লেন এ্যাসেনডেন।

—এমন ভাবনায় পড়েছি, কি বলব!

—জানেন ত', এ রোগ অতি ধীর গতিতে চলে, যেন দেওয়ানী মামলা। ধৈর্য চাই।

আর কিছুদূর যাওয়ার পর এ্যাসেনডেন দেখলেন মহিলাটি কাঁদছেন।

এ্যাসেনডেন শান্ত গলায় বললেন—এত উতলা হবেন না।

—জানেন না ত এখানে আমি কি ভাবে আসি। আমার কিছু বলা উচিত নয়, তবু না বলে পারছি না। আপনাকে বিশ্বাস করে বল্‌তে পারি ত' ?

—নিশ্চয়ই।

—আমি ওঁকে ভালোবাসি, আমি ওঁর অনুরাগী। এমন কাজ নেই পৃথিবীতে ওঁর জন্যে যা আমি করতে পারি না। কোনোদিন আমাদের কলহ হয়নি। কোনো বিষয়ে মতান্তর হয় নি। এখন উনি আমাকে ঘৃণা করেন বুঝ্‌ছি, তাই আমার মন ভেঙে গেছে।

—আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি যখন এখানে থাকেন না, উনি সব সময় খালি আপনার কথাই বলেন। এর চেয়ে ভালো করে বলতে কেউ পারেন না। উনি আপনাকে খুবই ভালোবাসেন।

—হ্যাঁ, যখন আমি এখানে থাকি না। কিন্তু যখন এখানে এসে হাজির হই এখন সামনাসামনি আমাকে সুস্থ সমর্থ দেখে ওঁর মন খারাপ হয়। ওঁর খারাপ লাগে এই ভেবে যে উনি অসুস্থ আর আমি সুস্থ। উনি মারা যাবেন, আমি বেঁচে থাক্‌বো—তাই এই ঘৃণা। আমাকে সব কথা সতর্ক হয়ে বলতে হয়, ছেলেদের কথা, কি ভবিষ্যতের কথা, তিনি ক্ষেপে ওঠেন, আঘাত দিয়ে কথা বল্‌বেন। বাড়ীর জন্য বা চাকর বাকরদের সম্পর্কে কোনো কথা বলে ফেললে তিনি একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। ওঁর অনুযোগ আমি যেন ওঁকে হিসেবের মধ্যেই ধরছি না, আমরা এতই মিলেমিশে ছিলাম, আজ মনে হয় দুজনের মধ্যে একটা বিদ্বেষের পাঁচিল উঠেছে। ওঁকে অবশ্য দোষ দিতে পারি না। এ সবেরই কারণ ওঁর অসুখ। উনি চমৎকার মানুষ, দয়ার শরীর। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ সরল মানুষ। এখন এখানে আসতে আমার ভয় করে, এখান থেকে গেলে স্বস্তি পাই। আমার যদি টি. বি হয়, উনি ভীষণ দুঃখ পাবেন। তবে মনে মনে কিছু স্বস্তি পাবেন। যদি বোঝেন আমারও মৃত্যু আসন্ন আমাকে ক্ষমা করবেন। মাঝে মাঝে উনি মারা যাওয়ার পর আমার কি কি করণীয় সেই সব উপদেশ দিয়ে যন্ত্রণা দেন। যখন আমি ক্ষেপে উঠি, কাঁদি, তখন উনি থামেন, বলেন ওঁর একটু সুখের জন্য আমার এ সব সহ্য করা উচিত। ওঁর মৃত্যুর পর অনেক বছর আমি সুখে থাকতে পারব। এতদিন আমরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে যে আনন্দ পেয়েছি তার এই অপমৃত্যু কি ভয়ঙ্কর তাই ভাবি

মিসেস চেস্টার পথে একটি পাথরের উপর বসে কেঁদে কেঁদে [redacted]

নামালেন। এ্যাসেনডেন তাঁর দিকে করুণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার মুখে সান্ত্বনার ভাষা যোগালো না। যা ওঁর মুখে শুনলো তা তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেনি।

অনেক পরে মিসেস চেস্টার বল্‌লেন—আমাকে একটি সিগারেট দিন। আমার চোখ লাল এবং ফুলে থাকা ঠিক নয়। হেনরী তাহলে বুঝবে আমি কাঁদছিলাম। মনে করবে ওর সম্বন্ধে কোনো খারাপ খবর পেয়েছি। মৃত্যু কি এতই ভয়ঙ্কর! আমরা সবাই কি মৃত্যুকে ভয় করি?

এ্যাসেনডেন বল্‌লো—কি জানি, আমি জানি না।

—আমার মা যখন মারা যান। তাঁর মনে এতটুকু কষ্ট হয় নি। তিনি জানতেন মৃত্যু আসন্ন। তাই নিয়ে হাসি-তামাশা করতেন, তবে তাঁর বয়স হয়েছিল।

মিসেস চেস্টার সামলে নিলেন। আবার দুজনে পথ চলতে থাকে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিক্রম করে দুজনে।

অনেক পরে মিসেস চেস্টার বললেন—আমি যা বললাম তার ফলে হেনরী সম্পর্কে আপনার মনে খারাপ ধারণা হবে না ত'!

—নিশ্চয়ই নয়।

—উনি স্বামী এবং পিতা হিসাবে চমৎকার ছিলেন। এমন মানুষ জীবনে দেখিনি। এই অসুখের আগে ওঁর মনে এতটুকু অকরুণ বা অভব্য ভাব জাগেনি কোনো দিন।

এই আলাপচারণা এ্যাসেনডেনের মনকে বেদনায় ভরিয়ে দেয়। মানুষ অনেক সময় বলে মানবিক প্রকৃতি সম্পর্কে তার ধারণা অতি খারাপ। তার কারণ সাধারণ মাপকাঠিতে তারা সব মানুষকে বিচার করে না। ম্লান হেসে, চোখের জলে বা কাঁধ নাড়িয়ে সে অনেক কথা প্রকাশ করে যা অপরকে বিহ্বল করে ফেলতে পারে। সত্যি ভাবা যায় না যে, ঐ শান্ত প্রকৃতির সাধারণ মানুষটির মনে আছে এত জ্বালা এবং তিক্ততা, তবে কে বল্‌তে পারে মানুষ কতদূর নামতে পারে বা কোথায় উঠ্‌তে পারে? আসল ত্রুটি আদর্শের দৈন্য। হেনরী চেস্টার সাধারণ জীবন-যাপনের উপযোগী হয়ে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে। জীবন যাপনের স্বাভাবিক বিপর্যয়ের সহনীয়তা তার মনে। যখন অচিন্তনীয় দুর্বিপাকের মুখোমুখি এসে পড়েছে তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে। ...বাট কারখানায় আরও হাজার হাজার ইটের টুকরোর মতো সেও তার নিজস্ব ...গার উপযোগী, ঘটনাচক্রে তার মধ্যে একটু খুঁত ধরা পড়েছে, তাই

সেখানে তার স্থান নেই। ইটেরও যদি মন থাকতো তাহলে হয়ত সেও কেঁদে উঠতো: কি আমি করেছি যে, আমার সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে পারবো না। আর সব ইটের মাঝ থেকে আমাকে সরিয়ে আবর্জনার গাদায় রাখা হবে?

এই নিদারুণ অবস্থাকে যথোচিত সহনশীলতার সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি বলে হেনরী চেস্টারকে দায়ী করা যায় না। সবাই চিন্তা বা আর্টের মধ্যে শান্তি খুঁজে পায় না। বর্তমান কালের ট্রাজেডি এই যে, মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে, তাঁর মধ্যেই আছে আশা ও আশ্বাস। যে শান্তি থেকে এই পৃথিবীতে তাঁরা বঞ্চিত সেই শান্তি হয়ত পাওয়া যেত। ঈশ্বরের বিকল্পেও তারা কিছুই পায় নি।

অনেকে বলে ক্লেশ মানুষকে মহানুভব করে তোলে। কথাটি ঠিক নয়। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের স্বার্থপর, কলহপরায়ণ ও নীচ করে তোলে, তবেএই স্যানাটোরিয়মে তেমন ক্লেশ নেই। টিউবারকুলেসিসের কোনো বিশেষ পর্যায়ে যে জ্বর হয় তা রোগীকে না দমিয়ে উত্তেজিত করে তোলে, তাতে রোগী সতর্ক হয়ে থাকে, আশাহীন হয়ে ভবিষ্যৎকে পালিশ-বিহীন অবস্থায় গ্রহণ করে! তবু মৃত্যুর চিন্তা তার অবচেতন মনকে দগ্ধ করে যেন চটুল অপেরার মূল সুরঝঙ্কার, কখনো মধুর, কখনো করুণ, কখনো নৃত্য আর কখনো বা বিয়োগ-বেদনার সুরে ওঠা নামা করে। করুণা এবং আতঙ্ক হৃদয়কে স্তব্ধ করে দেয়। গভীর অরণ্যে আসন্ন ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের মতো মমতাহীন মৃত্যুর পদধ্বনি কানে এসে বাজে।

তিন

এসেনডেন এই স্যানাটোরিয়মে আরো কিছুদিন কাটানোর পর কুড়ি বছরের একটি ছেলে এসে ভর্তি হল। ছেলেটি নৌ-বাহিনীতে সা ব মে রি নে র সাব-লেফটানাণ্ট ছিল, তাকে একেবারে উপন্যাসের ভাষায় গ্যালপিং ক্ষয়রোগে ধরেছে। ছেলেটি দীর্ঘদেহ, সুশ্রী চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো বাদামী চুল, নীল চোখে আর মুখে মধুর হাসি। এসেনডেন তাকে দু-তিনবার বারান্দায় রৌদ্রে শুয়ে থাকতে দেখে, দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলে কাটায়। চমৎকার হাসিখুশী ছেলেটি। সে গীতিনাট্য এবং চিত্রতারকাদের

আলোচনা করে, বক্সিং আর ফুটবলের খবরের জন্য খবরের কাগজ পড়ে। তারপর তাকে একেবারে বিছানাবন্দী করা হল, আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হল, দুমাসের ভেতরেই ছেলেটি মারা গেল। কোনো অনুযোগ না রেখেই ছেলেটি চলে গেল। পশু যেমন কি হচ্ছে না হচ্ছে বোঝে না, তার অনুভূতিও ছিল সেই জাতের। দু'একদিন স্যানাটোরিয়মে সেই বিষাদের যবনিকা নেমে এল, জেলখানার আসামীর ফাঁসির পর ওখানকার বাসিন্দাদের যেমনটি হয়ে থাকে, সেই অবস্থা; তারপর যেন সর্বসম্মতিক্রমে, এবং আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতাবশতঃ ছেলেটিকে মন থেকে মুছে ফেলা হয়। তারপর দৈনিক তিনবেলা আহার, ক্ষুদে মাঠে গলফ্ খেলা, বিধিবদ্ধ ব্যায়াম এবং বিশ্রাম, কলহ-ঈর্ষা-পরচর্চা, তুচ্ছ মান-অভিমান আগের মতই অব্যাহত-গতিতে চল্‌তে থাকে। ম্যাকলিয়ডকে ক্ষেপিয়ে ক্যাম্‌বেল তার বেহালায় 'এ্যানি লরি' সুর বাজিয়ে চলে। ম্যাক্‌লিয়ড তার অসামান্য ব্রীজপটুত্ব এবং অপরের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সেই ভাবেই কথা বলে বেড়ায়। মিস এ্যাটকিনের পরের পিছনে লাগার বিরাম নেই। হেনরী চেস্‌টারের অনুযোগ ডাক্তাররা তার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিচ্ছেন না, আর যে আদর্শ জীবন তিনি এতদিন যাপন করে এসেছেন তারপর এই যে অদৃষ্টের লাঞ্ছনা তার জন্য কপালকে শাপান্ত করেন। এসেনডেন একমনে বই পড়ে যান, আর সহযাত্রীদের জীবনের ঝামেলা নিয়ে এই যন্ত্রণা সহনশীল ভঙ্গিতে উপভোগ করেন!

মেজর টেম্‌পেলটনের সঙ্গে এসেনডেনের ঘনিষ্ঠতা হল। টেম্‌পেলটনের বয়স চল্লিশের কিছু বেশী। গ্রিনেডিয়ার গার্ডস বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের পর কমিশন ছেড়ে দিয়েছেন। প্রচুর অর্থসম্পদ থাকায়, এর পর আমোদের বন্যায় গা ভাসিয়ে দেন। রেসিং সিজনে রেস, স্যুটিং সিজনে বন্দুক ছুঁড়ে পাখিশিকার আর হান্টিং সিজনে বড় রকমের শিকারে সময় কাটিয়েছেন। এইসব যখন শেষ হ'ত তখন মণ্টিকারলোয় যেতেন। ব্যাকারাট নামক জুয়ায় তিনি কি পরিমাণ অর্থ জিতেছেন এবং হেরেছেন তা এসেনডেনকে বলেছেন। নারীজাতির প্রতি তাঁর প্রচণ্ড লোভ, আর তাঁর সব কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নারীরাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। উত্তম আহার এবং পানীয়ের তিনি ভক্ত। লণ্ডনের যে সব হোটেলের উৎকৃষ্ট খাদ্যের সুনাম আছে সেখানকার [illegible]ন ওয়েটারের ডাকনাম তাঁর জানা।

প্রায় আধ ডজন ক্লাবের তিনি সদস্য। কয়েক বছর ধরে উদ্দেশ্যহীন, প্রয়োজনহীন, মূল্যহীন স্বার্থপর জীবন তিনি কাটিয়েছেন। উত্তরকালে আর কারো পক্ষে এমনটি কাটানো সম্ভব নয়, কিন্তু এই ভদ্রলোক ঐ প্রকার জীবন রীতিমত উপভোগ করেছেন।

এসেনডেন একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—আবার যদি এই রকম সময় ফিরে পান কি করবেন। উত্তরে মেজর জানিয়েছিলেন—যথাপূর্বং তথা পরং।

চমৎকার কথা বলেন ভদ্রলোক, আনন্দময় এবং মধুর শ্লেষে ভরা। সব জিনিষের একেবারে গভীরে চলে যান, অর্থ যা তিনি জানেন এবং যা বলেন তার মধ্যে হাল্‌কা, সহজ এবং নিশ্চয়তার স্পর্শ থাক্‌তো।

প্রৌঢ়া আইবুড়ীদের জন্য তাঁর মুখে মধুর উক্তি এবং তিতিবিরক্ত বৃদ্ধদের জন্য থাক্‌তো সৌজন্যভরা সদয় সরলতা। এসব তাঁর ভব্যতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। যাদের অনেক টাকা এবং সেই টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না সেই কৃত্রিম সংসারের ভাবগতিক টেম্‌পেলটনের অজানা নেই, আবার মে ফেয়ার সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান সুগভীর। ইনি সেই জাতের মানুষ যাঁরা সর্বদাই বাজী ধরতে রাজী বা বন্ধুকে সাহায্য করতে কিংবা ধূর্তকে সহজেই দশটা টাকা ধার দিয়ে দিতে পারেন। পৃথিবীর তেমন মঙ্গল না করলেও, পৃথিবীর অনিষ্টও করেন নি। আসলে লোকটির মোট মূল্য একেবারে শূন্য। তবে অনেক গুণী এবং সদ্‌গুণবিশিষ্ট মহৎ মানুষের চাইতেও লোকটি সহচর হিসাবে গ্রহণীয়। এখন বিশেষ অসুস্থ, মৃত্যুমুখে, এবং সেকথা তাঁর অজানা নেই। যে ভাবে, সহজ ভঙ্গীতে জীবনের সবকিছু গ্রহণ করেছেন সেই দীপ্ত ভঙ্গীতে এই অবস্থা মেনে নিয়েছেন। চমৎকার সুসময় কাটিয়েছেন, এখন অনুতাপ নেই—টি, বি.-র আক্রমণ ভাগ্যের এক অপরিসীম বিড়ম্বনা। মরুকগে, কেউ চিরদিন বাঁচে না, তাছাড়া ভেবে দেখ্‌লে যুদ্ধেও ওর মৃত্যু ঘট্‌তে পারতো, কিংবা হাতাহাতি লড়ায়ে ঘাড়টা ভাঙতে পারতো। ভদ্রলোকের আজীবন অনুসৃত নীতি—বাজী ধরে যদি হেরে থাকো, দিয়ে দাও। বাজে বাজী হলেও ভুলে যাও সেকথা। অর্থের বিনিময়ে সুষ্ঠু জীবন উপভোগ করেছেন, এখন শান্তি। চমৎকার পার্টি, কিন্তু সব পার্টিরই শেষ আছে। পরের দিন সকালে দুধের বোতলের আবির্ভাবের সঙ্গে যদি বাড়ী ফিরতে হয়, কিংবা পার্টি যখন পুরোদমে চল্‌ছে তখনই যদি উঠে পড়তে হয়, তাতেই বা কি!

স্যানাটোরিয়মের আর সকলের চাইতে দৈনিক মাপকাঠির বিচারে

ভদ্রলোকের এক কানাকড়িও দাম নয়; কিন্তু ইনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত নিরাসক্ত নিস্পৃহতায় অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর মুখে কদলীপ্রদর্শন করেছেন, এখন ভদ্রলোকের এই আচরণের ভালো বা মন্দ দিক বিচার করুন।

ভদ্রলোক যখন স্যানাটোরিয়মে এসেছিলেন তখন অন্ততঃ একথা ভাব্‌তে পারেন নি যে জীবনে যা হয়নি এইখানে তার চেয়ে গভীরতর প্রেমে পড়তে পারেন। তাঁর প্রণয়লীলা অসংখ্য, কিন্তু লঘু। কোরাস গার্লদের ব্যবসাদারী প্রেম বা হাউস-পার্টিতে দেখা সুলভ চরিত্রের মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক মিলনেই তার পরিসমাপ্তি। সর্বত্র এবং সর্বদাই তিনি নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে পড়েন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব মজা উপভোগ করব। তবে তিনি স্ত্রীলোক ভালোবাসতেন। এমনকি আবেগ ও মাধুরীমাখানো কণ্ঠে বয়স্কা রমণীদের সঙ্গেও কথা বল্‌তেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য সবকিছু করতেই রাজী। টেম্‌পলটনের এই আগ্রহ সম্পর্কে তাঁরাও সচেতন খুশী হতেন এবং ভাবতেন যে লোকটিকে বিশ্বাস করলে সে তাঁদের বিপদে, ফেলবে না, এ ধারণা ভুল। একবার এমন একটি কথা বলেছিলেন যা অনাসৃষ্টির পরিচায়ক বলে মনে হয়েছিল এসেন্‌ডেনের—

"জানেন, যে-কোনো মানুষ যে-কোনো স্ত্রীলোককেই পেতে পারে যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এর মধ্যে অসম্ভব কিছুই নেই, কিন্তু একবার পাবার পর তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাকে অপমানিত না করে মুক্তিলাভের পথ নেই।"

নিছক অভ্যাসের বশেই তিনি এভি বিশপের সঙ্গে প্রেমলাপ সুরু করলেন। এই স্যানাটোরিয়মের সে-ই কনিষ্ঠতমা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেয়ে। এসেনডেন প্রথমটা যেমন মনে করেছিলেন সে অবশ্য ততটা কমবয়সী নয়, তার বয়স উনত্রিশ, গত আট বছর ধরে এক স্যানাটোরিয়ম থেকে অন্য স্যানাটোরিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের স্যানাটোরিয়মের ছায়ানীড়ে সে তার তারুণ্যকে অটুট রেখেছে, তাই মনে হয় যেন সবে কুড়িতে পা দিয়েছে। যা কিছু তার শিক্ষা সব এই স্যানাটোরিয়মে, তার ফলে সারল্যের সঙ্গে কৃত্রিমতার এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ ঘটেছে। অনেক প্রেমলীলা সে ঘটতে দেখেছে। বিভিন্ন জাতের অনেক পুরুষ তাকে প্রেম নিবেদন করেছে। তাঁদের সেই আগ্রহ আগ্রহ হয়ে সে

গ্রহণ করেছে। তাঁরা একটু বেশী মাত্রায় অগ্রসর হতেই দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। এমন কুসুম-পেলব আকৃতিতে চারিত্রিক দৃঢ়তা দুর্লভ, খেলা শেষ করার সময় স্পষ্ট, পরিষ্কার শান্ত ভঙ্গীতে বক্তব্য পেশ করার শক্তি তার ছিল। জর্জ টেম্‌পলটনের সঙ্গে প্রেমলীলার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। এ খেলা সে বোঝে, তার কাছে মধুর হলেও, এভির ভঙ্গীতে এমন লঘুতা ছিল যে মানুষটিকে সে বুঝে নিয়েছে এবং টেম্‌পলটন বিষয়টিতে গুরুত্ব দিলেও তার সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নি।

এসেনডেনের মত টেম্পলটনও প্রতি সন্ধ্যায় ছ'টার সময় বিছানা নিত এবং নৈশ আহার ঘরেই সমাধা করতো। সুতরাং এভির সঙ্গে দেখা হ'ত শুধু দিনের বেলা। দুজনে একটু বেড়াতো, তা ছাড়া ক্বচিৎ একা থাকতো। লাঞ্চের সময় এভি, টেম্‌পলটন, হেনরী চেসটার এবং এসেনডেনের মধ্যে যে কথাবার্তা চল্‌ত তা অতি সাধারণ। এসেনডেনের মনে হত এভির জন্য টেম্‌পলটনের আগ্রহ দিন দিন গভীর এবং ঐকান্তিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এভি যে এসব বোঝে বা তার কাছে এর কোনো অর্থ আছে, তা কিন্তু টের পাওয়া যেত না।

টেম্‌পলটন যখনই এমন কোনো মন্তব্য করে বস্‌তো ঘটনার অনুপাতে যা অতিরিক্ত চটুল, তখন এভি শ্লেষাত্মক জবাব দিয়ে সকলকে হাসিয়ে তুলতো। টেম্‌পলটনের হাসি কিন্তু বিরক্তিমেশানো, তাকে তুচ্ছ ভাঁড় মনে করবে এভি এ তার সহ্য হয় না। এভি বিশপকে যত দেখছেন, এসেনডেনের আকর্ষণ ততই তার প্রতি বাড়ছে। তার এই রোগজীর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন বেদনা মেশানো আছে। এমন স্বচ্ছ, সুন্দর, গাত্রবর্ণ, এমন সুকুমার মুখশ্রী আর তার ওপর অমন বড়ো একজোড়া সুন্দর নীল চোখ, আর তা ছাড়া তার এই দুর্দিন আরো বেদনাময়। কারণ এই পৃথিবীতে সে একান্ত একাকী।

ওর মা সামাজিক জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বোনেদের বিবাহ হয়েছে। এই তরুণীর জীবনের সঙ্গে আজ আট বছরের বেশী বিচ্ছিন্ন থাকায়, এভির প্রতি ওদের আগ্রহও হ্রাস পেয়েছে। এই নিদারুণ পরিস্থিতি বিনা তিক্ততায় মেনে নিয়েছে এভি। সকলের প্রতি এভি বন্ধু-ভাবাপন্ন, সকলকার দুঃখদুর্দশার খুঁটিনাটি কথা সমবেদনা সহকারে শোনার জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত। খানিকটা অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাতো এভি হেনরী চেষ্টারের ওপর, তাকে খুশী রাখার জন্য যতটা পারত চেষ্টা করতো।

একদিন লাঞ্চের পর এভি বল্‌ল—মিঃ চেষ্টার এই ত মাসের শেষ, আপনার স্ত্রী কাল আসবেন ? দিনটি প্রতীক্ষা করার মতো, কি বলেন ?

প্লেটের দিকে দৃষ্টি রেখে শান্ত গলায় চেষ্টার বল্‌লেন—না, এই মাসে উনি আসছেন না।

"তাই নাকি ! আহা সরি ! কেন আসবেন না ! ছেলেমেয়েরা সব ভালো ত ?"

"ডাঃ লেনক্স মনে করেন এ সময় ওঁর না আসাই বরং ভালো।"

চারিদিক স্তব্ধতা, এভি ওর মুখের পানে বিপন্ন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ! টেম্‌পলটন খুশী খুশী ভঙ্গীতে বলে—"এ বড় বেয়াড়া কাণ্ড ভায়া ! লেনক্সকে বলুন, তুমি জাহান্নামে যাও।"

চেষ্টার বললেন—"ডাক্তাররাই সবকিছু ভালো বোঝেন।"

এভি ওর দিকে আর একবার তাকিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যায়।

পিছনে তাকিয়ে এসেনডেন বুঝলেন এভি আসল সত্যটা অনুমান করেছেন। পরদিন চেষ্টারের সঙ্গে বেড়াবার সময় এসেনডেন বললেন—

"আপনার স্ত্রী আসছেন না শুনে সত্যি ভারি দুঃখিত। নিশ্চয়ই আপনার ভীষণ মন কেমন করবে।"

"ভী ষ ণ।"

এসেনডেনকে আপাঙ্গে দেখলেন চেষ্টার, এসেনডেন বুঝলেন কিছু বলার আছে হয়ত ! কিন্তু মুখ দিয়ে সেই কথা বার করতে পারছেন না। অবশেষে বিরক্তিভরে কাঁধ নেড়ে চেষ্টার বললেন—"উনি যে আসছেন না, সে আমারই দোষ। আমিই লেনক্সকে বলেছিলাম ওঁকে আসতে মানা করে দিন। আর সহ্য হয় না। সারা মাস ধরে ওর আগমন-প্রতীক্ষায় থাকি। আর ও এলে ওকে দেখলেই কেমন ঘৃণা হয়। এই বিশ্রী অসুখটার জন্য এমনই আমার মনোকষ্ট। ও বেশ শক্তসমর্থ, শরীরে শক্তি আছে। ওর চোখে বেদনার আভাস দেখলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। তাতে ওর সত্যি কি কিছু এসে যায় ? আপনার অসুখ করলে কার কি ? সকলে এমন ভাব দেখায় যেন কত দুঃখ, তবে সবাই খুশী যে অসুখটা আপনার, তাদের নয়। আমি যেন একটা শুয়ারের মত কথা বল্‌ছি, নয় ?

এসেনডেনের মনে পড়ল পথের ওপরে পাথরের ওপর বসে পড়ে মিসেস চেষ্টার কি ভাবে কেঁদেছিলেন, বললেন—"ওকে এমন অসুখী করতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না ?"

"সহ্য করুক। নিজের যন্ত্রণায় আমি মরছি, আর অপরের কথা ভাবতে পারি না।" কি যে বলবেন ভেবে পান না এসেনডেন, দুজনে নীরবে বেড়াতে লাগলেন। সহসা উত্তেজিত গলায় চেষ্টার বললেন—"যতদিন বাঁচবেন আপনার পক্ষে নিরাসক্ত বা স্বার্থলেশশূন্য হয়ে থাকা সম্ভব নয়। আমি মরতে বসেছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমি মরতে চাই না। কেন মরবো? এই কি ভগবানের ন্যায়বিচার—!"

চার

সময় কেটে যায়। স্যানাটোরিয়মের মত স্থানে—সময় এবং মন ভরানোর বেশী কিছু বৈচিত্র্য যেখানে অপ্রতুল সেখানে অতি অল্পকালের মধ্যেই সবাই জান্‌লো জর্জ টেম্‌পলটন এভি বিশপের প্রেমে পড়েছেন। তবে এভির মনোভাব যে কি, কি যে তার প্রতিক্রিয়া বলা কঠিন। তার সঙ্গ সে ভালোবাসে, পছন্দ করে বোঝা যায়, তবে সেই সান্নিধ্য তার কাম্য নয়, এমন কি মনে হত সে বিশেষ কৌশলে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, একত্রে একা না থাকার চেষ্টা করে। দু একজন মধ্যবয়সী মহিলা ফাঁদ পেতে তাকে একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ধরবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাদের ওপরে যায়, এভি। ঈশারা ও ইঙ্গিতে উপেক্ষা করে তাদের প্রশ্নের মুখের মত জবাব দিয়ে হেসে উঠেছে। তাঁদের হারিয়ে দিয়েছে।

'এমন বোকা মেয়ে সে নয় যে লোকটি ওর প্রেমে পাগল এ কথা বোঝে না।'

'লোকটিকে নিয়ে এমন খেলানোর কোনও অধিকার ওর নেই।'

'আমার মনে হয় ওঁর মত এভিও ওঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

ম্যাকলিয়ডই চট্‌লো সবচেয়ে বেশী।

ছিঃ ছিঃ কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত! যাই হোক এর পরিণাম কিছু ঘটবে না। ওর সারা বুকটা টি. বি. তে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, এভিরও তদবস্থা।

ক্যামবেলের উক্তি কিঞ্চিৎ স্থূল।

'যতক্ষণ সম্ভব মজা লুটে সময়টা ওরা কাটাক আমার আপত্তি নেই। কিঞ্চিৎ ঢলা-ঢলি যে চল্‌ছে না তা নয়, তবে তার জন্যে ওদের দোষ ধরি না।'

ম্যাকলিয়ড বলে ওঠে—'তুমি একটি কুৎসিত মানুষ!'

'ছেড়ে দাও ভাই! কিছু আদায় না করলে অমন মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি

করার মানুষ টেম্‌পলটন নয়, আর এভিও কিছু কিছু জানে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

এসেনডেন ওদের দুজনকে অপরের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশীই বোঝেন, দেখেনও বেশী। টেম্‌পলটন একদিন ওর কাছে মনের কথা বলে ফেললেন। নিজের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি কৌতুকবোধ করছেন—

'আমার এই বয়সে এই সময়ে এমন একটি সুশীলা মেয়ের প্রেমে পড়াটাই বিচিত্র। আমি নিজেই এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারিনি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমি একেবারে ডুবে গেছি, গলায় গলায়। আমার শরীর যদি সুস্থ থাকতো তাহলে বলতাম কালই বিয়ে হোক। কোনদিন ভাবিনি কোনো মেয়ে এত ভালো হতে পারে। চিরদিন ভেবেছি সুন্দরী মেয়ে বিশেষ বিরক্তিকর। কিন্তু এই মেয়েটি মোটেই 'বোর' নয়, এতটুকু বিরক্তি উদ্রেক করে না। বেশ চতুরা। কি গায়ের রঙ রে বাবা! কি চুল! কিন্তু এই সব দেখে যে আমি ঘায়েল হয়েছি তা নয়। আমার কি অবস্থা জানো ভাই! ভেবে দেখলে হয়ত হাস্‌বে, রীতিমত হাস্যকর ব্যাপার! আমার মতো বুড়ো মড়া, সততার কথা শুনলে আমার মুখে হায়েনার হাসি ভেসে ওঠে। স্ত্রীলোকের কাছে এই জিনিষটাই আমি কোনোদিন খুঁজিনি, কিন্তু এই মেয়ের মধ্যে তা আছে। মেয়েটি ভালো। আর সেই চিন্তাই আমাকে কেঁচো করে দিয়েছে। বিস্মিত হচ্ছ? না!

এসেনডেন বললেন—'না একটুও না। একথা সত্য নারীর মোহে যাঁরা মজেছেন সেই সব বাউণ্ডুলেদের মধ্যে আপনিই প্রথম নন। এ হল মধ্য-বয়সের ভাবাবেগ!'

টেম্‌পলটন হেসে বলে ওঠেন—'ডার্টি ডগ। মেয়েটি এই সব ব্যাপারে কি বলে?'

'হা ভগবান!—তুমি কি মনে করো ওকে সব বলেছি? আমি ওকে একটিও কথা বলিনি যা অপরের সামনে বলা যায় না। আমি হয়ত আর দু'মাস বাঁচবো, তা ছাড়া অমন একটি মেয়েকে আমার দেওয়ারই বা কি আছে?

এতদিনে এসেনডেন বুঝেছেন যে ওরা দুজনেই পরস্পরের প্রেমে পড়েছে। ডাইনিং রুমে টেম্‌পলটনের আবির্ভাবে এভির গালদুটি কিরকম রাঙা হয়ে উঠে তা নজরে পড়েছে, টেম্‌পলটন যখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন তখন দু একবার লঘু দৃষ্টিতে কি মধুর ভঙ্গীতে চুরি করে দেখে এভি তাও চোখে পড়েছে।

পুরানো দিনের অভিজ্ঞতা যখন টেম্পলটন বলেন তখন এভির মুখে এক অপূর্ব মধুর হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আলিসার ধারে বসে রোগীরা যেমন তুষারভাঙা রোদের তাপটুকু পোহায় সেই আরামেই টেম্পলটনের প্রেমের উত্তাপ উপভোগ করছে এভি। হয়ত এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট, তবে টেম্পলটনকে এভির মনের কথা জানাবার কোনো দায়িত্ব অন্ততঃ এসেনডনের নেই।

ইতিমধ্যে এই নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহে একটা বিক্ষোভ উঠল একদিন। ম্যাকলিয়ড এবং ক্যামবেল সর্বদাই খড়্গহস্ত হলেও উভয়ে একত্রে ব্রিজ খেলতেন, টেমপলটন আসার আগে পর্যন্ত ওঁরাই ছিলেন এখানকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। দুজনের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব, পুরাতনের পুনরাবৃত্তির বিরাম নেই, তবে এই দীর্ঘদিনে উভয়ে উভয়ের খেলাটা বুঝেছিলেন, আর একজন অপরকে হারাতে পারলে চূড়ান্ত আমোদ উপভোগ করতেন।

টেমপলটন কিছুতেই ওঁদের সঙ্গে খেলতে চাইতেন না। নিজে পাকা খেলোয়াড় হলেও এভি বিশপকে পার্টনার করে খেলতে পছন্দ করতেন। ম্যাকলিয়ড এবং ক্যামবেলের এতে আপত্তি ছিল না কারণ মেয়েটা খেলা নষ্ট করে দেয়, এমনই মেয়ে সে, যদি ওর দোষে খেলায় হার হয় এবং রাবার না পাওয়া যায় ও হেসে বলে উঠবে—তবু কৌশলের প্রভেদ, এই যা, এ আর কি!

একদিন অপরাহ্ণ এভি'র মাথা ধরেছিল সে ঘর থেকে বেরোয় নি। টেম্পলটন সেদিন ক্যামবেল-ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে খেলায় রাজী হল। দলের ভেতর এসেনডেন চতুর্থ পক্ষ। মার্চ মাসের শেষের দিক, তবু ক'দিন ধরে তুষার পড়ছে। তিনদিক খোলা এক বারান্দায় মাথায় টুপী আর ফারকোট গায়ে দিয়ে সেই হিমেল হাওয়ায় ওরা সবাই তাস খেলত। টেমপলটনের মত জুয়াড়ীর পক্ষে বাজির টাকা অতি অল্প। খেলাটা তাই সিরিয়স ভঙ্গীতে নিতে পারে না, তাঁর ডাক তাই অতি দুঃসাহসিক। তবে আর তিনজনের চাইতেও এত ভালো খেলতেন যে প্রায় মেরে দিত বা কাছাকাছি পৌছাত তার কন্ট্রাক্ট। অনেক ডাবলিং আর রি-ডাবলিং, কার্ড উঠতো সপ্তমে, যাকে বলে উদ্দাম খেলা, আর ম্যাকলিয়ড আর ক্যামবেলের জিভের লাগাম থাকতো না। সাড়ে পাঁচটায় সুরু হত লাষ্ট রাবার, কারণ ছ'টায় ঘণ্টা বাজতো বিশ্রামে যাওয়ার এই রাবার একেবারে জীবন-মরণ পণের খেলা, ম্যাকলিয়ড আর ক্যামবেল দুজনে দুজনের বিরোধী পক্ষে। দুজনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যা জেতে। ছ'টা বাজতে

দশে 'গেম অল', শেষ হাতের খেলা। টেমপলটন ম্যাকলিয়ডের পার্টনার, এসেনডেন ক্যামবেলের। বিডিং সুরু হল ম্যাকলিয়ডের টু ক্লাবস নিয়ে, এসেনডেন কিছু বলবেন না, টেমপলটন দেখলেন তার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে, অবশেষে ম্যাকলিয়ড চূড়ান্ত হাঁক দিলেন। ক্যামবেল ডাবল—তারপর ম্যাকলিয়ড রি-ডাবল। এই সংবাদ পেয়ে অন্য টেবলের খেলোয়াড়বৃন্দ এই টেবলের খেলা দেখার জন্য ঝুঁকে পড়েছেন, সকলে নিঃশব্দে খেলা দেখছে, উৎসুক দর্শকদের সামনে খেলা চলেছে। ম্যাকলিয়ডের মুখ উত্তেজনায় শাদা হয়ে উঠেছে, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তাঁহার হাত কাঁপছে। ক্যামবেল অতি গম্ভীর। ম্যাকলিয়ড জিতল। দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল, ম্যাকলিয়ড বিজয়গর্বে উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল, ক্যামবেলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করা হল।

সে চীৎকার করে ওঠে—"তোমার লক্ষ্মীছাড়া বেহালাটা নিয়ে বাজাব। ডাবল-রি-ডাবল। চিরদিন এই চেয়েছি—আজ তাই হল। বাই গড্‌—গড্‌।" হাঁফাতে থাকে ম্যাকলিয়ড, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে পড়ল। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল, পরিচারকরা দৌড়ে এল। ম্যাকলিয়ডের মৃত্যু হয়েছে।

দুদিন পরে ওকে কবরস্থ করা হল। অতি ভোরে শেষকৃত্য সম্পাদিত হল। অন্য রোগীদের এই দৃশ্যে ব্যস্ত না করাটাই উদ্দেশ্য। গ্লাসগো থেকে কালো পোশাকে জনৈক আত্মীয় এসেছিলেন যোগ দিতে। কেউ ওকে পছন্দ করতেন না। কেউ শোকপ্রকাশ করলো না, সিভিলিয়ান অফিসর টেবলে তাঁর আসনটি গ্রহণ করলেন আর ক্যামবেল এতদিনের প্রার্থিত ম্যাকলিয়ডের শূন্য ঘরটি দখল করলেন।

ডাঃ লেনক্স এসেনডেনকে বললেন—"এতদিনে শান্তি হল। বছরের পর বছর ধরে এই দুজনের অভিযোগ আর পাল্‌টা জবাব শুন্‌তে শুন্‌তে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। বুঝলেন, স্যানাটোরিয়ম চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুঝুন এত জ্বালিয়ে অবশেষে এই ভাবে মৃত্যু!

এসেনডেন শুধু বল্‌লেন—"এ একটা শক্‌, জানেন।"

"লোকটা একেবারে অপদার্থ ছিল, তবু জানেন, দু চারজন মহিলা রীতিমত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। বেচারী মিস বিশপ ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিলেন।"

'আমার মনে হয় এখানকার ঐ একটি প্রাণীই নিজের জন্য না কেঁদে ম্যাকলিয়ডের দুঃখেই কেঁদেছেন।'

ক্রমে জানা গেল একটি মানুষ কিন্তু তাকে ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। ক্যামবেল যেন হারানো কুকুরের মত থাকে। আর ব্রীজ খেলে না, কথা বলে না, কোনো সন্দেহ নেই ম্যাকলিয়ডের জন্যই তাঁর এমন মনমরা ভাব। কয়েকদিন নিজের ঘরেই রইলেন, খাবার সেখানেই বয়ে নিয়ে দিতে হ'ত। তারপর একদিন ডাঃ লেনক্সকে গিয়ে বললেন—আগের ঘরের মতই এই ঘরটাও পছন্দ নয়, বরং সেই ঘরেই ফিরিয়ে দিন। ডাঃ লেনক্স ক্ষেপে উঠলেন, অথচ কদাচিৎ তিনি মেজাজ খারাপ করেন। তিনি ওঁকে বললেন, আজ ক'বছর ধরে সমানে এই ঘরটির জন্য জ্বালিয়েছেন, এখন হয় এই ঘরেই থাকুন, নয় স্যানাটোরিয়ম ত্যাগ করুন।

ক্যামবেল ঘরে ফিরে এসে বিষাদ-গম্ভীর মুখে আকাশ পাতাল ভাবে।

মেট্রন একদিন অবশেষে প্রশ্ন করলেন—"আর কই বেহালা বাজান না ত? আমি ত প্রায় পক্ষাধিক কাল আপনার বেহালার আওয়াজ শুনিনি।"

'আমি আর বাজাই নি।'

'কেন বাজান নি?'

'আর সে মজা নেই। আগে বাজিয়ে একটা মজা পেতাম, জানতাম বাজনা শুনে ম্যাকলিয়ড ক্ষেপে যায়, এখন আর আমি বাজাই না বাজাই, কারো কিছু আসে যায় না। আর কোনোদিনই বাজাবো না।'

এ্যাসেনডেন যতদিন স্যানাটোরিয়মে ছিলেন ক্যামবেলের বাজনা শোনেন নি। আশ্চর্য কাণ্ড! ম্যাকলিয়ড আর নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সব মজা চলে গেছে। আর কেউ ঝগড়া করার নেই, কেউ চটবার নেই, জীবনের প্রেরণা নষ্ট হয়েছে, স্পষ্টই বোঝা যায় এইবার তাড়াতাড়ি শত্রুর অনুসরণ করে কবরে স্থান নেবেন।

ম্যাকলিয়ডের মৃত্যুতে টেমপলটনের মনে অন্য এক প্রতিক্রিয়া জাগল। তার অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া ঘটলো অবিলম্বে। এ্যাসেনডেনকে বেশ ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় টেমলটন বললেন—

'গ্র্যাণ্ড! কি চমৎকার! বিজয়ের পরিপূর্ণ গরিমায়, সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এই ভাবে মহাপ্রয়াণ। এখানকার সবাই ব্যাপারটি এভাবে কেন নিল বুঝি না। লোকটি দীর্ঘদিন এই খানেই ছিলেন ত', কেমন, ছিলেন না?'

'তা আঠারো বছর ত বটেই।'

'কি জানি, এর কি দাম! তার চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব হিসেব নিকেশ চুকিয়ে ফেলাই ভালো।'

'জীবনটা কি চোখে দেখ্ছি, তার ওপরই সেটা নির্ভর করে।'

'কিন্তু এই কি জীবন?'

এর উত্তর এসেনডেনের জানা নাই। কয়েক মাসে সে সেরে উঠতে পারে। কিন্তু টেমপলটনকে দেখলেই বোঝা যায় সে আর সারবে না। তাঁর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে।

পাঁচ

টেমপলটন বললেন—"জানেন আমি কি করেছি? এভিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানিয়েছি।"

এসেনডেন চমকে উঠে বললেন—'তিনি কি জবাব দিলেন?'

'—আহা, বেচারীর ভালো হোক, সে বলল এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনে নি, আর এইরকম এক উদ্ভট চিন্তা আমার অসুস্থ মস্তিকের লক্ষণ।'

'—কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন এ আপনাকে মানতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, তবে ও আমাকে বিয়ে করছে।'

'নিছক পাগলামি।'

'হয়ত তাই, যাই হোক লেনক্সের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে তাঁর মতামতটা জানতে হবে।'

অবশেষে শীত কেটে এল। পাহাড়ের গায়ে তুষার তখনো লেগে আছে, তবে সমতলে বরফ গলেছে, বার্চ গাছের ডগায় ইতিমধ্যে নতুন পাতা গজিয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মধুমাসের মাদকতা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যের তাপ চড়া, সকলে সতর্ক আর কেউ কেউ খুশী। যাঁরা পাকা ঘুঁটি, এখানে শুধু শীতটা কাটিয়ে যান, তাঁরা দক্ষিণে যাত্রার মতলব করছেন। টেমপলটন এবং এভি উভয়ে ডাক্তার লেনক্সের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উভয়ের মনের কথা জানানো হল। ডাক্তার তাদের পরীক্ষা করলেন, এক্স-রে করা হল এবং বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করাও হল। ডাঃ লেনক্স একটি দিন স্থির করলেন, সেই দিন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফলাফল জানাবেন।

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মুখে এসেনডেনের সঙ্গে দেখা হল। ওরা দুজনেই বেশ উদ্বিগ্ন, তবে এই নিয়ে মস্‌করা করার চেষ্টা করিছিল। ডাঃ লেনক্স তাদের পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি তাদের শারীরিক অবস্থার কথা ব্যক্ত করলেন।

অবশেষে টেমপলটন বললেন—'সবই ত শুনলাম, ভালো মন্দ কথা, কিন্তু আমরা জানতে চাই বিবাহ করতে পারি কি ?'

'সেটা খুব সুবিবেচনার কাজ হবে না।'

'আমরা তা বুঝি, কিন্তু কিছু কি এসে যায় ?'

'সন্তানাদি যদি হয় তাহলে তা চূড়ান্ত অপরাধ হবে।'

এভি বলল—'ও মতলব আমাদের নেই।'

'বেশ, তাহলে অল্প কথায় জানিয়ে দিই, অবস্থাটা কি রকম বলছি। তারপর তোমার যা বিবেচনা হয় কোরো।'

টেমপলটন এভির দিকে তাকিয়ে হেসে তার হাতটি মুঠির মধ্যে ধরলেন। ডাক্তার বলতে লাগলেন—'মিস বিশপ স্বাভাবিক জীবনধারণের মত শক্ত সমর্থ অবস্থা কোনদিন ফিরে পাবেন আমার মনে হয় না। তবে গত আট বছর ধরে যেমন কাটাচ্ছেন, যদি সেই ভাবে—'

'মানে স্যানাটোরিয়মেই ?'

'হ্যাঁ! আমার ত মনে হয় বেশ কিছুদিন বাঁচবে, তবে পাকা বুড়ী হয়ে মরতে না পারলেও যতদিন খুশি এইভাবে বাঁচতে পারো। রোগটা এখন একটু শান্ত, যদি বিবাহ করে এবং সাধারণ জীবনযাত্রা সুরু করা যায় তাহলে সংক্রামণকারী বীজাণু আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, আর তার ফল কি হবে কেউ বলতে পারে না। আর টেমপলটন তোমাকে সম্পর্কে আমি আরো সংক্ষেপেই বলি,—এক্স-রে ফটো তুমি নিজেই দেখেছ, তোমার লাংস টিউবারকুল ব্যাসিলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। যদি বিয়ে করো ছ'মাসের মধ্যে মারা যাবে।'

'যদি বিয়ে না করি, ক'বছর বাঁচবো ?'

ডাক্তার ইতস্তত করলেন।

টেমপলটন বললেন—'ভয় নেই, সত্যি কথা বলতে পারেন।'

'দুই বা তিন বছর।'

'ধন্যবাদ, শুধু এইটুকু জানতে চেয়েছিলাম।'

যেমন ভাবে এসেছিল তেমনই হাতে হাত জড়িয়ে দুজনে চলে গেল। উভয়ের মধ্যে কি কথা হয়েছিল কেউ জানে না। যখন লাঞ্চের টেবলে এল

তখন দুজনের মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। চেসটার এবং এসেনডেনকে ওরা জানালো যে, বিবাহের লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারলেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে, আর দেরি নয়।

তার পর এভি চেষ্টারের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—আমাদের বিয়েতে আপনার স্ত্রী যদি আসেন ত ভারি আনন্দ হবে। তিনি কি আসতে পারবেন?'

'আপনাদের কি এখানেই বিয়ে হবে না কি?'

'হ্যাঁ। আমাদের আত্মীয়স্বজনরা আপত্তি করবেন নিশ্চয়ই, তাই বিয়ে না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাউকে জানাচ্ছি না। ডাঃ লেনক্সকেই সম্প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাবো।'

এই পর্যন্ত বলে চেস্টারের মুখের দিকে মোলায়েম ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল এভি, এইবার সে কিছু বলুক, এতক্ষণ তার কোনো কথার জবাব সে দেয়নি। অপর দুজন ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন।

কথা বলার সময় চেসটারের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল—

'আপনি ওঁকে আমন্ত্রণ করেছেন এ আপনার করুণা। আমি ওঁকে চিঠি দেব এবং আসার কথা বলব।'

রোগীদের মধ্যে খবরটা যখন ছড়িয়ে পড়ল, যদিও প্রকাশ্যে সবাই ওদের অভিনন্দন জানালো, আড়ালে সবাই কিন্তু বলল কাজটি অবিবেচকের মত হচ্ছে। স্যানাটোরিয়মের কোনো ঘটনাই চাপা থাকে না, জানাজানি হয়ে যায়; তাই যখন সবাই জানতে পারল টেমপলটনকে ডাঃ লেনক্স কি বলেছেন, তখন তারা আশঙ্কায় নির্বাক হয়ে গেল।

এমনকি এখানকার নির্বোধতম ব্যক্তিও এই দুটি নরনারীর গভীর ভালোবাসার কথা জেনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল, কি নিবিড় ভালোবাসা ওদের, যার জন্যে এমন আত্মত্যাগে ওরা প্রস্তুত, এই মরণ-আলিঙ্গনে ঝাঁপিড়ে পড়া। স্যানাটোরিয়মে করুণা ও শুভেচ্ছার নির্ঝর প্রবাহিত হল, এতদিন যাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল তাঁরা এখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন। অনেকে ক্ষণিকের জন্য নিজেদের জীবনের সমস্যা এবং উদ্বেগ বিস্মৃত হল। সকলেই যেন এই সুখী প্রণয়ীযুগলের সুখে সমান অংশীদার। শুধু বাসন্তী বাতাসের আকুলতা নয়, মধুমাস অন্তরে যে নতুন আশা এনেছে তা নয়, এই দুটি নরনারীর মধ্যে যে অপার্থিব প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করা গেল তার প্রভাব সকলের জীবনে যেন সঞ্চারিত হল।

এভি আনন্দময়ী, শান্ত, সমাহিত। উত্তেজনায় ও আবেগে তাকে আরো সুন্দরী এবং অল্পবয়সী মনে হচ্ছে। টেমপলটনের ত মাটিতে পা পড়ে না। সে হাসে, ঠাট্টা করে, যেন এই সংসারে কিছুই গ্রাহ্য করে না। দেখলে মনে হবে তার সামনে পড়ে আছে নিরবচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্যের মসৃণ পথ।

একদিন কিন্তু টেমপলটন এসেনডেনকে গোপনে বললেন :

'এই জায়গাটা মন্দ নয়, এভি বলেছে, আমার মৃত্যুর পর সে এখানেই ফিরে আসবে, এখানকার সবাইকে সে জানে, তেমন নিঃসঙ্গ মনে হবে না তার।'

এসেনডেন বললেন : 'ডাক্তারদেরও মাঝে ভুল হয়। আপনি যদি সাবধানে থাকেন তাহলে কেন যে অনেকদিন বাঁচবেন না বুঝি না।'

"আমি মাত্র তিনমাস সময় চাই। ঐটুকু সময় পেলেই আমার যথেষ্ট। আমি ধন্য হব।"

মিসেস চেস্টার বিবাহের দুদিন আগে এসে পড়লেন।

কয়েক মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি। দুজনের কেমন সলজ্জ ভাব। সহজেই বোঝা যায় উভয়ে নিভৃতে দেখা হলে বিব্রত এবং কিন্তু কিন্তু বোধ করবে। তবু চেস্টার অবসাদ কাটানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এই সময় এমনই হয়, সব সময়, খাওয়ার টেবিলে সে খুশী খুশী ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। অসুখে পড়ার আগে যেমন আনন্দময় মানুষ ছিল আবার তাই হওয়ার ভাব দেখায়।

বিবাহের আগের দিন রাত্রে সবাই একত্রে আহার করলেন।

টেমপলটন এবং এসেনডেন দুজনেই ডিনারের বস্‌লেন, শ্যাম্‌পেন পান করলেন। রাত দশটা পর্য্যন্ত বসে হাসি তামাশা করলেন।

পরদিন প্রাতে গীর্জায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। এসেনডেন নিতবর। স্যানাটো-রিয়মের সবাই, অন্ততঃ যাঁরা দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন তাঁরা এই উৎসবে যোগ দিলেন। লাঞ্চের অব্যবহিত পরেই নব-বিবাহিত দম্পতি গাড়িতে বেরিয়ে পড়বেন মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। কে একজন গাড়ির পিছনে একপাটি পুরানো জুতা বেঁধে দিয়েছে। টেমপলটন এবং তাঁর স্ত্রী স্যানাটোরিয়ম থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁদের মাথায় পুষ্পবর্ষণ করা হল। গাড়ী চলে যাওয়ার সময় জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল। যেন তারা যুগপৎ প্রেম ও মৃত্যুর লক্ষ্যপথে

এগিয়ে চল্‌ল। ধীরে ধীরে ভিড় কমে গেল। চেস্‌টার এবং তাঁর স্ত্রী পাশাপাশি চলেছেন।

কিছুদূর যাবার পর চেস্‌টার স্ত্রীর হাতখানি নিজের হাতের মুঠিতে সলজ্জ ভঙ্গীতে ধরলেন। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেস্‌টারের স্ত্রী লক্ষ্য করলেন স্বামীর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

চেস্‌টার বললেন : "আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি তোমার সঙ্গে অতি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছি।"

স্খলিত কণ্ঠে স্ত্রী জবাব দেন—"আমি জানি সে তোমার মনের কথা নয়।"

"না, সেই ছিল তখন আমার মনের কথা। আমি ভেবেছি আমি যখন কষ্ট পাচ্ছি, তখন তুমিও কিছু কষ্ট পাও, কেন আমি একা যন্ত্রনা ভোগ করবো। কিন্তু আর নয়। এই টেমপলটন আর এভি বিশপের ব্যাপার দেখ—কথাটা কিভাবে বলা যায় তা জানি না, আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। সবকিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখ্‌তে শিখেছি। জানো, এখন আর মৃত্যুকে ভয় করি না। প্রেমের কাছে মৃত্যু কিছু নয়। আমি চাই তুমিও বাঁচো। সুখে থাকো। আর তোমার ওপর এতটুকু ঈর্ষা নেই, বিদ্বেষ নেই, আর কোনো জ্বালা নেই। কোনো কিছুর ওপর আমার বিতৃষ্ণা নেই। আমি যে মারা যাবো, তুমি নয়, এই এখন আমার আনন্দ। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যা মঙ্গলকর সে সবই আমি তোমার জন্য আজ কামনা করি। আমি যে তোমাকে ভালবাসি!"



জঁা পল সারতে

প্রাচীর



প্রকাণ্ড একটা সাদা ঘরের ভেতর আমাদের ঠেলে দিল, অতি-ঝাঁঝালো আলো চোখে এসে পড়ায় আমাকে চোখের পাতা বন্ধ করতে হল। একটা টেবল দেখতে পেলাম, চারজন অসামরিক কর্মচারী কাগজপত্র দেখছিল। পিছনে আরো একদল কয়েদীদের দাঁড় করানো হয়েছে, সমগ্র ঘরটি অতিক্রম করে আমরাও সেইদলে ভীড়লাম.। এদের কয়েকজন আমার পরিচিত, অবশিষ্ট অবশ্য অচেনা। একেবারে সামনের দুজন বেশ সুপুরুষ, প্রায় একরকম দেখতে, হয়ত ফরাসী। সর্বকনিষ্ঠটি প্যান্টটা ধরে টানছিল, দুর্বল স্নায়ু!

এইভাবে তিনঘণ্টা কাট্‌ল। আমি অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মাথায় একটা নিদারুণ শূন্যতা। ঘরটি কিন্তু উষ্ণ, ঐটুকু আরাম অনুভব করি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শীতে কেঁপেছি।

প্রহরীরা একে একে বন্দীদের টেবলের ধারে আন্‌ছিল। ঐ চার ব্যক্তি তাদের নাম, ধাম পেশা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন বেশীদূর গড়ায় না, শুধু হয়ত প্রশ্ন করে—সমরোপকরণের কারখানা ধ্বংসে তোমার কি অংশ ছিল? কিংবা সেই সকালে তুমি কি করেছিলে?

তারা কিছু জবাব শুনছে না, অন্ততঃ শুনছে এমন মনে হল না। একমুহূর্ত নীরব থেকে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল তারপর লিখতে শুরু করল। টমকে প্রশ্ন করল সে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছিল, একথা সত্য কিনা ?

টম অস্বীকার করতে পারে না, তার জামার পকেটেই দলিলপত্র পাওয়া গেছে। জুয়ানকে কোনো প্রশ্নই করা হল না, শুধু নামটা জিজ্ঞাসা করে দীর্ঘক্ষণ ধরে কি সব লিখতে থাকে।

জুয়ান বলে—আমার ভাই অ্যানার্কিষ্ট (নৈরাজ্যবাদী), আপনারা ত জানেন সে আমার কাছে থাকে না, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। রাজনীতির সঙ্গে কোনোদিনই আমার সম্পর্ক নেই।

কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো উত্তর নেই। জুয়ান তবু বলে—আমি ত কিছু অন্যায় করিনি, অপরের দোষে কেন আমার শাস্তি হবে ?

তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে, একজন প্রহরী এসে তাকে নিয়ে যায়। এইবার আমার পালা।

—তোমার নাম পাবলো ইব্বিয়েতো ?

—হ্যাঁ।

কাগজপত্র পরীক্ষা করে লোকটি প্রশ্ন করে—র‍্যামন গ্রীস এখন কোথায় ?

—জানি না।

—ছয় তারিখ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত তোমার বাড়িতে তাকে লুকিয়ে রেখেছিলে ?

—না।

কয়েকমিনিট ধরে কি সব লিখল, তারপর প্রহরীরা আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বারান্দায় টম আর জুয়ান অপেক্ষা করছিল, তাদের দুপাশে দুজন রক্ষী। সবাই চলতে সুরু করলাম।

টম প্রহরীকে প্রশ্ন করল—ততঃকিম্ ?

প্রহরী বলে—কিসের কি !

—আমাদের কি শুধু প্রশ্ন করা হল, না বিচার হয়ে গেল ?

—বিচার এবং রায়। প্রহরী গম্ভীর গলায় বল্‌ল।

—আমাদের কি হবে জানো ?

শুকনো গলায় প্রহরী জবাব দেয়—তোমাদের সেলে গিয়ে রায় পড়ে শোনানো হবে। তখন জানতে পারবে।

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কারাকক্ষগুলি হাসপাতালের অন্ধকার ভাঁড়ার ঘর। এদিকে ভীষণ শীত, তার ওপর ঠাণ্ডা হাওয়া। আমরা সারারাত শীতে কাঁপতে লাগলাম। এর আগে পাঁচদিন মধ্যযুগীয় এক গির্জাঘরের গুপ্তকক্ষে কাটিয়েছি। বন্দীদের সংখ্যা বেশী, এদিকে স্থানাভাব, তাই যত্র তত্র রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই নির্জন কক্ষে মন্দ ছিলাম না তবে নিঃসঙ্গতা একটুকুতেই অসহ্য হয়ে ওঠে। এখানে অবশ্য সঙ্গী পাওয়া গেল। জুয়ান কদাচিৎ কথা বলে, তা ছাড়া সে ভয় পেয়েছে। বয়সে বালক, বল্‌বেই বা কি! টম কিন্তু সঙ্গী হিসেবে চমৎকার, সুন্দর স্প্যানীস্ জানে।

এই কক্ষে একটা বেঞ্চ আর চারটে মাদুর পাতা। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবার পর আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে টম বল্‌লে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিল—।

আমি বল্‌লাম—আমারও ত তাই মনে হয়, তবে ঐ ছোকরাটিকে ছেড়ে দেবে বলে বোধ হচ্ছে।

—ওর বিরুদ্ধে ত কিছু পায়নি, তবে ওর ভাই সামরিক ব্যক্তি এই যা।

জুয়ানের দিকে তাকালাম, তার চোখের ভাব এমন, যেন কিছুই সে শোনেনি।

টম বল্‌তে থাকে—জানো, সারাগোসায় ওরা কি করেছে? বন্দীদের ধরে রাস্তায় শুইয়ে তার ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিয়েছে। মরোক্কোর এক পলাতক বন্দী আমাকে বলছিল গুলি বারুদ বাঁচাবার জন্যই নাকি এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি বল্‌লাম—কিন্তু এতে ত, পেট্রল বাঁচে না। টমের কথা শুনে আমার গা জ্বালা করে, ওর কথার মানে হয় না।

টম বলে চলে—অফিসাররা সিগারেট মুখে নিয়ে আবার এই সব তদারক করে বেড়ায়। তোমার বুঝি ধারণা লোকগুলিকে সোজাসুজি মেরে ফেলা হয়? তা নয় মোটেই। অনেকক্ষণ চীৎকার করে—হয়ত কয়েক ঘণ্টা ধরে। মরোক্কোর সেই লোকটি বল্‌ছিল দেখে শুনে সে তাজ্জব বনে গিয়েছে।

আমি বল্‌লাম—গোলা বারুদের নেহাৎ অভাব না ঘট্‌লে ওরা এখানে ওই রকম করবে বলে মনে হয় না।

চারটে গবাক্ষ আর এক পাশের ছোট্ট ফুটো দিয়ে আলো আসছিলো। এই গর্তের ভিতর দিয়ে কয়লা ঢালাই করা হত। তাই ফুটোর ঠিক নীচেই কয়লার গুড়ো জড়ো করা রয়েছে। হাসপাতাল গরম রাখার জন্য কয়লার আমদানী হত। যুদ্ধের ফলে রোগীদের স্থানান্তর করা হয়েছে, কয়লা অবশ্য রয়ে গেছে।

টম কাঁপছে—হা প্রভু যীশু ! শীতে মরে গেলাম।

আবার সুরু হল।

উঠে দাঁড়িয়ে টম কসরৎ সুরু করে, তার অঙ্গ সঞ্চালনে লোমশ বুকের অংশ দেখা যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে শূন্যে পা ছোড়ে, যেন বাইসিকল চড়ছে। আমি দেখলাম তার শরীর কাঁপছে, তার দেহ শক্ত তবে মেদবহুল। ভাব্‌ছিলাম একটু পরেই বন্দুকের গুলি বা ধারালো সঙ্গীন ঐ নরম মাংস-বহুল দেহে গিয়ে বিঁধবে ! লোকটা রোগা হলে একথা ভাবতাম না।

আমার তেমন শীত করছিল না। তবে কাঁধ এবং হাত অসাড় হয়ে এসেছে। বার বার মনে হয় কি যেন হারিয়েছি। চারদিক তাকিয়ে কোটটা খুঁজছিলাম, সহসা মনে হয় কোটটা ওরা ফেরৎ দেয়নি। এ এক অস্বস্তি, আমাদের পোষাক নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেছে। আমাদের পরণে শাদা সার্ট আর হাসপাতালের রোগীদের পাজামা। কিছু পরে টম উঠে আমার পাশে বস্‌ল। ওর দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে।

—কেমন ? গরম বোধ হচ্ছে ?

—হা ভগবান ! একটুও নয়, এদিকে দম বেরিয়ে আসছে !

রাত আটটার পর একজন অফিসার এলেন, সঙ্গে দুজন সৈনিক। হাতে একটি কাগজ। ওয়ার্ডারকে প্রশ্ন করলেন, এদের নাম কি ?

—ষ্টেইনবেক, ইব্বিয়েতো আর মিরবাল। ওয়ার্ডার জবাব দেয়।

অফিসার চোখে চশমা পরে হাতের তালিকাটি দেখেন। ষ্টেইনবেক, এই যে,—তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কাল সকালে গুলী করা হবে।

তারপর কাগজপত্র আবার দেখে বল্‌লেন—অপর দুজনেরও তাই।

জুয়ান বলে—তা হতেই পারে না, আমি নিশ্চয়ই নই। অফিসার সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন।

—তোমার নাম কি ?

—জুয়ান মিরবাল।

অফিসার কাগজপত্র দেখে বল্‌লেন—এই ত' স্পষ্ট লেখা রয়েছে, তোমার প্রাণদণ্ড হল।

জুয়ান বলে—কিন্তু আমি ত' কিছু করিনি।

অফিসারটি কাঁধ নাড়া দিলেন, তারপর টমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন—তোমরা বাস্‌ক ?

—একজনও নয়।

অফিসারটির মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। বল্‌লেন—ওরা যে বলছিল তিনজন বাস্‌ক আছে এই দলে। যাক্‌গে তাদের পিছনে ছুটোছুটি করার সময় আমার নেই। তোমাদের পাদ্রীর প্রয়োজন নেই ত'?

আমরা কেউ উত্তর দিলাম না।

অফিসার বল্‌লেন—আচ্ছা আমি একজন বেলজিয়ান ডাক্তারকে পাঠাব, তিনি রাতটা এখানে থাকবেন। এই বলে সামরিক ধরণে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

টম বল্‌ল—কি বলেছিলাম, এখন হল।

আমি বল্‌লাম—হ্যাঁ, সবই ঠিক। তবে ঐ ছেলেটির জন্য বড় দুঃখ হয়। ওর প্রতি অবিচার হয়েছে।

ভদ্রতার খাতিরে কথাগুলি বলেছিলাম, ছেলেটাকে কিন্তু আমার এতটুকু ভালো লাগেনি। সরু মুখ, ভয়ে সমস্ত দেহ বিকৃত। মাত্র তিনদিন আগে ওর মুখাকৃতি ছিল শিশুর মত। এখন এর মধ্যেই যেন সে কত বুড়ো হয়ে গেছে। বোধহয় ছাড়া পেলেও ওর যৌবন আর ফিরবে না। ভাবলাম বরং কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করা যাক্‌, কিন্তু করুণা প্রদর্শনে আমার বিরক্তি আছে, আমি আতংকিত হই। সে কিন্তু নির্বাক,—ওর মুখ এবং হাত ধূসর হয়ে এসেছে। সে বসে পড়ল, বড় বড় চোখ মেলে মাটির পানে তাকিয়ে রইল। টমের মনটা শাদা, সে ওর হাতটা ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু জুয়ান ধাক্কা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল,—বিকৃত মুখভঙ্গী করল।

আমি মৃদুগলায় বল্‌লাম—ছেড়ে দাও, এখনি হয়ত কাঁদবে।

দুঃখিতচিত্তে টম আমার আদেশ মেনে নেয়। ছেলেটিকে ঠাণ্ডা করার প্রবল ঝোঁক ছিল তার, তাতে সময় কাটাবার সুবিধা হ'ত, নিজের কথাটা ভাবতে হত না। আমার মনে কিন্তু বিরক্তি জাগে। আগে মৃত্যুর কথা কখনও ভাবিনি, প্রয়োজনও হয়নি। এখন সেই কাল উপস্থিত, চিন্তা না করে উপায় কি!

টম কথা আরম্ভ করল—তুমি কি কখনও কাউকে সাবাড় করেছ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিই না।

টম বলে যায়, আগসট্ মাসের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ছ'জন ওর হাতে শেষ হয়েছে।...

অবস্থাটা তবুও সে বোঝেনি আমার মনে হয় বোঝার চেষ্টাও করেনি।

আমিও বুঝিনি। ভাবছিলাম যন্ত্রণাটা কেমন? বুলেটের কথা ভাবি, আমার দেহে বুলেটের নারকীয় জ্বালা অনুভব করি। এ সবই প্রক্ষিপ্ত ভাবনা, তবু আমি শান্ত ছিলাম। এখনও সারারাত পড়ে আছে। টম একটু পরেই চুপ করে, আমি আড় চোখে তাকে লক্ষ্য করি। দেখ্‌লাম তারও গাত্রবর্ণ ধূসর হয়ে এসেছে! মনে মনে ভাবি—এবার যাত্রা হল সুরু।

অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে। গবাক্ষ পথে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যায়। আকাশের একটি তারা সেই ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—উজ্জ্বল এবং শীতল রাত্রি আসন্ন।

দরজা খুলে গেল, দুজন রক্ষীর সঙ্গে এল এক সামরিক পোষাক পরিহিত সুশ্রী যুবক। সে আমাদের অভিবাদন জানাল।

বল্লে—আমি ডাক্তার, আপনাদের এই নিদারুণ মুহূর্তে সাহায্য করতে এসেছি। কণ্ঠস্বর বেশ শিষ্ট এবং মার্জিত। আমি প্রশ্ন করি—এখানে কি করতে চান? হাসপাতাল বোঝাই আরো ত' অনেক লোক রয়েছে।

শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটি জবাব দেয়—আমাকেই ত' পাঠাল। তারপর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ধূমপান করবেন? সিগার, সিগারেট দুই-ই আছে।

সে আমাদের বিলাতী সিগারেট এবং সিগার দিতে এল, আমরা নিলাম না। সোজাসুজি তার দিকে তাকাতেই লোকটা কেমন বিরক্ত হয়ে উঠল। আমি বললাম, আপনি দয়া দেখাতে আসেননি, আপনাকে আমি জানি, সেদিন ফ্যাসিস্তদের দলে ব্যারাক ইয়ার্ডে আপনি ছিলেন, আমাকে সেইদিনই বন্দী করে আনা হয়।

আমি আরো বলতাম, কিন্তু কি যে হল, আর আমার ভালো লাগল না। সহসা কাউকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আমি নই কিন্তু এখন আর কথা বলার প্রবৃত্তি নেই। কাঁধ নাড়া দিয়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম, একটু পরে মাথা তুলে দেখি লোকটা আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রহরীরা মাদুরে বসেছিল, লম্বা রোগা, পেড্রো আঙুল মট্‌কাচ্ছিল, আপর দুজন ঘুম ছাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিল।

পেড্রো সহসা ডাক্তারকে বলে ওঠে—আলো চাই? ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে—চাই। লোকটারও কেঠো বুদ্ধি, তবে নিশ্চয়ই তেমন খারাপ লোক নয়। মনে হল লোকটির একমাত্র অপরাধ কল্পনাহীনতা! পেড্রো বেরিয়ে গেল এবং একটা তেলের প্রদীপ এনে ঘরের কোনে রাখল। বিশেষ তেমন

আলো হল না, তবে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে তবু মন্দের ভালো। গত-রাত্রে ত' অন্ধকারেই রেখেছিল। ছাদের গায়ে আলোর একটা প্রতিবিম্ব গোল হয়ে পড়েছে। তাই দেখ্তে লাগলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সহসা সচকিত হয়ে উঠ্লাম, আলোর সেই বৃত্ত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে যেন তার একটা প্রচণ্ড তাপ আমার গায়ে এসে পড়েছে।

এ আমার মৃত্যু-ভাবনা নয়। ভয়ও নয়, নামহীন অজানা ভয়। গাল দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছে, মাথাটায় ব্যাথা।

দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সহচরদের দিকে তাকালাম। টম দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে তার শুভ্র কাঁধটা দেখা যাচ্ছে। জুয়ান বেচারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। হাঁ করে আছে, নাকটা কাঁপছে। ডাক্তার তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে কাঁধে হাত রাখল। তার দৃষ্টি কিন্তু শীতল। লক্ষ্য করলাম সে ধীরে ধীরে জুয়ানের হাতটা ধরে তার নাড়ি দেখ্ছে, পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে ধরেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জুয়ানের অবশ হাতখানা ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। যেন সহসা কি মনে পড়েছে এই ভাবে পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে কয়েক লাইন লিখে নেয়।

রাগে জ্বলে উঠে বলি—বেটা বেজন্মা কোথাকার, আমার নাড়ি দেখতে এলে ঐ মুখে ঘুঁসি বসিয়ে দেব।

সে এলনা বটে তবে আমার দিকে লক্ষ্য রয়েছে বুঝ্লাম। মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম। সে নিস্পৃহকণ্ঠে প্রশ্ন করে—বেশ শীত করেছে, নয়?

মনে হল ওর যেন শীত করছে, কেমন যেন নীল হয়ে গেছে।

আমি বললাম,—না আমার ত' শীত করেনি।

লোকটি আমার মুখ থেকে চোখ নামায় না। সহসা তার মনোভাব বুঝলাম। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম, ঘামে নেয়ে উঠেছি। এই শীতে, দারুণ হাওয়ার ভিতর আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে, মাথায় চুলে হাত বুলোই। সেখানেও ঘাম। আমার সার্টটা ঘামে ভিজে গায়ে সেঁটে গেছে। নিশ্চয়ই ঘণ্টাখানেক ধরে ঘামছি, কিন্তু বুঝিনি; কিন্তু বেলজিয়ান স্থয়ারটার নজরে কিছুই এড়ায়নি। আমার গাল বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে সে দেখেছে আর ভাবছে, আতংকের এ-এক রুগ্ন অভিব্যক্তি। লোকটি কিন্তু শীতবোধ করছে,

সবই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মনে হল উঠে দাঁড়িয়ে ওর মুখে দুটো ঘুঁসি বসিয়ে দিই। কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই আমার রাগ আর লজ্জা মুছে গেল, উদাসীন ভঙ্গীতে বেঞ্চে বসে পড়লাম।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে থাকি। বুঝলাম মাথার ঘাম গলা গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু নিরর্থক বলে ঘাম মোছা বন্ধ করলাম। রুমালটি ভিজে গেছে, সর্বাঙ্গ ঘামছে, ভিজে প্যাণ্ট যেন বেঞ্চের সঙ্গে এঁটে যাচ্ছে।

সহসা জুয়ান বলে ওঠে—আপনি ডাক্তার ?

বেলজিয়ান জবাব দেয়—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, খুব কি কষ্ট হয়,—···অনেকক্ষণ ধরে ?

—এঃ, না, না, খুব তাড়াতাড়ি মিটে যায়।

এমনই তার মুখের ভাব যেন নগদ খদ্দেরকে ঠাণ্ডা করছে।

—কিন্তু আমি···, শুনেছি অনেক সময় দুবার গুলি করতে হয়।

কাঁধ নাড়া দিয়ে বেলজিয়ান বলে—হ্যাঁ, কখনও হয় বটে। আসল জায়গায় না লাগ্‌লে ঐ রকম হয়।

—তাহ'লে আবার বন্দুকটা ভরে নিয়ে গুলি করতে হয়।

একমিনিট কি ভেবে নিয়ে ধরা গলায় সে আবার বলে, তাতে ত' বেশ একটু সময় যায় ?

যন্ত্রণায় ওর ভীষণ ভয়, সেই কথাই শুধু ভাবছে। তার কারণ অবশ্য ওর বয়স। কিন্তু আমার ? তাহলে ঘাম্‌ছিলাম কি ভয়ে ?

উঠে দাঁড়িয়ে কয়লার গাদার কাছে গেলাম। টম সচকিত হয়ে ঘৃণাভরে আমার পানে তাকায়, আমার জুতোর মচ মচ আওয়াজে সে বিরক্ত হয়েছে। কে জানে আমার মুখের আকৃতি ওর মত হয়েছে কিনা। কি চমৎকার আকাশ। এই কোণে এতটুকু আলো নেই, মাথা তুলে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে হয়। আজ যেন অন্যরকম। পরশু রাতে যখন গির্জার কুঠুরীতে বন্দী ছিলাম তখন আকাশের অনেকটা চোখে দেখেছি। দিনের প্রতিটি প্রহর এনেছে বিচিত্র স্মৃতি। সকালের আকাশ যখন সুনীল এবং কঠিন তখন মনে পড়ে অতলান্তিক সমুদ্রকে। দুপুরের সূর্য দেখে মনে পড়েছিলো সেভিলের পানশালার কথা, যেখানে বসে 'মানজানিলা' মদ্য পান করেছিলাম, আর জলপাই সহকারে মাছ খেয়েছিলাম। বিকেলে ছায়ার নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম আকাশের বুকে যে সারা পৃথিবীর ছায়া নেমেছে তার কথা ভেবেছি। আকাশের দিকে যতক্ষণ খুসী তাকিয়ে

থাকতে পারি, কিন্তু তার কোনো মোহ নেই। সে একরকম মন্দ নয়। টমের কাছে ফিরে গিয়ে বস্‌লাম, কিছু সময় কেটে গেল।

খুব নীচু গলায় টম কথা বলে। কথা বলানোর প্রয়োজন ছিল নইলে তার মন বোঝার উপায় ছিল না। ভাবলাম সে আমাকে লক্ষ্য করেই চল্‌ছে, কিন্তু তার দৃষ্টি অন্যদিকে। আমার দিকে তাকাতে তার ভয় করছে, যা আমার ঘর্মাক্ত ও রক্তহীন আকৃতি। দুজনেরই সমান অবস্থা, যেন আমরা আয়নায় মুখ দেখছি। সে এই ঘরের একমাত্র জীবন্ত প্রাণী বেলজিয়ানটির দিকে চোখ মেলে তাকায়।

বলে—ব্যাপারটা বুঝছ? আমার ত কিছুই মাথায় আসে না। আমিও অতি মৃদুগলায় কথা বলি, বেলজিয়ানটির দিকে কিন্তু চোখ রেখেছি। বলি—ব্যাপার কি?

—এমন একটা কিছু হবে আমাদের, যা ঠিক বুঝছি না।

টমের গায়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ, আমি আবার একটু গন্ধ কাতর।

বল্‌লাম—একটু পরেই সব বুঝবে।

সে তবু বলে—সব কেমন অস্পষ্ট, আমি অবশ্য সাহসী থাকতেই চাই, কিন্তু সবটা জানা চাই। আমাদের ত' উঠানে নিয়ে দাঁড় করাবে, তারপর ওরা ক'জন দাঁড়াবে আমাদের সামনে?

—বলতে পারি না, পাঁচ থেকে আট। তার বেশী নয়।

তাহ'লে আটই ধরো একজন হুকুম করবে 'এম', আমরা দেখব আটটা রাইফেল চোখের সামনে উদ্যত। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াব। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়ালটা ঠেলব, কিন্তু দুঃস্বপ্নের দেয়াল দাঁড়িয়ে থাকবে। সবই কল্পনা করা যায়। যদি জানতে কত সহজে এ সব আমি কল্পনা করতে পারি।

বল্‌লাম—এই যথেষ্ট, আমিও বেশ অনুমান করতে পারছি। ভীষণ লাগবে নিশ্চয়ই। শুন্‌ছি, ওরা গুলি করে চোখ আর মুখ লক্ষ্য করে। মুখটা বিকৃত করে দেয়। আমি যেন এখনই জ্বালা অনুভব করছি। এক ঘণ্টা ধরে আমার ঘাড়ে আরে গলায় ব্যথা বোধ করছি। প্রকৃত বেদনা নয়, তার চেয়ে খারাপ। কাল সকালে এই রকমই মনে হবে। আর তারপর?

কি যে বলতে চায় ও আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু সেই অনুসারে কাজ করতে পারিনি। আমারও বেদনা ছিল। আমার দেহে যেন অসংখ্য ক্ষত। এখনও ঠিক সয়ে যায়নি। কিন্তু আমারও ওই মতই অবস্থা। এর আমি কোনো মূল্য দিই না।

আবার আত্মগত ভাবে ও কথা বলে। বেলজিয়ান শুনছে বলে মনে হল না। ও কিন্তু বেলজিয়ানের দিকে তাকায়। ও যে কি করতে এসেছে জানতাম। আমরা কি ভাবছি তাতে ওর মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের দেহ লক্ষ্য করার জন্য ওকে আনা হয়েছে, বেদনায় ছটফট করে আমরা মরব ও দেখ্‌বে।

টম বল্‌ছিল—সবটাই যেন দুঃস্বপ্ন। তুমি কিন্তু ভাব্‌ছ, সর্বদাই ভাব্‌ছ ঠিক আছে, তুমি ঠিক বুঝবে, কিন্তু তখনই তা মিলিয়ে যাবে, স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে। আমি তাই বলি এর পর আর কিছু নেই। কিন্তু বুঝি না এর অর্থ কি! মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝেছি···তারপর সব মিলিয়ে যায়। আবার যন্ত্রণনার কথা মনে হয়, বুলেট, বুলেট। আমি জড়বাদী, এ কথা শপথ করে বল্‌তে পারি। আমি কি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু আমি যেন আমার মৃতদেহ দেখতে পারছি। সে খুব কঠিন নয় কিন্তু আমার মৃতদেহ আমি দেখ্‌ছি স্বচক্ষে, এই আমার জ্বালা। একথা যে ভাবতেই হবে আর কিছু আর দেখতে পাবনা, পৃথিবী এখন অন্যজনের। ঠিক চলবে দিনের পর দিন। এইটাই ভাবতে পারিনা পাব্‌লো, তার জন্য প্রস্তুতও হতে পারিনা, বিশ্বাস করো, একদিন সারারাত একটা কিছুর প্রত্যাশায় জেগে রইলাম,—কিন্তু তা ঠিক হল না। আমাদের অদৃষ্টে কি হবে, আর তার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারবো না।

তোমার জন্য পাদ্রী ডাক্‌বো নাকি? আমি প্রশ্ন করি।

আমার কথার জবাব মেলে না। লক্ষ্য করি নীরব ভূমিকা সে গ্রহণ করতে চায়, প্রাণহীন কণ্ঠে শুধু মাঝে মাঝে 'পাব্‌লো' বলে ডাকে। আমার এ সব ভালো লাগে না, সব আইরিশরাই ঐ রকম। কেমন মনে হয় ওর গায়ে যেন প্রস্রাবের গন্ধ। প্রকৃতপক্ষে টমের ওপর আমার তেমন মমতা ছিল না। তা ছাড়া দুজনেই আজ একত্রে মরতে বসেছি, তখন আর করুণা কি! অপর জনের কথা অবশ্য আলাদা। যেমন রামন গ্রীস্‌। কিন্তু টম আর জুয়ানের এই সান্নিধ্যে আমি যেন কেমন নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম। এই বোধ হয় ভালো। রামন থাক্‌লে হয়ত মনটা নরম থাক্‌ত। এই মুহূর্তে কিন্তু আমি নির্মম, নিস্পৃহ! শেষ পর্যন্ত এই কাঠিন্য বজায় রাখতেই চাই।

আনমনা ভঙ্গীতে বিড় বিড় করছে। ভাবনামুক্ত থাকার জন্যই ওর এই কৌশল বুঝ্‌লাম। স্বভাবতই, এ বিষয়ে আমিও একমত। ও যা বল্‌ছিল আমিও তাই বলতে পারতাম। মরাটা কখনই স্বাভাবিক নয়, সত্যই যখন

মরতে বসেছি তখন আমার কাছে কিছুই ত' স্বাভাবিক নয়। কয়লা গুড়োর স্তূপ, ঐ বেঞ্চটা, পেড্রোর কুৎসিৎ মুখ, শুধু টমের মত ভাবতে হচ্ছে এটাই ভাবতে খারাপ লাগছে। জানি সারারাত ধরে পাঁচ মিনিট অন্তর দুজনে এই একই চিন্তা করে যাব। ওর দিকে আড় চোখে চাইলাম, ওর মুখটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল। ওর মুখে মৃত্যুর চিহ্ন। আমার অহং ক্ষুন্ন হল। গত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পাশে আছি, ওর কথা শুনছি, কত কি বলেছি। দুজনের মধ্যে এতটুকু মিল নেই। এখন মনে হয় উভয়ে যমজ। আমরা উভয়ে একত্রে মরব।

টম আমার হাতটা ধরে বলে ওঠে—পাব্লো, আমার বিশ্বাস হয় না ভাই এত শীঘ্র সব শেষ হবে।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম—পা দুটো দেখ শূয়ার।

তার দুটি পায়ের মাঝে নদী বয়ে যাচ্ছে, ট্রাউজার বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

বেলজিয়ান এসে আন্তরিকতার ভঙ্গীতে বলে—কি শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে নাকি।

—জানি না, তবে আমি ভয় পাইনি। শপথ করে বলছি ভয় পাইনি। টম চেঁচিয়ে ওঠে।

বেলজিয়ান তার নোট বই ভর্তি করছে। ছোক্‌রা জুয়ান তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেলজিয়ান জুয়ানের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কি মতবল কে জানে, ডাক্তারি না স্নেহ! জুয়ানের ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ডাক্তার। কোনো বাধা দেয় না জুয়ান। সহসা দুটি হাত দিয়ে বেলজিয়ানের হাতটা হাতে তুলে নেয় জুয়ান। আমরা বিস্মিত, টমও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে। বেলজিয়ানটিও কিছু বোঝেনি, বাৎসল্যের ভঙ্গীতে সে'ও হাসছে।

হঠাৎ জুয়ান সেই মোটা হাতটা টেনে নিয়ে দাঁত বসাবার চেষ্টা করে। বেলজিয়ান তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। তারপর সহসা সভয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যায়। সে তার ভয়ার্ত চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বুঝেছে আমরা তার মত সজীব মানুষ নাই। সে হাসছে। একজন ওয়ার্ডার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অপর ওয়ার্ডারটা তখন'ও ঘুমাচ্ছে।

আমি অতিশয় শ্রান্ত এবং উত্তেজিত। সকালে কি ঘটবে সে কথা এখন আর ভাবতে চাই না। ভেবে কি কূল কিনারা মিলবে।

সহসা বেলজিয়ানটা বলে ওঠে—বন্ধুগণ, আমি কথা দিচ্ছি, কর্তৃপক্ষ যদি

রাজী হন তাহলে আপনাদের প্রিয়জনের কাছে লেখা চিঠি আমি পাঠিয়ে দিতে পারি।

টম মৃদুগলায় বলে—আমার কেউ নেই। আমি জবাব দিই না। টম আমার দিকে তাকিয়ে বলে—কন্‌চাকে কিছু বলার নেই তোমার?

—না।

এই সব স্নেহ সম্ভাষণ আমার কাছে বিরক্তিকর। আমারই দোষ, গতরাত্রে কন্‌চার কথাটা আমিই বলে ফেলেছিলাম। কাল বিকাল পর্যন্ত কন্‌চার কাছে থাকার জন্য আমার হাতটা কেটে ফেল্‌তেও রাজী ছিলাম। এখন আর তাকে কিছু বলার নেই, দেখতে চাইনা, আদর করতেও চাই না। তাকে আর কি জানাব। আমার সম্পর্কে আমিই এখন ভীত।

বেলজিয়ানটা ঘড়ি বার করে দেখে বলে—এতক্ষণে সাড়ে তিনটা বাজ্‌লো।

নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলবে দুষ্টু ডাক্তার এই কথা বল্‌ল। টম লাফিয়ে উঠ্‌ল। সময় চলে যায়, আমরা গ্রাহ্য করিনা। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার, আকার-বিহীন নিরন্ধ্র অন্ধকার।

ছোকরা জুয়ান কেঁদে ওঠে—ওগো আমি মরতে চাই না, মরবো না, মরতে পারবো না।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে টম তার দিকে তাকায়। ছোকরার কষ্ট সবচেয়ে কম অথচ সবচেয়ে বেশী হট্টগোল করছে সে।

টম বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, আমারও একবার মনে হয় একটু কাঁদি। কিন্তু ভাবি, না ভদ্রলোকের মত মরতে হবে।

টম উঠে দাঁড়ায়, ভোরের প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। রক্ত রাঙা ভোর।

অন্ধকার এখনও কাটেনি। টম চুপি চুপি বলে ওঠে—শুন্‌ছো—

জবাব দিই—শুন্‌ছি!

সৈনিকরা বাইরে প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

টম বলল—বুঝছ! আরো কি বলত হয়ত কিন্তু দরজা খুলে একজন লেফটেনাণ্ট চারজন সৈনিক নিয়ে ঘরে এলেন। টমের হাত থেকে বেলজিয়ান প্রদত্ত সিগারেট খসে পড়ল।

—ষ্টেইনবেক? ওরা প্রশ্ন করে।

টম জবাব দেয় না। পেড্রো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

—জুয়ান মিরবাল!

—ঐ যে মাতুরে শুয়ে আছে।

লেফটেনাণ্ট চেঁচিয়ে ওঠেন—ওঠ, ওঠো শীগগীর।

জুয়ান জবাব দেয় না। দুজন সৈন্য কাঁধ ধরে তাকে দাঁড় করায়। কিন্তু ছেড়ে দিতেই সে ধপ করে পড়ে গেল।

সৈন্যরা ইতস্ততঃ করে। লেফটেনাণ্ট বলেন, আগেও এরকম অনেক দেখেছি। তোমরা ওকে ধরে নিয়ে যাও। বাকী কাজ ওরা সারবে।

টমের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন—চলে এসো। টম চল্‌লো, তার দুপাশে সঙ্গীনধারী সৈন্য। পিছনে দুজন।

জুয়ানকে ধরে নিয়ে চলেচে। জুয়ান মুর্চ্ছিত হয় নি, তার চোখ দুটো খোলা, দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে।

আমিও এগিয়ে যাই। লেফটেনাণ্ট এসে বাধা দেন।

—আপনার নাম ইব্বিয়েতো?

—হ্যাঁ!

—আপনি অপেক্ষা করুন, একটু পরে আপনার ডাক হবে।

একঘণ্টা পরে আমাকে নেওয়ার জন্য লোক এল। আমাকে একটি ছোট্ট ঘরে নিয়ে দাঁড় করানো হল। চমৎকার উত্তপ্ত ঘর, দুজন অফিসর চেয়ারে বসে সিগার টানছেন। তাদের হাতে এক তাড়া কাগজপত্র।

—আপনার নাম ইব্বিয়েতো?

—হ্যাঁ।

—আপনার খুড়ো রামন গ্রীস্‌ কোথায়?

—জানিনা।

প্রশ্নকর্তা মোটা ও বেঁটে মানুষ। চশমার আড়ালে কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গী দেখা যায়। আমাকে বললেন—এদিকে এসো।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঠে আমার হাতটা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে এক মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন। আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লেন—তার জীবনের বিনিময়ে তোমার জীবন দিতে পারি। কোথায় সে আছে বল, তোমাকে ছেড়ে দেব।

কি স্বাস্থ্য! বুকে পিঠে বেণ্ট আঁটা, হাতে ঘোড়ার চাবুক, পায়ে বুট। ওরাও মরবে, তবে আমার অনেক পরে। কাগজপত্র ঘেঁটে লোকের নাম বার

করে কয়েদ করছে আর সাবড়ে দিচ্ছে। এই ওদের কাজ। ওদের ক্রিয়া কলাপ যেন একটা প্রহসন।

হিংস্র পশুর মত লোকটি বলে—কই আমার কথা বুঝলে ?

—রামন গ্রীস্ কোথায় আমি জানি না। বোধ হয় মাদ্রিদে আছে।

অপর অফিসারটি তাঁর হাত তুললেন। তারপর ধীর গলায় বললেন—পনের মিনিট ভাববার সময় দেওয়া হবে। লোকটাকে ধোলাইখানায় নিয়ে যাও, পনের মিনিট পরে নিয়ে এস। যদি তবু কথা না শোনে তাহলে তখনই গুলী করা হবে।

ওদের কাজ ওরাই জানে। সারারাত ঐ ভাবে আট্‌কে রেখেছে। আগে টম আর জুয়ানকে গুলি করে মেরেছে। আবার পনের মিনিট সময়। এইভাবে কায়দা করতে চায়।

বসে বসে ভাব্‌ছি রামন গ্রীসের কথা। সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক দূর সম্পর্কের ভায়ের বাড়ি আছে। আরো বেশী উৎপীড়ন না করলে সে খবর আমি দেবনা। বরং মরবো তবু রামনকে ধরিয়ে দেব না। আমি জানি আজ স্পেনে আমার চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশী। আমি আর নৈরাজ্যতন্ত্রের জন্য কি করেছি।

আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো। ওরা আমাকে অফিসারদের কাছে নিয়ে গেল। পায়ের কাছ দিয়ে একটা ইঁদুর ছুটে গেল। আমি ফ্যালাঙ্গিষ্টকে বলি ইঁদুরটার রকম দেখলে ?

সে জবাব দেয় না। গম্ভীর তার ভঙ্গী। যেন বড়লাট। লোকটা গোঁফে তা দিচ্ছিল।

আমি বল্‌লাম—তোমার ঐ কাদাখোঁচা গোঁফটা কামিয়ে ফেলা উচিত।

সে আমার পায়ে সজোরে লাথি মারে। আমি নীরব হলাম।

মোটা অফিসারটি প্রশ্ন করেন—কি হে কি ঠিক করলে ?

আমি তাদের দিকে সবিস্ময়ে তাকালাম। তারপর বললাম—হয় কবরখানায়, নয়ত কবর খোঁড়ার মজুরদের কামরায় আছে।

একটু মজা করার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বল্‌লাম।

অফিসাররা কিন্তু তাড়াতড়ি উঠে পড়লেন। তারপর হুকুম দিলেন—লেফটেনান্ট লেপেজকে বল পনেরজন লোক দিতে। তুমি যদি সত্য কথা বলে থাক তাহলে মুক্তি দেব। নইলে একেবারে গুলি করবো।

আধঘণ্টা পরে মোটা লোকটা ফিরে এল। ভাবলাম এইবার আমার শেষ।

অফিসারটি আমার দিকে তাকাল। হুকুম দিল—একে ইয়ার্ডে নিয়ে যাও। পরে সামরিক আদালতে বিচার হবে।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি—গুলি করবেন না?

—এখনত নয়, যাও। আমার দিকে তিনি আর তাকান না।

বুঝলাম না কিছু। কি কাণ্ড কে জানে!

দুপুরে সরকারি মেসে কিছু খাওয়া জুটলো। দুচারজন আমাকে প্রশ্ন করল, আমি জবাব দিলাম না। সন্ধ্যার দিকে আরো দশজন বন্দী এল। গারসিয়াকে চিনলাম। সে বল্‌ল কি বরাৎ ভাই তোমার, তোমাকে যে দেখতে পাবো আশা করিনি।

—আমাকে ত' গুলী করার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি মতলব বদলেছে। কেন কে জানে?

—আমাকে দুটোর সময় ধরেছে।

—কেন? জানতাম ওর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

—কে জানে। সবাইকে ত ধরছে। তারপর মৃদু গলায় বলে—জানো রামন গ্রীসকেও ধরেছে।

কম্পিত কণ্ঠে বলি—সে কি! কখন, কোথায়?

—আজ সকালে। ওরই দোষ। বোকার মত কাণ্ড। ভায়ের সঙ্গে বচসা করে মঙ্গলবার চলে এসেছিল। লুকোবার কত জায়গা ছিল। তা না করে বল্লে ইব্বিয়েতোর বাড়িতেই যেতাম, তা সেও ধরা পড়েছে। তার চেয়ে বরং কবরখানায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি।

—বলো কি! কবরখানায়।

—হ্যাঁ। কি বোকা। ওরা সকালে গিয়ে ধরে ফেলেছে। কবর খোঁড়ার মজুরদের কামরায় ছিল।

—ক ব র খা না য়!

আমার চতুর্দিক যেন ঘূর্ণ্যমান। আমার চোখে অন্ধকার। পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে হেসে ও কেঁদে উঠলাম।



ষ্টীফেন ক্রেণ

খোলা নৌকা

আকাশের রঙ্‌টা যে ঠিক কি তা ওরা কেউ জানে না। সকলেরই দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত—যে ঢেউগুলো তাদের দিকে ক্রমাগত ছুটে আসছে তার ওপরেই নিবদ্ধ। এইসব ঢেউ-এর রঙ্‌ স্লেটের মত, শুধু ওপরটা অন্য রকম, তার রঙ্‌ ফেনিল শুভ্র। সমুদ্রের রঙ্‌ এই ডিঙ্গির সবকটি মানুষেরই পরিচিত। দিগন্ত কখনও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, কখনও প্রসারিত। কখনও ডুব দেয় নীচের দিকে, কখনও আবার ওপরে ভেসে ওঠে। তার প্রান্তরেখা সর্বদাই ঢেউ-এর ভাঁজে ভাঁজে খাঁজকাটা। মনে হয় যেন ঢেউগুলো তীক্ষ্ণাগ্র পাহাড়ের চুড়ার মত উন্নত।

সমুদ্রের বুকে এই যে ডিঙি নৌকাখানি ভাসছে তার চেয়ে অনেকের বাথটবও হয়ত অনেক বড়ো। ঢেউগুলো অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে উঁচু হয়ে ছুটে আসছে এবং হঠাৎ এসে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রতিটি ঢেউ-এর ফেনান্বিত চুড়া তাই এই ছোটো নৌকা চালনার পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করছে। জাহাজের রাঁধুনী নৌকার তলায় উবু হয়ে বসে আছে। দুচোখ মেলে চেয়ে আছে নৌকার

পাশের দিকে যেখানে ছ'ইঞ্চি মাত্র কাঠ জলের ওপর মাথা উঁচু আছে। সমুদ্রের সঙ্গে তার এইটুকু ব্যবধান। তার মোটা মোটা দুই হাতের ওপর শার্টের আস্তিন গোটানো, সে যখন নীচু হয়ে নৌকার জল ছেঁচে বাইরে ফেলছে তখন তার বোতাম-খোলা গেঞ্জিটার দুই প্রান্ত নীচের দিকে ঝুলে পড়ছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে উঠছে—"গঅড্! একটুর জন্য বেঁচে গেছি আমরা।" প্রতিবার এই মন্তব্য করার সময় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে সে পুব দিকে একবার চেয়ে দেখছে। নৌকায় মাত্র দুখানি দাঁড় আছে, জাহাজের তেল-খালাসী তারই একখানি দিয়ে হাল ধরেছে, আর যখন নৌকার পিছনের গলুইএর ওপর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

অপর দাঁড়টি টানছে একজন যোগাযোগ-রক্ষী সংযোজক—তরঙ্গগুলি দেখছে আর ভাবছে—কেন যে মরতে এসেছিলাম।

যখন সকল চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ফেল পড়ে, কোনো সৈন্যদল পরাজিত হয় কিংবা কোনো জাহাজ ডুবে যায় তখন নির্ভীকতম এবং অত্যন্ত সহনশীল মানুষের মনেও অন্ততঃ সাময়িকভাবে যে ধরনের গভীর ঔদাসীন্য ও হতাশার সৃষ্টি হয়, এই নৌকার আহত কাপ্তেন সেই ভাবে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে নৌকার সামনের দিকে শুয়ে আছেন।

একদিনের জন্যই হোক, আর দশ বছর ধরেই হোক, যিনি জাহাজের অধিনায়কত্ব করেছেন তাঁর মন জাহাজের প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ডের গভীরে শিকড় নামিয়ে দেয়। এই কাপ্তেনের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে একটি ভয়ংকর দৃশ্যের স্মৃতি। প্রত্যুষের ধূসর আলোয় দেখা তাঁর দিকে ফেরানো সাতটি মুখ, আর তারপর একটা মাস্তুলের দ্বিতীয়ার্ধের ওপরকার অংশ—তার মাথায় একটা সাদা বল। মাস্তুলটা এদিক-ওদিক দুলে যেন বারকয়েক ঢেউগুলোকে চাবকালো, তারপর ক্রমশঃ ছোট হতে হতে শেষে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর থেকে ওঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। সে স্বর দৃঢ়তা হারায় নি বটে, কিন্তু শোকের গভীরতায় গম্ভীর। সে স্বরের বৈশিষ্ট্য বাগ্মিতা ও অশ্রু দুয়েরই নাগালের বাইরে।

তিনি বললেন—"বিলি, আর একটু দক্ষিণ ঘেঁষে চালাও।

হাল থেকে তেল-খালাসী জবাব দেয়—"বহুৎ আচ্ছা হুজুর দক্ষিণ ঘেঁষে—"

এই ডিঙ্গি-নৌকায় থাকা আর একটা ঝাঁপাই ছোঁড়া বুনো ঘোড়ার

পিঠে বসে থাকা প্রায় একই কথা। তুলনায় একটা বুনো ঘোড়া এর চেয়ে বেশী ছোটও হবে না। নৌকাখানা লাফাচ্ছে, খাড়া হয়ে উঠছে ঠিক একটা জানোয়ারেরই মত। প্রতিটি ঢেউ যেমন আসছে তেমনই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে—বেয়াড়া রকমের উঁচু বেড়া লাফানোর জন্য ঘোড়া যেমন চেষ্টা করে। এইসব জলের পাহাড় নৌকাখানা যেভাবে পার হচ্ছে তা সত্যই রহস্যময়। তা ছাড়া ঢেউ-এর মাথায় পৌছালে ফেনিল সাদা জলের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলি সাধারণতঃ এই রকম : প্রতিটি ঢেউ-এর শীর্ষ থেকে ফেনপুঞ্জ হু-হু করে নেমে আসে, তখন নৌকাখানাকে আরও একবার লাফ দিতে হয়—বাতাস থেকে বাতাসের মধ্যে লাফ! তারপর একটা তরঙ্গ-চূড়াকে অবহেলায় অতিক্রম করে নৌকা একটা সুদীর্ঘ ঢলের গা বেয়ে খানিকটা পিছলে খানিকটা জলে আছড়াতে আছড়াতে দ্রুতবেগে নীচে নেমে আসে—এবং তারপরই নাচতে নাচতে পরবর্তী সংকটের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সমুদ্রের সব চেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, সাফল্যের সঙ্গে একটা ঢেউ অতিক্রম করেই দেখা যাবে যে তার পিছনে আর একটা ঢেউ তাড়া আসছে, যা আগেরটার মতই প্রচণ্ড এবং নৌকা-ডোবানোর পক্ষে কার্যকরী—কিছু একটা করার জন্য যার আগ্রহ আগেরটারই মত প্রবল। একটা দশ-ফুট ডিঙ্গিতে বসে সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রবাহের অফুরন্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে যেমন ধারণা করা সম্ভব, ডিঙ্গিতে চড়ে যারা কখনো সমুদ্রে ভাসেনি তাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় তেমন কোনো ধারণা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি স্লেট-রঙের ঢেউ যেই এগিয়ে আসছে, নৌকার মানুষগুলির চোখের সামনে থেকে তার সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন ঐ কথা অনুমান করা কঠিন হয় না, যে এই বিশেষ ঢেউটাই সমুদ্রের চূড়ান্ত আস্ফালন, অতল জলরাশির অন্তিম অভিযান। তরঙ্গগুলির গতিতে একটা ভয়ংকর সৌন্দর্য রয়েছে; শীর্ষদেশের মৃদু গর্জনটুকু বাদ দিলে তারা এগিয়ে আসছে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে।

ম্লান আলোয় লোকগুলির মুখ নিশ্চয়ই ধূসর দেখাচ্ছিল। স্থিরনেত্রে নৌকার পিছন দিকে তাকিয়ে আছে ওরা; ওদের চোখগুলি অদ্ভুতভাবে চক্ চক্ করছে। ওপরের কোন বারান্দা থেকে সমগ্র দৃশ্যটা দেখতে পারলে নিঃসন্দেহে একটা অলৌকিক ছবি বলে মনে হত। নৌকারোহী মানুষগুলির কিন্তু এতসব দেখার অবসর নেই। আর যদি সে রকম ফুরসৎ ওদের

থাক্তো তাহলেও যা নিয়ে মাথা ঘামানো যায় তেমন আরো অনেক বস্তু ছিল। সূর্যদেব ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠছেন, এবং এখন যে দিনের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা ওরা বুঝ্তে পারছে সমুদ্রের দিকে চেয়ে,—কারণ সমুদ্রের সেই স্লেটের মত রঙ্ পরিবর্তিত হয়ে এখন মরকতের মত সবুজ হয়ে গেছে, তার গায়ে সোনালি আলোর রেখা, আর ফেনাগুলিকে দেখাচ্ছে যেন টুক্রো তুষারের মত। দিন যে কিভাবে শুরু হয়েছে তা ওরা জানতে পারেনি। যে ঢেউগুলো ওদের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে তাদের রঙের এই পরিবর্তনটুকুই শুধু ওরা লক্ষ্য করতে পেরেছে। অসংলগ্ন টুকরো টুকরো কথায় রাঁধুনী ও সংযোজকের মধ্যে ত্রাণ-শিবির এবং শরণার্থী-শালার পার্থক্য নিয়ে তর্ক চলছিল।

রাঁধুনী বল্ল—"মস্কিটো খাড়ির বাতিঘরের উত্তরদিকে একটা শরণার্থী-শালা আছে, তারা একবার দেখতে পেলেই নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

সংযোজক প্রশ্ন করে—"আমাদের দেখতে পাবে—কারা বললে ?"

রাঁধুনী বলে—"কেন, সেখানকার নাবিকেরা।"

সংযোজক জবাব দেয়—শরণার্থী-শালায় কোন নাবিক থাকে না। আমি যতটা জানি, ওসব জায়গায় শুধু জাহাজ-ডুবি মানুষদের জন্য কাপড়-চোপড় আর খাদ্য জমা করা থাকে। ওখানে কোন নাবিকও থাকে না।"

রাঁধুনী বলে—"থাকে বৈকি! নিশ্চয়ই থাকে।"

সংযোজক আবার বলে—"না, থাকে না।"

হালের ধার থাকে তেল-খালাসী বলে ওঠে—"কিন্তু সে যাই থাকুক, আমরা এখনও ত' সেখানে গিয়ে পৌছতে পারি নি।"

রাঁধুনী আপন মনে বলে—"হয়ত, মস্কিটো খাড়ির বাতিঘরের ধারে যে আশ্রয়টার কথা আমি ভাব্ছি, হয়ত সেটা শরণার্থী-শালাই নয়, হয়ত সেটা আসলে একটা ত্রাণ-শিবির।"

হালের পাশ থেকে তেল-খালাসী আবার বলে—"আমরা ত এখনও সেখানে গিয়ে পৌছাতে পারি নি।"

প্রতিটি তরঙ্গ-চুড়া থেকে নৌকার মাথাটা যখন লাফিয়ে উঠছে, টুপিহীন এই মানুষগুলির মাথার চুলের ভিতর দিয়ে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আবার যখন নৌকার পিছন দিকটা সহসা নীচু হয়ে যাচ্ছে, তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা তীরের মত তাদের পাশ দিয়ে ছুটছে। এইসব তরঙ্গের প্রতিটি চুড়া যেন এক একটি পর্বত বিশেষ, তার ওপর থেকে এরা মুহূর্তের জন্য দেখতে পাচ্ছে এক রৌদ্রস্নাত ও বায়ুতাড়িত বিস্তীর্ণ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বারিপ্রান্তর। মরকত, হরিৎ, স্বর্ণাভ ও শুভ্র আলোয় উদ্ভাসিত সাগরের এই মুক্ত লীলা চপলতা, হয়তো সে অতি চমৎকার, এক আশ্চর্য রমনীয় দৃশ্য।

রাঁধুনী বলে—"এটা অবশ্য খুবই ভালো লক্ষণ যে হাওয়াটা তীরের দিকে বইছে। তা যদি না হত, কি যে হত আমাদের?—কোন আশাই থাকত না।"

সংযোজক বলে—"কথাটা ঠিক বটে।"

কর্মব্যস্ত তেল-খালাসী মাথা নেড়ে তার সমর্থন জানায়।

নৌকার সামনের দিকে শুয়ে আছেন কাপ্তেন—তিনি এমন এক বিচিত্র ভঙ্গীতে মুখ টিপে হাসলেন যার মধ্যে কৌতুক, তাচ্ছিল্য, বিষাদ, সব কিছুই একসঙ্গে মিশে আছে।

তিনি বললেন: "আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর, এখনই আমাদের খুব একটা আশা আছে?"

এই কথা শুনে তিনজনেই নীরব হয়ে থাকে, শুধু সামান্য একটু গুঞ্জন শোনা যায়। এই সময়ে কোনো রকম আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করা ওদের কাছে নিছক ছেলেমানুষী ও হঠকারিতা বলেই মনে হয়। তবু কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওদের সকলের মনে যে এই রকমেরই একটা ধারণা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা অল্পবয়সী তাদের চিন্তা একটু একগুঁয়ে ধরনের হয়ে থাকে। আবার এদিকে তাদের অবস্থার নৈতিক দিকটা এমন যে প্রকাশ্যে কোনো নিরাশাব্যঞ্জক ইঙ্গিতও কিছুতেই করা চলে না। তাই তারা কোন কথা বলে না।

সন্তানতুল্য এই লোকগুলিকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বলেন: "না, না, তীরে আমরা ঠিক পৌছতে পারব।"

কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর ছিল যা ওদের ভাবিয়ে তোলে।

তেল-খালাসী বলে—"তা অবশ্য হতে পারে—যদি বাতাসটা চালু থাকে।"

রাঁধুনী জল ছেঁচে ফেলছিল, সে বলে—"হ্যাঁ—যদি ভাঙ্গা ঢেউএর ঝাপ্টায় তার আগেই গুঁড়ো না হয়ে যাই।"

নিকটে ও দূরে বহু ক্যাণ্টন-ফ্লানেল জাতীয় গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা জলে-ভাসা সামুদ্রিক উদ্ভিদের পিঙ্গল স্তূপগুলির পাশে সমুদ্রের ওপরেই বসে পড়ছে। এই উদ্ভিদের স্তূপগুলো যেভাবে ঢেউ-এর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে আসছে তা দেখে মনে হয় যেন দড়িতে টাঙানো কার্পেট ঝড়ো হাওয়ায় দুল্‌ছে।

পাখিগুলো ছোট্ট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে বেশ আরামে বসে আছে। ডিঙির কারও কারও তাদের দেখে হিংসা হচ্ছে কেন না সমুদ্রের এই আক্রোশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত স্থলচর বন-মোরগের ঝাঁকের কাছে যেমন অর্থহীন ওদের কাছেও ঠিক তাই। মাঝে মাঝে ওরা বেশ কাছ ঘেঁষে আস্‌ছে, কালো পুঁতির মত চোখ মেলে লোকগুলিকে দেখ্‌ছে। এই নিষ্পলক নিরীক্ষণের সময় তাদের কেমন যেন অপার্থিব ও ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে, নৌকার লোকেরা তাই তাদের তাড়ানোর জন্য সরোষে হুঙ্কার ছাড়ছে। একটা পাখি খুব কাছে এসে পড়ল, বোঝা গেল সে কাপ্তেন সাহেবের মাথার ওপর বসতে চায়। পাখিটা নৌকার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় উড়ে চলেছে, বৃত্তাকারে ঘুরছে না, বরং উড়ন্ত মুরগী-ছানার ভঙ্গীতে বাতাসের মধ্যেই পাশের দিকে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে। তার কালো চোখ দুটো কাপ্তেনের মাথার ওপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। তেল-খালাসী বলে ওঠে—"ব্যাটা, কাক ভুষুণ্ডি! দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ছুরি দিয়ে কুঁদে তৈরী করেছে।" রাঁধুনী ও সংযোজক পাখিটার উদ্দেশে ক্রুদ্ধ ভাবে গালিবর্ষণ করতে থাকে। নৌকা-বাঁধার ভারী দড়িটার প্রান্ত নিয়ে পাখিটাকে মেরে তাড়ানোর ইচ্ছা হয় কাপ্তেনের, কিন্তু সাহসে কুলায় না। কারণ এই জাতীয় কোনো জোরালো হেঁচকার ফলে হয়ত মানুষ-বোঝাই নৌকাখানা উল্‌টে যেতে পারে। তাই তিনি সতর্ক ভাবে আস্তে আস্তে হাত নেড়ে পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন, পাখিটাকে এই ভাবে নিরস্ত করার পর নিজের মাথার চুলের নিরাপত্তার কথা ভেবে কাপ্তেন একটু আশ্বস্ত হন। আর সবাইও স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে, কারণ ঠিক এই মুহূর্তে পাখিটার আবির্ভাব ওদের মনে একটা বীভৎস অশুভ লক্ষণ বলে মনে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে তেল-খালাসী এবং সংযোজক দাঁড় টানতে থাকে; দুজনে মিলেই দাঁড় টানে। ওরা একত্রে একই আসনে বসে প্রত্যেক একখানা করে দাঁড় নিয়ে টানে। তারপর তেল-খালাসী দুহাতে দুখানা দাঁড় নেয়; তারপর সংযোজক দুই দাঁড় দেয়; তারপর তেল-খালাসী, তারপর আবার সংযোজক। ওরা দাঁড় টেনেই চলেছে। হালের কাছে হেলান দিয়ে বসা কোন মানুষকে যখন তার পালার সময় এগিয়ে এসে দাঁড় ধরতে হয় তখনই হয় সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা। কারণ একথা চূড়ান্তভাবে সত্য যে এই ডিঙিতে আসন পরিবর্তন করার চেয়ে মুরগীর বুকের তলা থেকে ডিম চুরি করে আনা অনেক বেশী সহজ। নৌকার পিছনের প্রান্তে যে-লোকটি বসে আছে তাকে প্রথমে তার হাতটি আলতোভাবে নৌকার আড়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অতি সন্তর্পণে। যেন সে 'সেভ্‌র্' থেকে আমাদানি করা চীনামাটির বাসন। তারপর দাঁড়ির আসনে যে বসে আছে তাকে তার হাতটা আলগোছে অন্য আড়ার ওপর দিয়ে সরিয়ে আনতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা অসাধারণ সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। এই ভাবে দুজনে যখন আলগোছে পরস্পরকে অতিক্রম করে তখন ওদিকে সমগ্র দলটিকে প্রত্যাসন্ন তরঙ্গের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, আর কাপ্তেন মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠেন—"হুশিয়ার! দেখে চলো! সাবধান।"

সামুদ্রিক আগাছার যে পিঙ্গলবর্ণ চাপড়াগুলি মাঝে মাঝে ভেসে আসে সেগুলিকে যেন এক একটা দ্বীপের মত মনে হয়, যেন এক এক টুক্‌রো ডাঙা। দেখে মনে হয় যেন সেগুলো এদিক ওদিক কোন দিকেই যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে ওগুলো যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। নৌকার মানুষগুলিকে ওরা এই আশ্বাস দেয় যে ধীরে ধীরে তারা তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ডিঙিটা যখন একটা বিরাট উঁচু ঢেউ-এর মাথায় উঠেছে তখন নৌকার সামনে কাপ্তেন সতর্কভাবে উঠে বসে বললেন যে মস্‌কিটো খাড়ির বাতিঘর তাঁর নজরে পড়ছে। একটু পরে রাঁধুনী বল্‌ল সেও দেখতে পেয়েছে। সংযোজক তখন দাঁড় টানছে, যে কোনো কারণেই হোক, তার বাতিঘর দেখার বাসনা হল। কিন্তু সে বসে আছে সুদূর সমুদ্রতীরের দিকে পিছন

ফিরে, ঢেউগুলিও ছিল বিপজ্জনক, তাই কিছুক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখার তার অবসর মেলে না। অবশ্য একটা ঢেউ এলো, সেটা আর সব ঢেউ-এর তুলনায় অনেক শান্ত। সেই ঢেউ-এর চূড়ায় উঠে সে দ্রুতগতিতে একবার পশ্চিম দিগন্তটা তন্ন তন্ন করে দেখে নেয়।

কাপ্তেন বলেন—"দেখ্‌লে ?"

সংযোজক জবাব দেয়—"না, কিছুই দেখতে পেলাম না।"

কাপ্তেন বলেন—"আবার দেখ।" আঙুল দিয়ে দিক্‌নির্দেশ করেন—"ঠিক এই দিকটায় লক্ষ্য করো।"

আর একটি তরঙ্গ-শীর্ষে উঠে সংযোজক নির্দেশ মাফিক তাকিয়ে দেখে, এবং এইবার দোদুল্যমান দিগন্ত প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র নিশ্চল জিনিষ দেখতে পায়। ঠিক যেন একটা আল্‌পিনের ডগা। এত ক্ষুদ্র বাতিঘর দেখতে হলে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন।

"কাপ্তেন, আপনার কি মনে হয়, আমরা ওখানে পৌঁছতে পারব ?"

কাপ্তেন বলেন, "যদি এই বাতাসটা বইতে থাকে, আর নৌকাখানা ডুবে না যায়, তাহলে তা ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা ?"

প্রতিটি বিরাট ঢেউ ক্ষুদ্র নৌকাখানিকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করছে ; তরঙ্গ-শীর্ষগুলি তাকে নির্মম ভাবে আছড়াচ্ছে। যে গতিতে নৌকা এগুচ্ছে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌পুঞ্জগুলি না থাকলে নৌকারোহীদের কাছে তা বোধগম্যই হত না। তাকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা জিনিষ, পাঁচ-সাগরের হাতে নাজেহাল হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—নেহাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই উল্‌টে যায় নি। মাঝে মাঝে শুভ্র বহ্নিশিখার মত বিপুল জলরাশি তার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে।

কাপ্তেন প্রশান্ত কণ্ঠে বলনে—"জলটা ছেঁচে ফেল—রাঁধুনী মশাই।"

রাঁধুনী স্ফূর্তির সঙ্গে জবাব দেয়—"ঠিক বলেছেন ! কাপ্তেন সাহেব !"

সমুদ্রের ওপর এই মানুষগুলির মন যে সূক্ষ্ম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল তা বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কেউ প্রকাশ করে বলে নি এ কথা। কেউ তা উল্লেখও করেনি। তথাপি নৌকার মধ্যে সর্বত্র তা ছড়িয়ে ছিল, প্রতিটি মানুষের মনে ছিল এই উষ্ণ অনুভূতি। তাদের মধ্যে আছেন একজন কাপ্তেন, আছে একজন তেল-খালাসী, একজন রাঁধুনী, একজন সংযোজক—আর তারা সকলেই সকলের বন্ধু। সে বন্ধুত্বের বাঁধন এক বিচিত্র লোহার বাঁধন—সাধারণতঃ

এ বস্তু কোথাও দেখা দেয় না। আহত কাপ্তেন, নৌকার সামনের দিকে জলের পাত্রটিতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন, তিনি সর্বদাই মৃদুস্বরে শান্ত ভাবে কথা বলেন; কিন্তু ডিঙির এই তিন রকম তিনটি মানুষের মত এমন সদা-প্রস্তুত, অতি বাধ্য ক্ষিপ্রকর্মা নাবিক তিনি আর কোথাও পেতেন না। সকলের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে কি প্রয়োজন সবাই যে শুধু তাই বুঝেছে তা নয়; এ অনুভূতি তার চেয়ে বড় কিছু। এর মধ্যে সত্য সত্যই একটা ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। নৌকার অধিনায়কের প্রতি এই আনুগত্য ছাড়াও ছিল সেই মৈত্রীর বন্ধন। সংযোজক জীবনে মানব-বিদ্বেষের শিক্ষাই পেয়ে এসেছে, কিন্তু এই সময়েই সে বুঝতে পেরেছিল যে এই মৈত্রীর অভিজ্ঞতাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। কেউ কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে বলেনি। কেউ তা উল্লেখ করেনি।

কাপ্তেন বলছিলেন—"আমাদের যদি একটা পাল থাকত তাহলে বড় ভাল হত। দাঁড়ের পিছনে আমার ওভারকোটটা টাঙিয়ে দিয়ে দেখলে হয়, তোমাদের দুজনকে তাহলে একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া যায়।" রাঁধুনী ও সংযোজক তখন তাঁর কথামত মাস্তুলটা ধরে থাকে আর তার গায়ে ওভারকোটটা বেশ করে ছড়িয়ে দেয়। তেল-খালাসী হাল ধরে থাকে, আর নৌকাখানা এই নতুন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বেশ দ্রুত এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে তেল-খালাসীকে সমুদ্র তরঙ্গের প্লাবন থেকে নৌকা বাঁচানোর জন্য তড়িৎ গতিতে বৈঠা চালাতে হয়। তা নইলে পাল তোলার ফল ভালই হয়।

ইতিমধ্যে বাতিঘর ক্রমশঃই একটু একটু করে আকারে বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এতক্ষণে তার গায়ে একটু রঙ্‌ও ধরেছে বলে মনে হয়, যেন আকাশের গায়ে একটা ধূসর ছায়া। দাঁড়ে যে মানুষকে বসে আছে এই ছোট্ট ধূসর ছায়াটিকে দেখার আগ্রহে সে ঘন ঘন পিছন দিকে চাইছে—তাকে আর ঠেকানো যাচ্ছে না।

অবশেষে প্রতিটি ঢেউ-এর মাথায় ওঠার সময় দোলমান নৌকার লোকগুলি তীরভূমি দেখতে পায়। বাতিঘর যখন আকাশের গায়ে একটা দীর্ঘায়ত ছায়ার মত হয়ে উঠেছে তখনও এই তীরভূমি সমুদ্রের ওপরে একটি দীর্ঘ কালোছায়ার রেখা মাত্র। একটা কাগজের ফালির চেয়েও তা শীর্ণতর। রাঁধুনী বলে—"আমরা নিশ্চয়ই নিউ স্মারণার উল্‌টো দিকে পৌছেচি।" স্কুনার জাতীয় নানা জাহাজে করে সে অনেকবার এই উপকূল ঘুরে গেছে। সে আবার

বলে—"আরও একটা কথা, কাপ্তেন—আমার যেন মনে পড়ছে, এই ত্রাণ-শিবিরটা ওরা বছর খানেক হল তুলে দিয়েছে।"

কাপ্তেন শুধু বলেন—"তাই নাকি?"

বাতাস ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। রাঁধুনী এবং রিপোর্টারকে এখন আর দাঁড় খাড়া করে ধরে রাখার খাটুনি খাটতে হয় না। কিন্তু ঢেউগুলি তখনও আগের মতই প্রবল বেগে ডিঙিকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর ছোট নৌকাখানি বাতাসের সাহায্যে এগুতে না পেরে আহত জীবের মত তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। তেল-খালাসী আর সংযোজক আবার দাঁড় ধরে।

জাহাজডুবির কোনো নির্দিষ্ট স্থান-কাল নেই। নাবিকদের যদি জাহাজ-ডুবির জন্য তৈরী হবার শিক্ষা দেওয়া যেত, এবং তারা যখন সবচেয়ে বেশী তৈরী তখন জাহাজডুবি হবার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে সমুদ্রে এখন যত লোক ডুবে মরে তার চেয়ে অনেক কম মরত। ডিঙির এই চারজন লোক ডিঙিতে ওঠবার আগে দুদিন দুরাতের মধ্যে সামান্য যেটুকু সময় ঘুমুতে পেরেছে তা উল্লেখযোগ্য নয়; তা ছাড়া একটা মজ্জমান জাহাজের ডেক্ আঁকড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ানোর উত্তেজনায় তারা পেট ভরে খেতেও ভুলে গিয়েছিল।

এই সব কারণে, এবং আর অন্যান্য কারণে, কি তেল-খালাসী কি সংযোজক কারও এই সময় দাড় টান্‌তে ভাল লাগছিল না। সংযোজক সরল মনে ভাব্‌ছিল যে পাগল না হলে কি করে মানুষ দাঁড় বওয়ার মত কাজকে একটা আমোদ বলে ভাবতে পারে? এর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ কিছু নেই; এ একটা পৈশাচিক শাস্তি, আর এই কাজটা যে শরীরের পেশীর পক্ষে আতংকজনক এবং পৃষ্ঠদেশের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—সে কথা চরম মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরও স্বীকার না করে উপায় নেই। নৌকার সকলকে সম্বোধন করে সে বুঝিয়ে বলে দাঁড় টানার আনন্দ তার কাছে কি ধরনের আনন্দ বলে মনে হয়; তার কথা শুনে তেল-খালাসীর ক্লান্ত মুখখানা পরিপূর্ণ সহানুভূতির হাসিতে ভরে ওঠে। এই বেলা বলে রাখি, জাহাজ-ডুবির আগে তেল-খালাসীকেও জাহাজের ইঞ্জিন ঘরে ডবল-সিফ্‌ট্ কাজ করতে হয়েছিল।

কাপ্তেন বলেন—"এইবার একটু আস্তে আস্তে চালাও। নিজেদের বেশী ক্লান্ত করে আর কাজ নেই। যদি আমাদের ভাঙা ঢেউ পার হয়ে এগুতে হয়,

তাহলে তোমাদের গায়ে যত জোর আছে সবটুকুরই দরকার হবে, কারণ তখ: না সাঁতরে উপায় থাকবে না। তাই এখন একটু জিরিয়ে নাও।"

ধীরে ধীরে সমুদ্রবক্ষ থেকে ভূখণ্ড জেগে ওঠে। প্রথমে ছিল একটি মা: কালো রেখা, এখন হয়ে ওঠে একটি কালো রেখা আর একটি সাদা রেখা— গাছের সারি আর বালির চর। অবশেষে, কাপ্তেন বললেন তীরে তি: একটি বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। রাঁধুনী বলে—"ওটা নিশ্চয়ই সেই শরণার্থী শিবির। ওরা শিগ্গিরই আমাদের দেখতে পারে, আর আমাদের উদ্ধা: করবার জন্য এগিয়ে আসবে।" দূরের সেই বাতিঘর এখন অনেক উঁচু দেখায় কাপ্তেন বলেন—"এতক্ষণে ওখানকার রক্ষকের আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত অন্ততঃ যদি সে দূরবীন দিয়ে দেখে। তারপর সে জীবন-রক্ষী দলকে খব: দেবে নিশ্চয়।"

তেল-খালাসী নিচু গলায় বলে—"অন্য ডিঙিগুলোর একখানাও আমাদে: আগে এসে এই জাহাজডুবির সংবাদ দিয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ তাহ'ে: এতক্ষণে একখানা 'লাইফ-বোট' বেরিয়ে এসে আমাদের সন্ধান করত।"

ধীরে ধীরে অতি মনোরম ভাবে সমুদ্রের ওপর ভূখণ্ডের ছবি স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে। আবার বাতাস উঠ্ল। উত্তর-পুব থেকে ঘুরে দক্ষিণ-পুব থেকে এখন বইতে লাগল। অবশেষে নৌকার মানুষগুলির কানে একটা নতুন শব্ এসে লাগে—উপকূলে ঢেউ ভাঙ্গার চাপা বজ্রগর্জন। কাপ্তেন বলেন—আমর এখন কিছুতেই বাতিঘর পর্যন্ত পৌছতে পারব না। নৌকার মাথাটা আরে একটু উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দাও, বিলি।"

তেল-খালাসী বলে—"আচ্ছা হুজুর, আরও একটু উত্তর দিকে।"

এর ফলে ছোট্ট নৌকাখানা আবার তার নাকটা বাতাস যেদিকে বইছে সেই দিকে ঘুরিয়ে নেয়, এবং দাঁড়িরা ছাড়া আর সবাই দেখিতে পায় তীরভূমি ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। এই ভূমি-সম্প্রসারণের প্রভাবে ওদের মন থেকে সন্দেহ এবং বিপদের আশংকা ক্রমশঃ অপসারিত হতে থাকে। তখনও গভীর মনোযোগের সঙ্গে নৌকা চালাতে হচ্ছে, কিন্তু তার ফলে ওদের মনের প্রশান্ত প্রফুল্লতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হচ্ছে না। আর একঘণ্টার মধ্যে হয়ত ওরা তীরে পৌছবে।

ওদের মেরুদণ্ড নৌকার ভারসাম্য রক্ষা করতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই উদ্দাম অশ্বশাবকের মত ডিঙ্গিখানার ওপরে ওরা এখন সার্কাসের

ঘোড়সওয়ারের মতই বেশ কায়দা করে বসে আছে। সংযোজক ভাবছিল যে তার সর্বাঙ্গ বোধ হয় ভিজে গেছে, কিন্তু জামার বুকপকেটে হঠাৎ হাত লাগাতে সে দেখতে পেল যে তখনও তাতে আটটি চুরুট রয়েছে। তার মধ্যে চারটি সমুদ্রের জলে ভিজে গেছে ; আর বাকী চারটির কোন ক্ষতি হয় নি। একটু অনুসন্ধান করে কে যেন তিনটি শুকনো দেশলাই-এর কাঠিও বার করে, তারপর এই চারটি ভাসমান মূর্তি সেই ছোট্ট নৌকায় বসে আসন্ন মুক্তির আশায় সমুজ্জল চোখে মোটা মোটা চুরুট টানতে থাকে আর দুনিয়ার সব মানুষ সম্বন্ধে নির্বিচারে ভালমন্দ রায় দিতে থাকে। তারপর সবাই এক ঢোক করে জল পান করে নেয়।

কাপ্তেন মন্তব্য করলেন—"রাঁধুনী মশাই,—তোমার ঐ শরণার্থী-নিবাসের আশে-পাশে কোথাও ত' জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!"

রাঁধুনী জবাব দেয়—"না, তাই ত! কি আশ্চর্য! ওরা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?" ওদের চোখের সামনে আনত সমুদ্রোপকূলের প্রশস্ত ভূখণ্ড প্রসারিত। সেখানে আছে ছোট ছোট বালিয়াড়ি, তাদের মাথার ওপর ঘন কৃষ্ণ গাছপালার ভীড়। ভাঙ্গা ঢেউ-এর গর্জন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং মাঝে মাঝে বেলাভূমির ওপর গড়িয়ে-পড়া এক-একটা ঢেউ-এর শাদা ফেনার প্রান্ত রেখা দেখা যাচ্ছে। একটি ছোট্ট বাড়ি আকাশের গায়ে কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে শীর্ণদেহ বাতিঘর তার সামান্য ধূসর দৈর্ঘ্যটুকু নিয়ে আকাশে মাথা তুলে ধরেছে।

স্রোতের টান, ঝড়ের বেগ, এবং ঢেউ-র আঘাত ডিঙিটাকে উত্তর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। নৌকার লোকেরা বলে—"আশ্চর্য! ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না!'

ঢেউ ভাঙার আওয়াজ এখানে স্তিমিত, তথাপি তার স্বরে বজ্রগর্জন ও প্রচণ্ডতার আভাস বর্তমান। বিরাট তরঙ্গগুলি একে একে পার হচ্ছে নৌকা আর নাবিকেরা বসে বসে এই সমুদ্রগর্জন শুনছে। সবাই বলে—"এইবার নিশ্চয় আমাদের নৌকা ডুবে যাচ্ছে।'

একথা এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো যে জায়গাটার এদিক-ওদিক কোনোদিকেই বিশ মাইলের মধ্যে কোন ত্রাণ-শিবিরের অস্তিত্ব ছিল না। ওরা কিন্তু কেউ সে খবর জানতে না, তার ফলে ওরা জাতীয় জীবন-রক্ষী-

বাহিনীর দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে নানা কটু এবং অপ্রীতিকর মন্তব্য করছিল। ডিঙিতে চারজন মানুষ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বসে বসে বাছা বাছা খিস্তি আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় পূর্বের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে যায়।

"আশ্চর্য! ওরা আমাদের দেখতেই পাচ্ছে না!"

কিছুক্ষণ আগেকার প্রফুল্লতা এখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তাদের মন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে; অপর লোকের সর্ববিধ অক্ষমতার দৃষ্টিহীনতার, এমন কি কাপুরষতারও ছবি সেখানে সহজেই জেগে উঠেছে। এক জনবহুল ভূখণ্ডের তীরপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে, অথচ সেখান থেকে সাহয্যের এতটুকু ইঙ্গিতেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত কাপ্তেন বলেন—"আমার মনে হয় আমাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি এইভাবে বেশীক্ষণ নৌকা বাইতে থাকি তাহলে নৌকা ডুবে যাওয়ার পর আমাদের কারোই আর সাঁতার দেওয়ার সমর্থ থাকবে না।"

তেল-খালাসী দাঁড় টানছিল এইবার সে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে তীরেব দিকে চালাতে লাগল। সহসা সকলের শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। সবাই একটু চিন্তিত হয়।

কাপ্তেন বলেন: "আমরা যদি সবাই তীরে না পৌছতে পারি, সবাই জানো, কোথায় আমার শেষ সংবাদ পাঠাতে হবে?"

এরপর ওরা কিছুক্ষণ পরস্পরের মধ্যে সংক্ষেপে ঠিকানা এবং নির্দেশ বিনিময় করে। ওদের সকলের চিন্তাধরা সম্পর্কে বলা চলে যে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। ভাষায় তাকে বোধ হয় এইভাবে প্রকাশ করা চলে: "আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়,······আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়—আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়, তাহলে—সাত-সাগরের পাগলা দেবতাদের দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করি,—তাহলে কেন আমাকে এতদূর আসতে দেওয়া হল? কেন বালি আর গাছপালা দেখার সুযোগ দেওয়া হল? জীবনের পবিত্র ভোজ্যদ্রব্যে দাঁত বসাবার মুহূর্তে আমার নাকটাকে টেনে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যই কি আমাকে এখানে আনা হয়েছে? এ অতি অসঙ্গত কাণ্ড! নির্বোধে বুড়ী ভাগ্যদেবীর যদি এর চেয়ে ভাল আর কিছু করবার সাধ্য না থাকে তাহলে মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা প্রয়োজন। বুড়ী একেবারে আকাট বোকা, নিজেই নিজের মনের খবর রাখে না। যদি

আমাকে ডুবিয়ে মারারই ইচ্ছা ছিল তার, তাহলে গোড়াতেই তা করে এইসব দুর্ভোগের হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিল না কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই আজগুবি। কিন্তু না, আমাকে ডুবিয়ে মারার ইচ্ছা তার নেই। আমাকে ডুবিয়ে মারতে সে সাহস করবে না। সে আমাকে ডুবিয়ে মারতে পারে না। এত কাণ্ড-কারখানার পর তা সে কিছুতে পারে না!" এরপর হয়ত লোকটি আকাশের দিকে মুষ্টি উদ্যত করে আস্ফালন করতে চায়, বলে—"মারো, এখনই ডুবিয়ে মারো আমাকে, তখন আমি তোমাকে কি রকম মোক্ষম গাল দিয়ে মরি তাও কান পেতে শোনো।"

এই সময় যে সব ঢেউ উঠ্‌তে থাকে সেগুলো আরো ভয়ংকার। সব সময়ে মনে হয়, এখুনি বুঝি তারা ফেনার প্লাবন সৃষ্টি করে ছোট্ট নৌকাখানার ওপর ভেঙে পড়বে। তাদের ভাষার মধ্যে যেন একটা প্রস্তুতিসূচক দীর্ঘায়িত তর্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যাদের মন সমুদ্রে অনভ্যস্ত তারা কিছুতেই ভাবতে পারত না যে এমন একটা ক্ষুদ্র ডিঙির পক্ষে ঠিক সময়ে এই সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাড়া ঢেউএর মাথায় উঠে যাওয়া সম্ভব। তীর তখনও অনেক দূরে। তেল-খালাসী ভাঙা ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে নৌকাচালনায় অতি সুনিপুণ। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—"ভাই সব, এই ডিঙিকে আর তিন মিনিটও বাঁচানো যাবে না, আর সাঁতরে পার হওয়ার পক্ষে আমরা বড় বেশী দূরে আছি। কাপ্তেন, আবার কি ডিঙিটাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাব?"

কাপ্তেন বলেন—হ্যাঁ। তাই যাও।"

তেল-খালাসী তখন অতি দ্রুত অলৌকিক নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং ক্ষিপ্র অথচ সুদৃঢ় হস্তে দাঁড় বেয়ে, ডিঙ্গিটাকে ভাঙ্গা ঢেউ-এর খেলার মধ্যেই ঘুরিয়ে নিল এবং তাকে বাহির সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্রে আছড়াতে আছড়াতে নৌকাখানা যতক্ষণে আবার গভীর জলে গিয়ে না পৌছল, ততক্ষণ কেউ একটি কথাও বলে নি। তারপর বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে কে একজন বলে ওঠে—"যাই হোক, এতক্ষণ ওরা নিশ্চয়ই তীর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে।"

গাংচিলের দল তির্যক ভঙ্গীতে বাতাসের বিপরীত মুখে ধূসর-নির্জন পুব আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। ময়লা নোংরা মেঘ আর জ্বলন্ত বাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার মত ম্লান লাল রঙের মেঘ সাজিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে একটা ছোট ঝড় এসে পড়ল।

"আচ্ছা ঐ জীবনরক্ষী দলের লোকগুলি কি জাতীয় জীব? বড় চমৎকার মানুষ ওরা—না?" "আশ্চর্য! ওরা আমাদের দেখতে পেল না।"

"ওরা হয়ত মনে করছে আমরা এখানে প্রমোদ ভ্রমণে এসেছি। হয়ত ভাবছে আমরা মাছ ধরতে এসেছি। কিংবা হয়ত ভাবছে আমরা সবাই হস্তিমূর্খ।

বিকেলটা বড় দীর্ঘ। স্রোত যেন বিপরীতমুখী—ওদের দক্ষিণ দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাওয়া এবং ঢেউ ওদের ঠেলছে উত্তর দিকে। সামনে অনেক দূরে, যেখানে তটরেখা, সমুদ্র এবং আকাশ একত্র হয়ে এক বিরাট কোণ রচনা করেছে, সেখানে কতকগুলি ফুটকির মত কি দেখা যাচ্ছে, বোঝা যায় যে সমুদ্রতীরে একটা শহর রয়েছে।

"সেণ্ট অগাষ্টিন শহর না কি?"

কাপ্তেন মাথা নেড়ে বলেন—"মস্‌কিটো খাড়ির এত কাছে তা হতে পারে না।"

তেল-খালাসী দাঁড় টানে, তারপর সংযোগরক্ষী দাঁড় টানে, তারপর আবার তেল-খালাসী দাঁড় টানে। সে এক অতি ক্লান্তিকর পরিস্থিতি। শরীর বিজ্ঞানের গ্রন্থে একটা সম্পূর্ণ সৈন্যদলের সমবেত শরীর-তাত্ত্বিক বিবরণে মানুষের পৃষ্ঠদেশকে যতরকমের ব্যথা ও বেদনার আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা ও বেদনা সেখানে বাসা বাঁধতে পারে। মানুষের পিঠ একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে পেশী সংক্রান্ত অসংখ্য সংঘর্ষ, জট-পাকানো, মোচড় লাগা, ফিক ধরা ও অন্যান্য আরামদায়ক ব্যাপার অনায়াসে অভিনীত হতে পারে।

সংযোগরক্ষী প্রশ্ন করে—"আচ্ছা বিলি, তোমার কি কখনও নৌকা বাওয়ার সখ ছিল?"

তেল-খালাসী বলে—"না; তুমি ওসব কথা ছাড়ো ত'!"

যখন কাউকে দাঁড় টানবার আসন ছেড়ে নৌকার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় তখন তার শারীরিক অবসাদ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে কোনমতে একটা আঙুল নাড়া ছাড়া আর সব ব্যাপার সম্বন্ধেই সে উদাসীন হয়ে পড়ে। সমুদ্রের জল ছলাৎ ছলাৎ করে নৌকার তলায় দুলতে থাকে, তাকে তার মধ্যেই শুয়ে থাকতে হয়। একটা আড়কাঠের ওপর মাথা রেখে সে শুয়ে থাকে, মাথা থেকে এক ইঞ্চি দূরেই হয়তো তরঙ্গ-চূড়ার আবর্তন দেখা যায়। কখনও

কখনও একটা ঢেউ হয়তো মহা কোলাহলে নৌকার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর একবার তাকে স্নান করিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু কিছুই আর তাকে উত্যক্ত করতে পারে না। তবে একথা নিশ্চিত যে এই সময়ে যদি নৌকাখানা উল্‌টে— যায় তাহলে সে পরম আরামে সমুদ্রের ওপর গড়িয়ে গিয়ে পড়বে—যেন সে মনে মনে ঠিক জানে যে সে একটা বিরাট নরম গদির ওপর গিয়ে পড়ছে।

"দেখ দেখ, তীরে একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে !"

"কই ?

"ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছ ? দেখছ' ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—লোকটা হেঁটে যাচ্ছে।"

"ঐ দেখ, এখন থামল। দেখ, আমাদের দিকেই মুখ ফিরিয়েছে।"

"ঐ যে, আমাদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে !"

"হাঁ, তাই-ত।

"এখন আর আমাদের কোন চিন্তা নেই। আর কোন চিন্তা নেই আমাদের। এইবার আধঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চয় একখানা নৌকা আমাদের উদ্ধার করতে এসে যাবে।"

"লোকটা চলে যাচ্ছে। লোকটা দৌড়াচ্ছে, ঐ বাড়িটার দিকে যাচ্ছে।" সুদূর তটভূমিকে সমুদ্রের চেয়ে নীচু বলে মনে হয়। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে তবেই লোকটার ছোট্ট কালো মূর্তিটা চোখে পড়ে। কাপ্তেন দেখলেন, একটা সরু গাছের ডাল জলে ভেসে যাচ্ছে। ওরা সেই দিকে নৌকা বেয়ে চলে। অদ্ভুত আকস্মিক ব্যাপার,—নৌকায় একখানা স্নানের তোয়ালে ছিল। ডালটার সঙ্গে সেটিকে বেঁধে কাপ্তেন সেটি নাড়তে থাকেন। দাঁড়ি মাথা ঘোরাতে সাহস করে না, সেজন্য সে আর সবাইকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়।—

"এখন লোকটা কি করছে ?"

"আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চেয়ে দেখছে বলে মনে হয়। ঐ যে আবার বাড়ির দিকেই যাচ্ছে—আবার দেখ্‌ছি থামল !"

"ও কি আমাদের দিকে হাত নাড়ছে ?"

"না, এখন আর নাড়ছে না, আগে কিন্তু নেড়েছিল।"

"দেখ ! আর একটা লোক আসছে !"

" লোকটা দৌড়াচ্ছে।"

"লোকটা যাচ্ছে কি না দেখো ত' !"

"আরে! লোকটা সাইকেল চড়ে আছে, এইবার অন্য লোকটির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। দুজনেই আমাদের দিকে হাত নাড়ছে! দেখ দেখ!"

"তীরের ওপর কি যেন একটা আসছে দেখা যাচ্ছে!"

"জিনিষটা কি বলো ত'?"

"তা নৌকার মতই ত দেখাচ্ছে।"

"ঠিক ঠিক—ওটা একটা নৌকাই বটে।"

"না-না, চাকা রয়েছে যে!"

"হাঁ, তাইত। তাহলে এটা নিশ্চয় একখানা লাইফ-বোট। ডাঙ্গার ওপর লাইফ-বোটগুলোকে গাড়ীতে করে টেনে নিয়ে বেড়ায় কি না!"

"তাহলে নিশ্চয় ওটা লাইফ-বোট।"

"না না, হায় ভগবান! ওটা—ওটা একখানা বাস।"

"আমি বল্‌ছি ওটা একটা লাইফ-বোট।"

"না তা নয়, ওটা একখানা বাস। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখছ? হোটেলের যে সব বড় বড় বাস থাকে—তারই একখানা।"

"সর্বনাশ! তুমি ঠিকই বলেছ। ওটা একখানা বাস, নিশ্চয় একখানা বাস।" আচ্ছা, বাস নিয়ে ওরা কি করছে মনে হয়? হয়ত ওরা জীবনরক্ষী কর্মীদের সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করছে, কি বলো?"

"তাই হবে, সেটাই সম্ভব! দেখ, একটা লোক ছোট্ট একটা কালো নিশান নাড়াছে। লোকটা বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দুজন লোক এবার এর কাছে চলে এল। এখন ওরা সবাই মিলে কথাবার্তা বলছে। পতাকা-হাতে লোকটার দিকে চেয়ে দেখ। না, ও ত' নিশান নাড়ছে বলে মনেহচ্ছে না।"

"ওটা মোটেই নিশান নয়। কি বলো? ওটা ওর গায়ের কোট! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওটা কোট।"

"তাইত"—ওটা ত' কোটই বটে। কোটটা খুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়ছে। কেমন করে কোটটা ঘোরাচ্ছে দেখ!"

"দেখ, একটা কথা বলি, ওখানে কোন ত্রাণ-শিবির নেই। একটা শীত-কালীন স্বাস্থ্যনিবাস—তারই হোটেলের বাস, কয়েকজন হোটেলবাসীকে নিয়ে এসেছে আমাদের ডুবে মরার দৃশ্য দেখানোর জন্য।"

"তাহলে ঐ কোট্-ওয়ালা আহাম্মকটার অর্থ কি? ও তাহলে কিসের ইঙ্গিত করছে, বলো ত?"

"মনে হচ্ছে, ও যেন আমাদের উত্তর দিকে যেতে বলবার চেষ্টা করছে। ঐ দিকে নিশ্চয় একটা ত্রাণ-শিবির আছে।"

"না, ওর ধারণা, আমরা মাছ ধরছি। তাই ফূর্তি করে আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য ঐ রকম জাল ফেলার ভঙ্গী করছে। দেখেছ?—ঐ দেখ, উইলি!"

"ওর ঐ সব সংকেতের মানে বুঝতে পারলে বড় ভাল হত! কি বলতে চায় ও? তোমার কি মনে হয়?

"কিছুই বলতে চায় না; শুধু একটু মজা করছে।"

"যদি ও সংকেত করে আমাদের বলত ভাঙা ঢেউ-এর ভেতর দিয়ে আবার এগুতে চেষ্টা করতে, অথবা বাইরের সমুদ্রে গিয়ে অপেক্ষা করতে, কিংবা উত্তর দিকে যেতে, কিংবা দক্ষিণ দিকে যেতে, কিংবা চুলোয় যেতে—তাহলে ওর আচরণের একটা অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে দেখ! ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কোটটা চাকার মত ঘোরাচ্ছে। বেটা গর্দভ!"

"আরো অনেক লোক আসছে।"

"এখন একেবারে ভীড় হয়ে গেছে। দেখো, দেখো, ওটা একটা নৌকা বোধ হয়?"

"কোথায়? ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি কি বলছ বুঝেছি। না ওটা নৌকা নয়।"

"লোকটা কিন্তু এখনও কোট নাড়ছে।"

"হয়ত ভেবেছে ওর কোট নাড়া দেখতে আমাদের খুব ভাল লাগছে। এখনও থামছে না কেন লোকটা? এর কোনো মানে হয় না।"

"কি জানি! আমার মনে হয় ও আমাদের উত্তরে যেতেই বলছে। ওদিকে কোথাও নিশ্চয় একটা ত্রাণ-শিবির আছে।"

"দেখো, লোকটা এখনও ক্লান্ত হয় নি—সমানে কোট নেড়ে যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য! কতক্ষণ ঐ রকম করবে, কে জানে? আমাদের দেখতে পাওয়ার পর থেকেই ঐ রকম করে কোট নাড়ছে। লোকটা মহা-মূর্খ! নৌকা ভাসানোর জন্য লোকজন সংগ্রহের চেষ্টা করছে না কেন ওরা? একখানা মাছধরা নৌকা বা বড় ধরনের একখানা 'ইয়ল' ত' সহজেই এখানে চলে আসতে পারে। যাহোক একটা কিছু করছে না কেন ওরা?"

"ওঃ! এইবার সব ঠিক হয়েছে। বুঝেছি।"

"ওরা যখন এবার আমাদের দেখতে পেয়েছে, তখন আর দেরী নেই—শিগ্গিরই আমাদের উদ্ধারের জন্য একখানা নৌকা পাঠিয়ে দেবে।"

নীচু ভূখণ্ডের ওপরকার আকাশে একটা ক্ষীণ পীতাভ রঙ্ ফুটে উঠেছে। সমুদ্রের ওপর সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে, নৌকার লোকগুলি শীতে কাঁপতে শুরু করেছে। একজন তার মানসিক অধীরতা ভাষায় প্রকাশ করে বলে—"হায় রে কপাল! আমাদের কি এইখানে এমনিভাবে পড়ে পড়ে ভুগতে হবে! সারারাত এমনি করে ঢেউ-এর ঝাপ্টা খেয়ে মরতে হবে?"

"—না না, সারারাত এইভাবে থাকতে হবে না! কিছু ভেবো না'। ওরা এখন আমাদের দেখতে পেয়েছে, শিগ্‌গিরই আমাদের সন্ধান করতে আসবে।"

তীরভূমি ক্রমে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। সেই কোট-নাড়া লোকটি এই অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। অন্ধকার ক্রমে ক্রমে বাসখানাকে এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে গ্রাস করে ফেলেছে। ঢেউ-এর ঝাপটা যখন সগর্জনে নৌকার গায়ে আঘাত করে লাফিয়ে উঠছে, তখন নৌকারোহী মানুষগুলি শিউরে উঠছে আর গালি বর্ষণ করছে—মনে হয় যেন লোহা পুড়িয়ে তাদের গায়ে ছেঁকা দেওয়া হচ্ছে।

"যে আহাম্মকটা কোট নাড়ছিল, তাকে যদি একবার ধরতে পারতাম, তাহলে মনের সাধ মিটিয়ে লোকটাকে একটা ঘুসি মারতাম।"

"কেন? ও কি করেছে?"

"কিছুই করে নি! শুধু মনে হয় বেটা যেন ফূর্তিতে ফেটে পড়ছিল!" এদিকে তেল-খালাসী দাঁড় টানছে, তারপর সংযোজক, আবার তারপর তেল-খালাসী—এইভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। বিরস পাংশু মুখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর সীসার মত ভারী দাঁড় টেনে চলেছে। দক্ষিণ দিগন্ত থেকে বাতিঘরের ছবি বিলুপ্ত হয়েছে। অবশেষে একটা পাণ্ডুর তারকা আকাশে আবির্ভূত হয়—যেন এইমাত্র সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। পশ্চিম গগনের জাফ্‌রানী রঙ্ সর্বগ্রাসী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তীরভূমি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু ঢেউ ভাঙ্গার মৃদু বিষণ্ণ গর্জনের মধ্যে তার পরিচয় জেগে রইল।

"আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়—আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়—আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়, তাহলে কেন আমাকে এতদূর আসতে দেওয়া হল?—বালি আর গাছপালা দেখবার সুযোগ দেওয়া হল? জীবনের পবিত্র ভোজ্যদ্রব্যে দাঁত বসাবার মুহূর্তে আমার নাকটাকে টেনে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্যই কি আমাকে এখানে আনা হয়েছে?"

জলপাত্রের কাছে পড়ে আছেন মূর্তিমান ধৈর্যের মত কাপ্তেন সাহেব। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে দাঁড়িদের সঙ্গে কথা বলছেন।

"নৌকার মাথাটা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখো! মাথাটা ওপরে ভাসিয়ে রাখো।" ক্লান্ত ও মৃদুগলায় ওরা বলে—"আচ্ছা হুজুর, মাথাটা ওপরে ভাসিয়ে রাখছি।" বড় শান্ত এই সন্ধ্যাটি—তাতে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র দাঁড়িরা ছাড়া সবাই নৌকার তলায় অবসন্ন ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ে আছে। আর কাপ্তেন—তিনি কোন রকমে চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছেন, বিরাট কালো কালো ঢেউগুলো অতি ভয়ংকর নীরবতার সঙ্গে এদিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে তরঙ্গচূড়ার চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রাঁধুনির মাথাটা আড়কাঠের ওপরে হেঁট হয়ে পড়ে আছে নাকের নীচের জলের দিকে সে অত্যন্ত আগ্রহহীন ভাবে তাকিয়ে আছে। তার মন তখন নানা দৃশ্যের চিন্তায় ভরপুর। অবশেষে সে হঠাৎ বলে ওঠে—"আচ্ছা বিলি, কি ধরনের 'পাই' খেতে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?"

তেল-খালাসী ও সংযোগরক্ষী অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বলে ওঠে—"পাই!"

"গোল্লায় যাও তুমি! খবরদার ওসব কথা এখন মুখে এনো না।"

রাঁধুনি বলে—"আমি কিন্তু ভাই এখন হাম্ 'সাণ্ড্উইচে'র কথা ভাবছি আর—"

সমুদ্রের বুকে খোলা নৌকায় যে রাত কাটানো যায়—সে রাত বড় সুদীর্ঘ হয়। অন্ধকার গভীর হয়ে উঠেছে—দক্ষিণ দিকের সমুদ্র থেকে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত আলোর জৌলুষ এখন পাকা সোনার মত দেখাচ্ছে। উত্তর দিগন্তে একটা নতুন আলো জলের ওপর ভেসে উঠেছে। এই দুটি মাত্র আলোই হ'ল পৃথিবীর আসবাব। তাছাড়া সাগর তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নেই।

দুজন লোক নৌকার হালের কাছে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে, আর ডিঙ্গির ভিতরকার দূরত্ব এমনই অসাধারণ যে দাঁড়ি অতি সহজেই পা দুটিকে তার এই দুই সহযোগীর দেহের নীচে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে—উদ্দেশ্য সে দুটিকে একটু গরম রাখা। আর এদের দুজনের পা দাঁড়ির আসনের তলা দিয়ে অনেকদূর প্রসারিত হয়ে কাপ্তেনের পায়ে গিয়ে ঠেকেছে। ক্লান্ত দাঁড়িদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ, নিশীথিনীর হিমশীতল তরঙ্গের মত, হুড়মুড় করে নৌকার মাঝে এসে পড়ে; কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল ওদের সর্বাঙ্গ

আর একবার সিক্ত করে দেয়। মুহূর্তের জন্য ওরা একবার নিজ নিজ শরীর কুঁকড়ে নেয়, একবার একটু কাতর শব্দ করে, আবার তখনই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে। দোদুল্যমান নৌকার মধ্যে জল ছলাৎ ছলাৎ করে আওয়াজ করে।

তেল-খালাসী ও সংযোগরক্ষী একটা কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। ওদের একজন যখন দাঁড় টানতে টানতে একেবারে অশক্ত হয়ে পড়বে, তখন সে আর একজনকে নৌকার তলার নোনা জলের সুখশয্যা থেকে ডেকে জাগিয়ে তুলবে।

তেল-খালাসী দাঁড় টানছে, ঘুমে তার মাথাটা ঢুলে পড়ছে; অবশেষে দুর্বার ঘুমের আক্রমণ ওকে অন্ধ করে দেয়; তবু তার পরেও সে দাঁড় টানতে থাকে। তারপর ও নৌকার তলার একজনকে স্পর্শ করে তার নাম ধরে ডাকে,—অতিশয় নম্র গলায় বলে—"আমার হয়ে একটু দাঁড় টানবে ভাই?"

তখনই জেগে উঠে কষ্টেসৃষ্টে বসে পড়ে সংযোজক বলে—"নিশ্চয় বিলি!" অতি সতর্কভাবে ওরা পরস্পরের সঙ্গে আসন পরিবর্তন করে, তারপর তেল-খালাসী রাঁধুনীর পাশে নোনা জলের মধ্যেই বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ে মনে হয় যেন এক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

সমুদ্রের সেই অসাধারণ তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এখন ঢেউগুলি বিনা গর্জনে এসে পড়ছে। দাঁড়িদের এখন অবশ্যকর্তব্য হল নৌকার মুখ এমন ভাবে ফিরিয়ে রাখা যাতে ঢেউ-এর ধাক্কায় নৌকা উল্টে না যায়, আর যখন তরঙ্গচূড়াগুলি শোঁ-শোঁ করে পাশ দিয়ে ছুটে যায় তখন যাতে নৌকা জলে ভরে না যায় সেদিকে নজর রাখা। কালো কালো ঢেউগুলো এখন নিঃশব্দে এসে পড়ছে, অন্ধকারে তা দেখা দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে দাঁড়ি সতর্ক হওয়ার আগেই এক একটা ঢেউ প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ছে।

খুব মৃদুগলায় রিপোর্টার কাপ্তেনকে উদ্দেশ করে কথা বলে। সে ঠিক বুঝতে পারে না উনি জেগে আছেন কিনা, যদিও মনে হয় যেন এই লোহায় গড়া মানুষটি সব সময়েই জেগে আছেন: "উত্তর দিকের ঐ আলোর দিকে কি নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, কাপ্তেন?"

সেই পরিচিত ধীর গলায় উত্তর আসে—"হ্যাঁ, আলোটাকে নৌকার মাথায় দু' ডিগ্রী বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলো।"

রাঁধুনী তার দেহের চার পাশে একটা লাইফ-বেলট্ কষে বেঁধে নিয়েছে. সোলার তৈরী বেঢপ জিনিসটি যেটুকু উত্তাপ দান করতে পারে তা সে পেতে

চায়। কোনও দাঁড়ি যখন কাজ বন্ধ করছে তখুনি শীতে তার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করতে শুরু করছে। তারপর ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়তেই পাশে রাঁধুনির দেহটা তার কাছে অগ্নিকুণ্ডের মত উষ্ণ বলে মনে হচ্ছে। সংযোগরক্ষী দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে পায়ের কাছে যে দুটি মানুষ ঘুমোচ্ছে তাদের লক্ষ্য করছে। রাঁধুনীর বাহু তেল-খালাসীর কাঁধ জড়িয়ে ধরে আছে ; ওদের সামান্য আচ্ছাদন এবং শ্রান্ত শীর্ণ মুখ দেখে মনে হয় ওরা যেন অকূল সমুদ্রে দুটি শিশু—অরণ্যে পথহারা রূপকথার কাহিনীর সেই শিশুদের এক বীভৎস রূপান্তর।

এরপর খাটুনির ক্লান্তিতে ও প্রায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, কারণ হঠাৎ সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জন শোনা যায় ; একটা ঢেউ-এর চূড়া হুঙ্কার দিয়ে নৌকার ভিতর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। লাইফ-বেল্ট্ বাঁধা রাঁধুনীকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি সেই আশ্চর্য। রাঁধুনী তেমনই ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তেল-খালাসী উঠে বসেছে—চোখ পিট্ পিট্ করে চেয়ে দেখ্‌ছে, আর নতুন করে ঠাণ্ডা লাগায় হি-হি করে কাঁপছে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সংযোগরক্ষী বলে—"বিলি ! ভাই আমি ভারী দুঃখিত।"

তেল-খালাসী বলে—"তাতে কি হয়েছে খোকা ! ঠিক আছে।" এই বলে সে আবার শুয়ে পড়েই ঘুমে অচেতন হয়ে যায়। একটু পরে মনে হল কাপ্তেনও ঝিমুচ্ছেন, আর সংযোজকের মনে হয়, সাত সাগরের বুকের ওপর সে যেন একা ভেসে বেড়াচ্ছে। তরঙ্গের ওপর দিয়ে বাতাস ছুটে আসছে। সে বাতাসের একটা নিজস্ব স্বর আছে ; সে স্বর যেন মৃত্যুর চেয়েও বিষণ্ণ।

নৌকার পিছনে হুস্ করে একটা দীর্ঘায়িত জোরালো আওয়াজে শোনা গেল ; কালো জলের ওপর জেগে উঠল নীল-অগ্নিশিখার মতো ঝক্‌ঝকে ফস্‌ফরাসের একটা সুদীর্ঘ রেখা। যেন এক বিরাট ছুরি দিয়ে এই রেখা আঁকা হয়েছে।

তারপর সব নিস্তব্ধ। সংযোজক হাঁ করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সহসা আবার হুস্ করে সেই শব্দ, আবার সেই রকম নীল আলোর দীর্ঘ রেখা, তবে এবার আলোটা নৌকার পাশাপাশি এসে পড়েছে—দাঁড় বাড়িয়ে দিলেই যেন ছোঁয়া যাবে। সংযোজক লক্ষ্য করে, কোন মাছের একটা বিরাট পাখনা, ছায়ার মত দ্রুতগতিতে জল কেটে ছুটে যাচ্ছে, তারই গা থেকে স্ফটিক-বিন্দুর মত জলকণা ছিটকে পড়ছে, আর তার অনুসন্ধানে এই দীর্ঘ উজ্জ্বল রেখা ফুটে উঠেছে।

সংযোজক ঘাড় ফিরিয়ে কাপ্তেনের দিকে তাকায়। তাঁর মুখটা দেখা যাচ্ছে না, ঘুমিয়ে আছেন বলে মনে হয়। সমুদ্র-শিশুদের দিকে তাকায়, তারা যে ঘুমে অচৈতন্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সহানুভূতিশূন্য মনে সে একদিকে একটু ঝুঁকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে শাপান্ত করতে থাকে।

সেই বস্তুটা কিন্তু নৌকার কাছ থেকে সরে না। সামনে বা পিছনে, এদিকে না হয় ওদিকে, অনেকক্ষণ অথবা অল্পক্ষণ পরে পরে এই সুদীর্ঘ ঝলকানি দেখা যায়, কালো পাখনার হুস্ হুস্ আওয়াজ শোনা যায়। প্রাণীটির গতিবেগ এবং শক্তিমত্তার তারিফ না করে থাকা যায় না। একটা অতিকায় এবং সুতীক্ষ্ণ ক্ষেপণাস্ত্রের মত সে জলকে বিদীর্ণ করে ছুটতে থাকে। এই প্রতীক্ষমাণ প্রাণীটির উপস্থিতি হয়ত বনভোজনের কোনো দলকে আতংকিত করে তুলত, ততখানি আতংক ওর মনে জাগেনি। সে শুধু ঘোলাটে চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে মৃদু গলায় অভিশাপ বর্ষণ করে যায়।

যাই হোক্, একথাও সত্যি যে এই প্রাণীটার সঙ্গে একা একা থাকার বাসনাও ওর নেই। ওর মনে হয় কোনো একজন সহচর দৈবাৎ জেগে উঠে ওকে সঙ্গদান করুক। কাপ্তেন কিন্তু নিশ্চলভাবে জলপাত্রের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছেন, আর তেল-খালাসী ও রাঁধুনী নৌকার তলদেশে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

"আমাকে যদি ডুবে মরতে হয়—আমাকে যদি ডুবে মরতে হয়—আমাকে যদি ডুবেই মরতে হয়—তাহলে যে সাতটি উন্মাদ দেবতা সমুদ্র শাসন করে তাদের নামে প্রশ্ন করি, কেন এতদূর নিয়ে এসে বালি আর গাছ দেখার সুযোগ আমাকে দেওয়া হল ?"

একথা অনায়াসে বলা চলে যে জঘন্য অবিচার হলেও এই রকম ভয়ংকর রাত্রিতে যে কোন লোকের নিশ্চিত বিশ্বাস হতে পারে যে সেই সাতটি উন্মাদ দেবতা সত্যিই তাকে ডুবিয়ে মারতে চায়—যে মানুষটি এত কঠোর পরিশ্রম করেছে, এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছে, তাকে জলে ডুবিয়ে মারা সত্যি বড় জঘন্য অবিচার। লোকটির মনে হয় যে এ এক অতি অস্বাভাবিক অপরাধ। অবশ্য সেই প্রাচীন যুগের চিত্র-বিচিত্র করা পালের জাহাজগুলোর আমল থেকে অনেক লোকই ডুবে মরেছে, তবু—

মানুষের যখন মনে হয় যে প্রকৃতি তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বলে মনে করে না, এবং একথাও মনে করে না যে তাকে বিলুপ্ত করে দিলে জগতের কোন রকম অঙ্গহানি হবে, তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া, ইট ছুড়ে মন্দির ভেঙে ফেলবে। তারপর যখন সে দেখে হাতের কাছে ইটও নেই, মন্দিরও নেই, তখন তার মন তীব্র তিক্ততায় ভরে ওঠে। তখন প্রকৃতির যে কোন দৃশ্য-অভিব্যক্তিকে সে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করতে চায়।

কিন্তু বিদ্রূপ করার মত কোন সুস্পষ্ট বস্তুও যদি না জোটে, তখন বোধ হয় সে কোন দেবমূর্তির সম্মুখীন হয়ে নিজের জন্য সাফাই গাইতে চায়, এক হাঁটু গেড়ে নত হয়ে বসে পড়ে করজোড়ে নিবেদন করতে চায়—"হ্যাঁ ঠিক বটে, কিন্তু আমাকে যে আমি বড় ভালবাসি!"

তার মনে হয় শীতের রাতের ঐ সুদূরের শীতল তারাটি যেন সেই বাণী তাকে শোনাচ্ছে। অতঃপর নিজের জীবনের এই শোচনীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে।

ডিঙ্গির মানুষগুলি এইসব নিয়ে কোন আলোচনা করেনি, কিন্তু প্রত্যেকেই যে নীরবে নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী এ সব কথা চিন্তা করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মুখে সাধারণতঃ অপরিসীম শ্রান্তি ছাড়া আর কোনও রকমের অভিব্যক্তি দেখা যায় না। নৌকা চালানোর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাও তারা কয় না। সংযোজকের মনের ভাবাবেগের সুরে সুর মিলিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য ভাবে একটা কবিতা তার স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে। সে যে এই কবিতাটি ভুলে গিয়েছিল একথাও তার মনে ছিল না, তবুও সহসা মনে কবিতাটি জেগে ওঠে:

লিজঁর এক সৈনিক আল্‌জিয়ার্সে পড়ে আছে মৃত্যুশয্যায়,
সেখানে রমণীর শুশ্রূষা নেই,
নেই নারীর চোখের জল,
তবে পাশে আছে সহচর,
তার হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে
"আর কোনোদিন দেখতে পাবনা—
আমার সেই জননী জন্মভূমি।"

শৈশবে সংযোজকের একথা জানার সুযোগ হয়েছিল যে একদা লিজঁর একজন সৈনিক আল্‌জিয়ার্সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটিকে কোনোদিন তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তার অসংখ্য সহপাঠিরা

এই সৈনিকের দুঃখের কথা তাকে আবৃত্তি করে শোনাতো এবং এই সমবেত চীৎকারের ফলেই সে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিল। লিজঁর একজন সৈনিক আল্‌জিয়ার্সে মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়েছে—এর সঙ্গে তার যে কোনো সম্পর্ক আছে তা কোনদিন মনে হয়নি, এবং বিষয়টি যে দুঃখজনক একথাও তার মনে জাগেনি। পেন্‌সিলের শীষ ভেঙে যাওয়ার চেয়েও ব্যাপারটা তার কাছে তুচ্ছতর ছিল।

এখন কিন্তু জীবন্ত মানবিক সত্য হিসাবে কবিতাটি বিচিত্রভাবে তার মনে এসেছে। কবি আগুন পোয়াচ্ছেন ও চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তার ফাঁকে নিজের হৃদয়ে দুই একটি বেদনার ছবি আঁকছেন—এই চিত্র নয়। এখন তা কঠোর বাস্তব, বেদনাভরা, সুন্দর সত্যে রূপান্তরিত।

সংযোজক যেন সেই সৈনিকটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বালির ওপর সে শুয়ে আছে, তার পা দুটি প্রসারিত, নিশ্চল। তার বিবর্ণ বাঁ হাতখানি বুকের ওপর পড়ে আছে, যেন পলায়মান জীবনের পথরোধ করার চেষ্টা করছে। আঙুলের ফাঁকের ভিতর দিয়ে রক্ত ঠেলে বেরুচ্ছে। আর সেই সুদূর আল্‌জিয়ার্সে সেখান থেকে অনেক দূরে, অপরাহ্নের শেষ সূর্য-রশ্মির ম্লান আলোয় আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে অনুচ্চ চতুষ্কোণ শিবিরপূর্ণ একটি শহর। সংযোজক দাঁড় টানে আর সৈনিকের ঠোঁটের মৃদু থেকে মৃদুতর কম্পনের স্বপ্ন দেখে। তার মন এক পরিপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক অথচ সুগভীর সমবেদনায় ভরে ওঠে। আল্‌জিয়ার্সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত লিজিয়নের সেই সৈনিকের জন্য সে গভীর দুঃখবোধ করে।

যে জীবটি এতক্ষণ ধরে নৌকাখানাকে অনুসরণ করেছে এবং অপেক্ষা করেছে, বিলম্বের ফলে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সেই জল-ছিটকানোর আওয়াজ আর শোনা যায় না, সুদীর্ঘ অনুসরণের সেই নীল-আলোর ঝলকানিও আর দেখা যায় না। উত্তর দিকের আলোটা কিন্তু এখনও ঝিক্‌মিক্ করছে, কিন্তু দেখে মনে হয় সেটা নৌকার একটু কাছে আসেনি। মাঝে মাঝে উপকূলে ভেঙ্গে-পড়া ঢেউ-এর গর্জন সংযোজকের কানে ভেসে আসে, তখন সে নৌকার মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে আরো জোরে দাঁড় টানতে থাকে। দক্ষিণ দিকে বেশ বোঝা যাচ্ছে তীরভূমিতে একটা নিশানা-বহ্নি কে জ্বালিয়ে রেখেছে। আগুনটা এত নীচু এবং এত দূরে যে সেটাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পিছনের খাড়া পাহাড়ের গায়ে তার কম্পমান গোলাপী আভার

প্রতিফলন পড়েছে, নৌকা থেকে তা স্পষ্টই দেখা যায়। বাতাস আরো জোরে বইতে শুরু করে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ পাহাড়ী বিড়ালের মত সরোষে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ভেঙ্গে পড়া তরঙ্গ-চূড়ার দ্যুতি ও ঝল্‌কানি দেখা যায়।

কাপ্তেন সেই জলপাত্রটির ধার থেকে সরে সোজা হয়ে উঠে নৌকার সামনে বসলেন। সংযোজককে বললেন—"বেজায় লম্বা রাতটা।" তারপর উপকূলের দিকে তাকিয়ে বলেন—"জীবন-রক্ষী লোকগুলো খুবই ধীরে সুস্থে কাজ করছে দেখছি।"

"আশে-পাশে একটা হাঙ্গর ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেখ্‌তে পেয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ দেখেছি! প্রকাণ্ড বড়ো হাঙ্গর।"

"আপনি জেগে আছেন, জানতে পারলে ভালো হ'ত।"

পরে সংযোজক নৌকার তলদেশ লক্ষ্য করে ডাকে—"বিলি।"—ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সেই মানবিক পুঁটুলিটা আল্‌গা হয়ে যায়।—"বিলি, এইবার তুমি আমাকে একটু জিরেন দেবে কি?"

তেল-খালাসী বলে—"নিশ্চয়!"

সংযোজক নৌকার তলদেশের সেই ঠাণ্ডা, আরামদায়ক সমুদ্রজলরাশি স্পর্শ করতেই রাঁধুনির লাইফ-বেল্টের পাশে ঘেঁষে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল, আর তখনই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল—তার দাঁতের ঠক্‌ঠকানিতে তখনও সবরকম জনপ্রিয় গানের গৎ বেজে চলেছে। সে এমন অঘোরে ঘুমিয়েছিল যে তার মনে হল যেন এক মুহূর্ত কাটতে না কাটতেই চরম শ্রান্তিতে অবসন্ন একটা কণ্ঠস্বর তাকে ডেকে বলছে—"এইবার তুমি কি আমাকে একটু জিরেন দেবে?"

"নিশ্চয় দেব, বিলি!"

উত্তর দিকের আলো অন্তর্হিত হয়ে গেছে—কেন তা কেউ জানে না। সংযোজক এখন সজাগ কাপ্তেনের কাছ থেকে পথের নির্দেশ নেয়। রাত যখন বেশী হল তখন ওরা নৌকাখানাকে সমুদ্রের আরও বাইরের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কাপ্তেন তেল-খালাসীকে বল্‌লেন একখানা দাঁড় নিয়ে হালে গিয়ে বসতে এবং যেদিক থেকে ঢেউ আসছে সেইদিকে নৌকার মুখ ফিরিয়ে রাখতে। ভাঙা ঢেউ-এর গর্জন শুনতে পেলে সে চীৎকার করে আর সবাইকে সতর্ক করে দেবে। এই পরিকল্পনার ফলে তেল-খালাসী আর রিপোর্টার দুজনেই একসঙ্গে একটু বিশ্রাম পায়। কাপ্তেন বলেন—"ঐ দুটি ছেলেকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দাও—তাহলে ওরা আবার তৈরী হয়ে নিতে পারে।" ওরা

দুজনেই নৌকার তলায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে একটু প্রাথমিক কাঁপুনি আর দাঁত-ঠক্‌ঠকানির পর আবার গভীর ঘুমে মগ্ন হয়। ওরা কেউ জানতে পারলো না যে রাঁধুনীকে আর একটি হাঙ্গরের, কিংবা হয়ত সেই হাঙ্গরটিরই সাহচর্য তারা উত্তরাধিকারসূত্রে দান করে গেছে।

নৌকা তরঙ্গরাজির ওপর টলমল করে। মাঝে মাঝে ঢেউ-এর ঝাপটা পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের আবার নতুন করে ভিজিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের সেই গভীর বিশ্রাম-নিদ্রা ভঙ্গ করার সামর্থ্য তার নেই। বাতাসের ভীতিজনক দাপট এবং জলের ঝাপটা মিশরের মমিদের ওপর যতটুকু প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে ওদের ওপরও তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না। নিতান্ত অনিচ্ছার স্বরে রাঁধুনী বলে ওঠে—"ভাই সব, নৌকাখানা ডাঙ্গার খুব কাছে এসে পড়েছে। তোমরা কেউ এবার উঠে এটাকে আবার সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাও।" সংযোজক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। তীরের ওপর তরঙ্গ-চূড়ার আছড়ে পড়ার আওয়াজ তার কানে যায়।

দাঁড় টানার সময় কাপ্তেন তাকে একটু হুইস্কি জল মিশিয়ে পান করতে দিলেন। এর ফলে তার শরীরের কন্‌কনানির ভাবটুকু কেটে যায়। ... বলে—"আমি যদি কখনো ডাঙ্গায় পৌছাতে পারি, আর কেউ যদি আমাকে একখানা দাঁড়ের ফটোগ্রাফও দেখায়—"

অবশেষে আবার সেই সংক্ষিপ্ত সংলাপ :

"বিলি! বিলি! আমাকে এইবার একটু জিরেন দেবে ভাই?"

তেল-খালাসী বলে ওঠে—"নিশ্চয়!"

এরপর আবার যখন সংযোজক চোখ মেলে চায় তখন আকাশে ও সমুদ্রে প্রত্যূষের ধূসর রঙ্‌ লেগেছে। আর একটু পরে জলের ওপর রক্তিম ও সোনালী রঙের আলপনা আঁকা হয়। অবশেষে প্রভাত এসে দেখা দেয়, অপূর্ব মহিমাময় তার আবির্ভাব। আকাশে নির্মল নীল রঙ, আর তরঙ্গ-চূড়ায় প্রতিফলিত সূর্যালোকের আগুনের ফুলকি।

সুদূর বালিয়াড়িগুলির ওপরে অনেকগুলি ছোট ছোট কালো রঙের কুটির, তাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে একটা লম্বা উইণ্ড-মিল। সমুদ্রতীরে কোথাও একটা মানুষ, বা কুকুর বা বাইসিকেলের চিহ্নমাত্র নেই। কুটিরগুলিকে দেখে মনে হয় যেন একটা পরিত্যক্ত জনহীন গ্রাম।

নৌকারোহীরা তন্ন তন্ন করে তীরভূমি পর্যাবেক্ষণ করে। নৌকার ওপর এক আলোচনা সভা বসে। কাপ্তেন বলেন—"আচ্ছা, যদি কোনও রকম সাহায্য না আসে, আমরা বরং ভাঙা ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি না কেন! আমরা যদি আরো বেশীক্ষণ এইখানে এইভাবে থাকি, তাহলে আমরা এমনই দুর্বল হয়ে পড়ব যে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আর কিছুই করার সামর্থ্য থাকবে না।"

আর সকলে নীরবে এই যুক্তি মেনে নেয়। নৌকার মুখ এইবার তীরের দিকে ফেরানো হয়। সংযোজক ভাবে কেউ কি ঐ উইণ্ড্-মিলের চূড়ার ওপর ওঠে না, উঠ্লেও কি সমুদ্রের দিকে তাকায় না? চূড়াটা বিরাট একটা দৈত্যের মত, যেন পিপীলিকাদের দুর্দশার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সংযোজকের মনে হয় চূড়াটা যেন ব্যক্তিমানবের সংগ্রামের ভিতর প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্তির প্রতীক, যে-প্রকৃতি ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে এবং মানুষের কল্পনা-নেত্রে অচঞ্চল ও প্রশান্ত। সে সময়ে প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর বলে তার মনে হয়নি, মঙ্গলময়ী বলে মনে হয়নি, জ্ঞানস্বরূপিণী বলে মনে হয়নি। কিন্তু প্রকৃতি উদাসীন, অতি সুস্পষ্টভাবে উদাসীন। এও হয়ত সম্ভব, যে এই রকম অবস্থায় মানুষ বিশ্বজগতের এই পরম ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে নিজের জীবনের অসংখ্য দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, মনে মনে সেগুলির কটুস্বাদের তিক্ততা অনুভব করে,—তারপর আর একটা সুযোগ চাইবে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন ভালমন্দের পার্থক্য তার কাছে অসম্ভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বিশ্বাস করে, আর একবার যদি ওকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে তার আচরণ ও ভঙ্গীর ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করবে,—অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তে, কিংবা চায়ের আসরে সে আরও ভাল লোক, আরও বুদ্ধিমান লোক হয়ে উঠতে পারবে।

কাপ্তেন বলে ওঠেন—"সবাই শোন, নৌকা এবার নিশ্চয়ই ডুববে। আমরা শুধু ডাঙ্গার যত কাছে সম্ভব ওকে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। তারপর, নৌকাডুবির পর, আমরা ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে তীরের দিকে কোন রকমে এগিয়ে যাবো। মাথা স্থির রাখো, আর নৌকা নিশ্চিতভাবে না ডুবে যাওয়া পর্যন্ত জলে ঝাঁপ দিও না।

তেল-খালাসী দাঁড় ধরে! ঘাড় ফিরিয়ে সে ভাঙ্গা ঢেউগুলো একবার দেখে

নেয়, তারপর বলে—"কাপ্তেন! আমার মনে হয় বরং নৌকাটাকে ঘুরিয়ে নিই, ওর মুখটা সমুদ্রের দিকে ফিরিয়ে রাখি, তারপর পিছু হঠে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি।"

কাপ্তেন জবাব দেন—"বেশ, তাই করো বিলি, নৌকাখানাকে পিছিয়েই নিয়ে চল।" তখন তেল-খালাসী আবার নৌকা ঘুরিয়ে নেয়, আর নৌকার পিছনে বসে রাঁধুনী আর সংযোজক ঘাড় ফিরিয়ে সেই জনমানবহীন উদাসীন উপকূলটিকে দেখতে বাধ্য হয়। তীরাভিমুখী অতিকায় ঢেউগুলি নৌকা-খানাকে ওপরে ঠেলে তুলে দেয়, ফলে ওরা দেখতে পায় ঢালু বেলাভূমির ওপর বিস্তৃত আস্তরণ শোঁ-শোঁ করে ওপর দিকে ছুটে চলেছে। কাপ্তেন বলেন—"আমরা খুব বেশী কাছে এগোব না।" যখনই কেউ এই তরঙ্গশ্রেণী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে, তখনই তাকে উপকূলের দিকে তাকাতে হচ্ছে,—আর এই তীর-তরঙ্গ দেখার সময় তার চোখের দৃষ্টিতে একটা বিচিত্র ভাব ফুটে উঠছে। অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে সংযোজক বুঝতে পারে যে ওরা কেউ ভয় পায়নি, কিন্তু ওদের দৃষ্টির পুর্ণ অর্থ তার বুদ্ধির অগোচর।

আর সে নিজে, এত বেশী ক্লান্ত যে এই তথ্যের মূল সত্যটাকে সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না। নিজের মনকে সে জবরদস্তি করে এই বিষয়ে চিন্তা করাতে চেষ্টা করে, কিন্তু এখন মনের ওপর পেশীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর পেশীরা বলছে—তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তার এইটুকু মনে হয় যে যদি সে ডুবে যায়, তাহলে তা বড়ই লজ্জার বিষয় হবে।

কোনোরকম দ্রুত বাক্য বিনিময় হয় না, মুখগুলো পাংশু হয়ে যায়, সাধারণ চিত্তচাঞ্চল্যও নেই। ওরা শুধু উপকূলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাপ্তেন বলেন—"ঝাঁপ দেওয়ার সময় নৌকা থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়তে হবে—মনে থাকে যেন!"

সমুদ্রের দিক থেকে একটা ঢেউ-এর চূড়া সহসা বজ্রনির্ঘোষে ভেঙ্গে পড়ল। সুদীর্ঘ আকুঞ্চিত জলরাশি নৌকার দিকে সগর্জনে ছুটে আসে।

কাপ্তেন হাঁক ছাড়লেন—"হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!" সব মানুষগুলি নীরব। উপকূলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ওরা ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে। ঢেউ-এর ঢালু বেয়ে নৌকা ওপরে ওঠে, তারপর লাফ দিয়ে একেবারে তার ভয়ংকর চূড়ায় উঠে যায়, কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে চূড়া পার হয়,

তারপর ঢেউ-এর সুদীর্ঘ পৃষ্ঠদেশ বেয়ে নাচে নেমে আসে। কিছু জল নৌকার ভেতরে ঢুকেছিল, রাঁধুনী তা ছেঁচে ফেলে দেয়।

কিন্তু পরবর্তী চুড়াটাও ঠিক এমনি করেই ভেঙ্গে পড়ে। আবর্তিত, ফেনায়িত শাদা জলের প্লাবন নৌকাখানাকে গ্রাস করে ফেলে, তাকে প্রায় খাড়া দাঁড় করিয়ে দেয়। চারিদিক থেকে হুড়হুড় করে জল এসে ঢোকে। এই সময়ে সংযোজক নৌকার ধারে হাত রেখে বসেছিল। যখন সেই জায়গা দিয়ে জল এসে নৌকায় প্রবেশ করে, তখন সে তাড়াতাড়ি আঙুলগুলি সেখান থেকে সরিয়ে নেয়, যেন সেগুলি ভিজে যাওয়াতে ওর আপত্তি আছে।

ছোট্ট নৌকা জলের প্রচণ্ড ভারে মাতালের মত টলতে থাকে, সমুদ্রের জলে চেপে গভীর হয়ে বসে যায়।

কাপ্তেন বলে ওঠেন—"রাঁধুনী ভাই, জল ছেঁচে ফেল! নৌকার জল ছেঁচে ফেল।" রাঁধুনী বলে—"ঠিক আছে, কাপ্তেন! তাই করছি।"

তেল-খালাসী বলে—"ভাই সব! এর পরের ধাক্কাতেই নিশ্চয় দফা রফা হবে। লাফিয়ে পড়ার সময় নৌকা কাটিয়ে পড়বে—মনে রেখ।"

তৃতীয় তরঙ্গটি এগিয়ে এল—বিরাট, ভয়ংকর, দুর্দমনীয়। ডিঙিটাকে যেন গ্রাস করে ফেলল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নৌকার তলদেশে লাইফ-বেল্টের একটা টুকরা পড়ে ছিল, সংযোজক বুকের কাছে সেটিকে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

জানুয়ারী মাসের জল বরফের মত ঠাণ্ডা। তৎক্ষণাৎ তার মনে এই চিন্তার উদয় হল যে ফ্লোরিডার উপকূলের অদূরে সে যে রকম ঠাণ্ডা জল প্রত্যাশা করেছিল এ জল তার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। সেই সময়ে তার বিভ্রান্ত মনের কাছে এই তথ্যটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় বলে মনে হয়েছিল। জলের এই শীতলতা বড় ক্লান্তিকর, বড়ই শোচনীয় ব্যাপার। নিজের অবস্থা সম্পর্কে তার মতামতের সঙ্গে এই তথ্যটুকু কেমন করে যেন মিলে-মিশে গিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—তার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে অশ্রুপাত করা তার পক্ষে বিশেষ অযৌক্তিক হবে না। জলটা বড়ই ঠাণ্ডা।

যখন সে জলের ওপর ভেসে উঠল তখন জলের কোলাহল ছাড়া আর কোন কিছু সম্বন্ধেই সে তেমন সচেতন ছিল না। একটু পরে ও অন্যান্য সহচরদের সমুদ্রের বুকে দেখতে পেল। তেল-খালাসী সাঁতারের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে

এগিয়ে আছে। সে অতি দ্রুত এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সাঁতরাচ্ছে। সংযোজকের বাঁ দিকে একটু দূরে—রাঁধুনীর শাদা সোলার লাইফ-বেল্ট্ বাঁধা বিরাট পিঠখানা জলের ওপর ঠেলে বেরিয়ে আছে, আর পিছন দিকে কাপ্তেন তাঁর একখানি মাত্র সুস্থ হাত দিয়ে ওলটানো ডিঙির তলার কাষ্ঠখণ্ডটি ধরে ঝুলছেন।

সমুদ্র-তীরের একটা অস্থাবর চরিত্র আছে। সমুদ্রের উত্তপ্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যেও সংযোজক সেই কথা ভেবে বিস্ময় বোধ করে।

সমুদ্র-তীরকে পরম রমণীয় বলেও মনে হয়, কিন্তু সংযোজক জানে, এখনও অনেক দূর যেতে হবে--তাই সে ধীরে সুস্থে সাঁতার দিতে থাকে। জীবনরক্ষা যন্ত্রের সেই টুক্‌রোটি ওরা বুকের নীচে রয়েছে। মাঝে মাঝে ও ঢেউ-এর ঢালু গা বেয়ে হু-হু করে নেমে আসছে—ঠিক যেন একটা হাতে-ঠেলা স্লেজগাড়ীতে চড়ে নামছে।

অবশেষে, সে সমুদ্রের এমন এক অংশে এসে পড়ল যেখানে সাঁতার অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কি ধরনের স্রোতের টান তাকে আঁকড়ে ধরেছে তা দেখার জন্য সে একটুও সাঁতার থামায় নি,—কিন্তু এইখানেই তার অগ্রগতি ব্যাহিত হল। তীরভূমি তার সামনে সাজানো রয়েছে রঙ্গমঞ্চের ওপরকার ছোট্ট একটি দৃশ্যের মত তাই ও চেয়ে চেয়ে দেখছে এবং তার প্রতিটি খুঁটিনাটি দুচোখ ভরে গোগ্রাসে গিলছে।

অনেকটা দূরে বাঁ দিক দিয়ে রাঁধুনী তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। কাপ্তেন তখন তাকে হাঁক দিয়ে বললেন—"রাধুনী মশাই, চিৎ হয়ে ভাসো, আর হাতের দাঁড়টা ব্যবহার করো!"

রাঁধুনী চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে বলে—"ঠিক আছে, হুজুর! তাই করছি।" তারপর দাঁড় টানতে এগিয়ে চলে, যেন সে নিজেই একখানা ডোঙা-নৌকা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাখানাও সংযোজকের বাম দিক দিয়ে এগিয়ে যায়। কাপ্তেন এক হাত দিয়ে নৌকার তলকাষ্ঠ ধরে আছেন। নৌকাখানা যদি নানা রকম আশ্চর্য প্যাঁচ না দেখাত, তাহলে মনে হত তিনি যেন একটা বেড়ার ওধার থেকে উঁচু হয়ে উঁকি দিয়ে কি দেখছেন। কাপ্তেন যে কি করে এখনও ওটা ধরে থাকতে পেরেছেন তা ভেবে সংযোজকের পরম বিস্ময় অনুভব করে

ক্রমে ওরা তটভূমির নিকটেই এগিয়ে চলেছে—তেল-খালাস, রাঁধুনী ও কাপ্তেন, তাদের পিছনে অনুসরণ করে চলেছে সেই জলপাত্রটি, সমুদ্রের ওপর বেশ ফুর্তির সঙ্গে হেলে-দুলে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

সংযোজকের মনে হয় সে যেন নতুন এক শত্রুর হাতে আটক পড়ে গেছে—তার নাম স্রোতের টান। সামনেই তটভূমি—তার ক্রমনিম্ন বালুবিস্তার, তার সবুজ খাড়া পাড়ের ওপর ছোট ছোট নিরালা কুটিরের সারি নিয়ে একটা ছবির মত চোখের সামনে প্রসারিত। অতি নিকটেই এই দৃশ্য, কিন্তু চিত্রশালায় ব্রিটানি বা আলজিয়ার্সের দৃশ্য দেখে মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই দৃশ্য ওর মনে সেই ভাবেরই সঞ্চার করেছে।

সে ভাবে—"আমি কি সত্যই ডুবে মরতে বসেছি? সেও কি সম্ভব? তা কি কখনও হতে পারে?" হয়ত সব মানুষই তার নিজের মৃত্যুকেই প্রকৃতির চরমতম পরিণতি বলে না ভেবে কিছুতেই পারে না।

শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা ঢেউ ওর ওপর আছড়ে পড়ে একটা পাক দিয়ে ওকে এই ক্ষুদ্র অথচ সাংঘাতিক স্রোতের টান থেকে মুক্ত করে; কারণ, সহসা ও দেখতে পায়, তীরের দিকে আবার অগ্রসর হতে পারছে। আরো পরে সে বুঝতে পারে যে কাপ্তেন এক হাতে ডিঙির তলকাষ্ঠ ধরে, তীরভূমির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে চেয়ে ওর নাম ধরে ডেকে বলছেন—"ডিঙির কাছে চলে এস,—ডিঙির কাছে এসো!"

কাপ্তেন এবং ডিঙির কাছে পৌছানোর জন্য সংগ্রামরত অবস্থায় সে ভাবতে থাকে যে মানুষ যখন অপরিসীম শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন নিশ্চয়ই ডুবে মরাটাকে তার কাছেই খুবই আরামপ্রদ ব্যবস্থা বলে মনে হয়। যেন যুদ্ধের বিরতি, আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে স্বস্তিলাভ। এই কথা ভেবে ও বেশ খুশী হয়ে ওঠে, কারণ কিছুক্ষণ ধরে স্বল্পকালস্থায়ী মৃত্যু-যন্ত্রণার বিভীষিকাটাই ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

একটু পরেই ও দেখতে পায় একজন মানুষ তীরের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। অতি দ্রুতগতিতে সে জামা-কাপড় খুলছে। কোট, ট্রাউজার, সার্ট, সবকিছুই ম্যাজিকের মত দ্রুতগতিতে তার গা থেকে খসে পড়ে।

কাপ্তেন বলেন—"ডিঙির কাছে চলে এসো।"

সাঁতরাতে সাঁতরাতে সংযোজক বলে—"তাই যাই, কাপ্তেন।" এমন সময় সে লক্ষ্য করে কাপ্তেন ডিঙি ছেড়ে দিয়ে জলের নীচের মাটিতে পা দিয়ে

দাঁড়ালেন। তারপর সংযোজক তার এই সমুদ্রযাত্রার একমাত্র বিস্ময়কর কর্মের অনুষ্ঠান করল। একটা বিরাট ঢেউ তাকে ধরে অতিশয় সহজ ভঙ্গীতে এবং তীরবেগে একেবারে ডিঙিটা পার করে বহুদূরে ছুড়ে ফেলে দিল। তখনই তার মনে হয় এ একটা জিমন্যাস্টিকের খেলা, সমুদ্রে সংঘটিত একটা সত্যকার অলৌকিক ব্যাপার। ভাঙ্গা ঢেউ-এর মধ্যে ভাসমান একখানা ওলটানো ডিঙি-নৌকা একজন সাঁতারু মানুষের পক্ষে এমনই একটা খেলার জিনিস মনে হয়।

সংযোজক যেখানে এসে পড়ে সেখানে মাত্র এক কোমর জল কিন্তু এক মুহূর্তের বেশী সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। প্রতিটি ঢেউ-এর ধাক্কায় ও হুড়মুড় করে পড়ে যায়, ওদিকে চোরাঢেউ নীচে থেকে টান দিতে থাকে।

তারপর ও দেখতে পায়, যে লোকটি দৌড়তে দৌড়তে জামা-কাপড় খুলছিল এবং জামা-কাপড় খুলতে খুলতে দৌড়াচ্ছিল সে এখন লাফিয়ে জলের ভেতর এসে পড়েছে। সে রাঁধুনীকে টেনে ডাঙায় তোলে, তারপর জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে কাপ্তেনের দিকে যায়, কিন্তু কাপ্তেন তাকে হাতে নেড়ে সরিয়ে দেন—সংযোজকের কাছে যেতে ইঙ্গিত করেন। লোকটি নগ্ন—শীতকালের পাতাঝরা গাছের মত সম্পূর্ণ নগ্ন, কিন্তু তার মাথার চারিদিকে একটা জ্যোতির্মণ্ডল,—তার গা দিয়ে মহাপুরুষদের মত দিব্যদ্যুতি বেরুচ্ছে। লোকটি প্রথমে খুব জোরে একটা টান দেয়, তারপর অনেকটা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়, তারপর সংযোজকের হাত ধরে প্রচণ্ড একটা হেঁচ্‌কা দেয়। সংযোজক ছোটখাটো ভব্যতায় সুশিক্ষিত। সে বলে ওঠে—"ধন্যবাদ!" কিন্তু সহসা মানুষটি চেঁচিয়ে ওঠে—"ওটা কি?" তাড়াতাড়ি আঙুল দেখায়। সংযোজক বলে—"শিগ্‌গির যান ওখানে।"

অগভীর জলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আছে তেল-খালাসী। তার কপালে বালি ছুঁয়ে আছে—প্রতিটি ঢেউ এসে চলে যাবার পর সেই বালির ওপর থেকে জল সম্পূর্ণ সরে যাচ্ছে।

এরপর আর কি কি ঘটেছিল সংযোজক তা জানতে পারে নি। নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছে সে আছাড় খেয়ে যায়, দেহের প্রতিটি অঙ্গে বালুবেলার আঘাত লাগে। যেন সে কোন উঁচু ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কিন্তু এই পতনধ্বনিও ওর কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হয়।

অবিলম্বে যেন তীরভূমি জনাকীর্ণ হয়ে উঠল—পুরুষদের হাতে কম্বল,

কাপড়-চোপড় এবং ফ্লাস্ক, স্ত্রীলোকের হাতে কফির পাত্র এবং আরও অনেক বস্তু যা তারা সর্বরোগহর অব্যর্থ অষুধ বলে মনে করে। সমুদ্র থেকে আসা মানুষদের প্রতি তটভূমির মানুষের এই স্বাগত সম্ভাষণ যেমন আন্তরিক তেমনি অকৃপণ।

কিন্তু দেখা গেল একটা নিশ্চল মূর্তিকে ধীরে ধীরে তটভূমির ওধারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তা থেকে ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে। তার জন্য তটভূমির অভ্যর্থনা ভিন্ন ধরনের না হয়ে উপায় নেই—সে অভ্যর্থনা হল কবরের অশুভ আতিথ্য।

তারপর যখন রাত্রি নেমে আসে, শাদা ঢেউ চাঁদের আলোয় এদিক-ওদিকে সঞ্চরণ করে বেড়ায়, আর হাওয়ার শব্দে তটভূমির মানুষের কাছে বিরাট সাগরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, তখন ওদের মনে হয় এখন হয়ত এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ওরা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে।

। এই কাহিনীর ভিত্তিতে আছে 'কমডোর' নামক এক জলে ডোবা
নৌকার চারজন নাবিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ॥





নরম্যান মেইলর

নগ্ন ও মৃত

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংসের একটা নিজস্ব থিয়োরী ছিল। তাঁর সংশয়াকুল তরুণ বয়সী একান্ত-সচিবকে তিনি বার বার বলতেন—

"যাকেই আমার কাছে দাও তাকে আমি ঠিক ভয় পাইয়ে দেব। আমাদের আমেরিকান সৈনিক যে কোন শত্রু সৈন্যের চেয়ে বিক্রমে দুর্ধর্ষ হবে। আর সেই দুর্ধর্ষ চরিত্র গড়ে তোলার জন্য আমার নিজস্ব কৌশল হল শত্রুর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সে আমাকে ভয় করবে।"

তরুণ লেফটেনান্ট হার্ন প্রতিবাদে বলতেন—"এমনও ত' হতে পারে এই সৈনিকদের মধ্যে কেউ তার মেসিনগানটা আর্তনাদের দিকেই ঘোরাতে পারে।"

"না। ঘৃণাই যাদের সম্পদ, তারাই বেশ পাকা ঘাতক হতে পারে।"

থিয়োরীই হোক বা আর কিছু হোক জেনারেলের সেনাবাহিনী এই জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপটিতে এসে গুলি ছুঁড়তে লাগল। নৌবাহিনী অতি প্রত্যুষে এই দ্বীপে ওদের নামিয়ে দিয়ে গেছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে গুলী ছোঁড়া। সর্জেণ্ট সাম ক্রফট-এর প্লেটুনের কাছে এই সমুদ্রোপকূল নিরতিশয় শান্ত মনে হয়েছে—তথাপি সংঘর্ষ রয়েছে প্রচুর। জাপানী মর্টার বেশ ব্যাকুল করে

তুলেছে, ক্রফট সেই তিন সৈনিকবিশিষ্ট আক্রমণকারীদের স্বয়ং গোলা দ্বারা স্তব্ধ করলেন।

জাপানীদের মৃতের মত দেখাচ্ছিল বটে, তথাপি ক্রফট তাঁর দলের একজনকে নির্দেশ দিলেন সেই অবলুণ্ঠিত দেহে টমিগান বর্ষণ করতে। একজন জাপানী সেনা মৃতের মত ভান করে পড়েছিল, ক্রফট তাকে ফিতার মতো টুকরো করে কাটলেন। তার সামরিক পোষাকের ভেতর পাওয়া গেল চামড়ার ম্যাপ-কেস—ভিতরস্থ কাগজপত্র বেশ দরকারী মনে হল। ক্রফট লেফটেনান্ট হার্নের হাতে সেটি সমর্পণ করলেন।

অবতরণের সঙ্গেই অপারেশন শিবিরে একটা ষ্টাফ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেনারেল এই ম্যাপ-কেসটি পেয়ে ভারী খুশী।

কামিংস বললেন—"এই সব কাগজপত্র থেকে মনে হচ্ছে আমরা জেনারেল তোয়াকুর বিরুদ্ধে লড়ছি।" নামটি বেশ জমকালো, জেনারল কামিংস্ আরো রঙ চড়িয়ে বললেন—"তোয়াকু জাপানীদের একজন বিশিষ্ট সেনানায়ক। ওকে পালাতে দেওয়া হবে না। যতক্ষণ আমরা গুরুতর আক্রমণ শুরু না করছি ততক্ষণ আমাদের হিসাব-মাফিক লড়লেই চলবে।" তারপর বাহিনীর মেজকর্তাকে হুকুম দিলেন—'কর্ণেল ডালেসন, আপন কাজ চালিয়ে যান।"

সবুজ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত দ্বীপটি প্রতীক্ষমাণ ভঙ্গীতে পড়ে রইল।

প্লেটুন নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছিলেন সার্জেণ্ট ক্রফট, তিনিও একজন 'থিয়োরী'ওলা মানুষ। তিনি তাঁর অধীনস্থদের প্রতি সর্বদাই হুমকী দিচ্ছেন, কখনও রেডকে ধমকাচ্ছেন, কিংবা ক্ষুদে গোল্ডস্টাইনকে, কখনও বা বকছেন বিশালবক্ষ উইলসনকে।

তাঁর থিয়োরী হল—'আর্মির কোনও ত্রুটি নেই, ত্রুটি দলের মানুষদের। তোমরা সব কাঁদুনে খোকার দল, তাই আমি এই প্লেটুনের অধিনায়ক আর তোমারা সামান্য প্রাইভেট মাত্র। আমি হুকুম চালাই কারণ আমি হুকুম পালন করতে জানি।"

ওরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকুক। রিজেস তার ধর্মের কচকচানি বা প্রার্থনায় মুখ গুঁজুক। বোষ্টনে তার বউ সন্তান প্রসব করছে এই চিন্তায় গালাঘর খুঁত খুঁত করুক, ব্রাউন তার বউ সম্পর্কে চিন্তা করুক। সার্জেণ্ট ক্রফটের এই হল কথামৃত। সবাইকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দাও।

একদা স্বয়ং ক্রফট জনৈক স্ত্রীলোক সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এখনও মাঝে মাঝে যখন আকাশে বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায় তার ভেতর ক্রফট তাঁর সেই টিনের চালায় ফিরে যান। মন যেন এক সোনার মুহূর্তে চলে যায়। এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রজনীতে মিলড্রেড ও তিনি সেই নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার দেহের সঙ্গে মিশে গেছে মিলড্রেডের উত্তপ্ত দেহ, আর সেই উদ্দাম রজনীর শুকনো সন্ধানী জিভ কি যেন খুঁজছে। সেই অন্ধকার রজনীতে মিলড্রেড যেভাবে খিল খিল করে হেসেছিল তা যেন এখনও তাঁর কানে বাজছে।

তার পরদিনই মিলড্রেডকে বিয়ে করেছিলেন ক্রফট।

তারপর আর এক কাহিনী। তাকে বিস্মিত করার জন্য একদিন ছুটি পেয়ে হঠাৎ ঘরে ফিরে শুধু মিলড্রেড নয় সেই সঙ্গে আর একজন সৈনিককেও তিনি বিস্মিত করেছিলেন। অন্ধকারে বিলীন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার পিছনে ছুটেছেন ক্রফট। তারপর, যে ছপ্পড়ে একদিন দু দণ্ডের শান্তি পাওয়া গিয়েছিলো, সেই আশ্রয়ে ফিরে দু হাত দিয়ে জানলা, দরজা, আসবাবপত্র সব কিছু চুরমার করেছেন, আর উন্মত্ত পশুর মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেছেন—ওদিকে মিলড্রেড সমানে হেসেছে।

এরপর সেনাবাহিনী ছাড়া ক্রফটের জীবনে আর কোন কিছুরই মূল্য নেই। তবু আজো যখন ঝড়ের উদ্দাম কল্লোল কানে আসে, তখন মিলড্রেডের সেই তীক্ষ্ণ কলহাস্য মনে পড়ে…

জাপানীরা এই দ্বীপে যখন প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, সে আক্রমণ অতি সামান্য এবং অতি বিলম্বিত। ক্রফটের পেট্রল বাহিনীকে নদীর ধারে সীমান্ত রক্ষায় পাঠান হল, সেখান থেকে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।

সমস্ত অঞ্চলটায় নদীর ধার ঘেঁসে তীক্ষ্ণ পর্বতচূড়া, তোয়াকুর বাহিনীর পালাবার সুযোগ অতি সামান্য। কয়েকটা জায়গায় অবশ্য এই ধরণের গিরিচূড়া ধোঁকাবাজির মত, এই রকম একটা জায়গায় দলের অধিনায়ক কাপ্তেন হুকুম দিয়েছেন ক্রফটের দলকে শত্রু সামলাতে।

যাত্রাকালে কাপ্তেন বলে দিয়েছেন, "যদি ওরা ওখানে তোমাদের বাধা দেয় তাহলে রোখবার বিশেষ কিছু নেই, আশা করি আসল হামলা শুরু হবে প্রত্যুষে।"

এই আদেশ ক্রফট প্লেটুনের কাছে পুনঃ প্রচারণ করলেন, "আমরা ও

পণ্টা করে সিফট দিয়ে কাজ চালাব, যদি হাঙ্গামা বাধে তাহলে যারা ঘুমাবে তারা চোখ খোলার আগেই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে।"

নিজেই তিনি প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, চাঁদের আলো নদীর জলে পড়ে কাঁপছে, মনে হচ্ছে যেন একটা সাপ নড়ছে। জঙ্গলের শেষ প্রান্তে যেন একটা কালো প্রাচীর দাঁড়িয়ে। পাশে একটা বারুদভরা অগ্নিগর্ভ অস্ত্র, গুঁড়ি মেরে বসে আছেন ক্রফট, তৃণগুল্মের মর্মরধ্বনি শুনছেন।

সহসা একটা চাপা গুঞ্জন কানে এল, তাড়াতাড়ি মেশিনগানটা তুলে নিলেন ক্রফট। জলের ধারে একটা গাছে আন্দাজ করে সেই কামান বর্ষণ করলেন। তারপর শোনা গেল কণ্ঠস্বর।

সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন ক্রফট—'এভরিবডি! লাইনে দাঁড়াও।' নদীর ধারের একটা গাছের পাশ থেকে মেশিনগান ধ্বনিত হল, আগুন দেখতে পেয়েই গর্তের ভিতর বসে পড়লেন ক্রফট। নিজের হাতের বন্দুকটা পড়ে গিয়ে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল সারা জঙ্গলে।

সচকিত ও শঙ্কিত মানুষগুলি এতক্ষণে রাইফেল পোস্টে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্রফট হুকুম দিয়ে জর্জরিত গালাঘরকে সেই সারে পাঠিয়ে দিলেন। মর্টার বিস্ফোরিত হচ্ছে, আর ক্রফট চীৎকার করে উঠলেন—'ঐ যে ওরা আসছে। ওদের থামাও।'

তার কণ্ঠস্বর সেই নদীর জলে অনুরণিত হল, অগ্রগামী জাপানীরা বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল। ক্রফট গুলী ছুঁড়লেন ডাইনে বাঁয়ে, যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। অস্ত্রের সেই উদ্দাম উতরোলে যেন মিলড্রেডের হাসির রেশ ভেসে আসে। শত্রুদল ক্রমে জীর্ণ হয়ে হটতে থাকে।

গোল্ডস্টাইন, রেড, রীজেস—সবাই এখন সক্রিয়। "ওদের জাহান্নামে পাঠাও।" খুদে মিনেত্তা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—"গেছি! আমার লেগেছে। কি একটা যেন লাগল।" দেখা গেল সেটা কিছুই নয়, ওর নিজের জিনিসপত্রের একটা অংশ মাত্র। জাপানী হানাদারের শেষ প্রাণীটিও জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

ক্রফট সোজাসুজি হুকুম দিলেন—"ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমরা খাদের তলায় থাকব। আর আমার হুকুম কেউ ঘুমাতে পারবে না।"

এই কথা বলে নিজের মেশিনগানটা যেখানে স্থাপনা করা হয়েছে সেইখানে চুপচাপ বসে পড়লেন, যা কিছু আসুক, তার জন্য প্রস্তুত। নদীর রুপালী জলে একটা মৃত জাপানী সৈনিকের দেহ ভেসে গেল, যেন একটা ছিন্ন পুতুল।

কম্যুনিকেশন শিবিরের সন্নিহিত শৈলশিখরে সূর্যের সোনালী কিরণ স্পর্শ করেছে, সামনে একদল সেনাবাহিনী অপেক্ষমান।

জেনারেল হাসলেন, চাপা হাসি—'তোয়াক ভুল করেছে। ওর হানাদারী দলটাই ও পুরো খরচ করে বসে আছে। আক্রমণের দিক থেকে ওর শেষ হয়েছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা অপারেশন প্লানজার শুরু করব, আর একটা সপ্তাহ, তারপর এই অভিযান শেষ। আমি এখন এই সদর দপ্তর পরিষ্কার করে ফেলতে চাই। সামনেই অফিসারদের চিত্তবিনোদনের জন্য চাই একটা রিক্রিয়েশন টেণ্ট তৈরী করতে। আমার মনে হয় গত রজনীর পর এখন আমাদের সকলেরই সামান্য পুরস্কার প্রাপ্য হয়েছে।'

তবে নির্জনতার মধ্যে সাফল্যের সুখ তেমন উপভোগ করা যায় না। জেনারেল নিজেও একটু নিঃসঙ্গ মানুষ। কয়েকটি সন্ধ্যার পর তিনি তাঁর আর্দালি প্রাইভেট বেলানকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন তরুণ লেফটেনাণ্ট হার্ণকে। এস এক হাত দাবা খেলে যাক সেই সঙ্গে কফি চলবে।

জেনারেল বল্লেন—"রবার্ট, কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ সংখ্যায় কম। আমাদের তেমন মতের মিল হত না বটে তবে তোমার বাবা ছিলেন আমার একজন উত্তম বন্ধু। আমার যুক্তিটা হয়ত তুমি এতদিনে বুঝেছ, কেমন? আমার কথা ঠিক নয়?"

"ঐ ভয় পাইয়ে দেওয়া, মানুষকে ভয়ে ভেঙে ফেলার কথা?"

কামিংস হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"যুদ্ধটা তুমি কি মনে করো? ছেলেখেলা?"

"জেনারেল, আপনি আমার বাবার মত, তাঁর কারখানার লোকজন মানুষ নয়, তারা মেশিন মাত্র। আপনি কি জানেন তাদের মনে কি হয়?"

"উত্তর হল এই যে, আমি এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না, তুমি বিবাহ করোনি, কখনো কি বিবাহ সম্পর্কে কোনও চিন্তা করেছ? স্ত্রী—আমার নিজের স্ত্রীর কথাই ধরা যাক, আমার জীবনে এবং কর্মে প্রচণ্ড সে সাহায্য করেছে।"

"নিশ্চয়ই তা হয়েছে জেনারেল, এ আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমার আর কি ভবিষ্যৎ আছে বলুন?"

"যদি আমার ছেলে থাকত তাহলে তাকে যেমন কথা বলতাম, এও সেইভাবেই বলছি। আমি সন্তান চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী এদিকে আশ্চর্য রমণী হল্লেও, পারলেন না।"

শিবিরে স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। এমনই সেই স্তব্ধতা যা সমস্ত শীতল করে দেয়।

জেনারেল মৃদু গলায় বললেন—"রবার্ট, তোমার ভঙ্গি অমানুষিক। ঠিক এই মুহূর্তেই তুমি আমার কথা ভাবছ, আমার স্ত্রীর কথা নয়।"

"আমার সে ইচ্ছা নেই জেনারেল।" কথাটা কিন্তু দুর্বল প্রচেষ্টার মত শোনালো।

কামিংস সজোরে বল্লেন: "ধরো প্রথমটা আমাদের আলোচনা হোক নীতি নিয়ে, অর্থাৎ প্রিন্সিপলস। হার্ণ। ষ্ট্যাণ্ড আপ! স্যালুট মি!—অলরাইট, এখন উপস্থিত তুমি তোমার কাজটুকু ছাড়া আর সব ভুলে যাও। আমার এই শিবির একেবারে থাকবে ঝকঝকে, তকতকে। তুমি যদি ঐ ক্লিল্যানকে আরো একটু কড়া নজরে নিয়ে দেখতে তাহলে হয়ত বেশী ময়লা থাকতো না। আর নজর রেখো আমার ডেসকে যেন রোজ সকালে তাজা ফুল থাকে।"

'তাজা ফুল! সেও কি আমি নিজেই তুলে আনবো স্যার?'

"আমার মনে হয় ক্লিল্যানটাকে বিশ্বাস করা চলে। অবশ্য নজর রাখতে হবে। সুপারভিসনটাই আসল। ডিসমিসড্!"

জাপানী আক্রমণের পরবর্তীকালীন বিরতি ক্রফটের দলের সকলকেই স্ব স্ব ভঙ্গী অনুসারে স্পর্শ করেছিল। বিরাটবক্ষ উইলসন একটা হুইস্কি চোলাই-এর যন্ত্র বসালো, দেশে থাকার সময় ওরা বাপ-বেটায় নাকি এমনই করত। রিজেস বসে বসে বাইবেল পড়ত। গাল্লাঘর বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটতো আর বোস্টন থেকে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর সংবাদের আশা করত। ক্ষুদে মিনেত্তা পাগল হয়ে যাওয়ার ভান্ করতো, সেনাদল থেকে নাম খারিজের আশায়।

ক্রফট কিন্তু এর ওষুধ জানতেন। তিনি মিনেত্তাকে হাসপাতালের খাট থেকে টেনে তুলে এমনি প্রহার দিলেন যে তার দেহ থেকে মাথাটা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। তারপর বল্লেন—"ও. কে. মিনেত্তা। এইবার প্যাণ্টটা পরে ফেল। যদি এ রকম আর ঢঙ করো তাহলে—আমি······।"

একদিন যাজক গাল্লাঘরকে ডেকে পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন, একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং ভালোই আছে; তবে তার স্ত্রী প্রসবকালে দেহরক্ষা করেছেন। নদীর ধারে ডাক ছেড়ে কাঁদার মত একটা নির্জন জায়গা খুঁজে পেয়েছিল গাল্লাঘর।

প্লেটুন একটা বদলিও পেয়ে গেল। একজন অল্পবয়সী ছোকরা, নাম উইম্যান, এমন কি উইলসনের চোলাই-করা মদ খেতেও শেখেনি, এমন বাচ্চা। যাই হোক, উইম্যানের আবির্ভাবে রেড বেচারী হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল। সে একটা বক্তৃতা দিল।

শ্রোতাদের জগৎকে উদ্দেশ করে সে বলে ওঠে—"এই সেনাদলের গলদ কোথায় জানো? এরা কখনো যুদ্ধে হারেনি! এখন তোমাদের কি মনে হয় আমি এই দুর্গন্ধ নোংরা দ্বীপটা চাই!"

ক্রফট চীৎকার করে ওঠেন—'চুপ কর! সেনাবাহিনীতে তোমার মত দুচারটে অকালকুষ্মাণ্ড ছাড়া আর কোনও ত্রুটি নেই! ম্যার্টিনেজের দিকে তাকিয়ে দেখ, টেক্সাসে ফিরে ও নিছক ম্যাকস্ মাত্র। আর্মিতে ও আমার মত উচ্চপদস্থ। কেন? আমরা আমাদের কাজ করি, কর্তব্যজ্ঞান আছে, তাই।'

ওদিকে অপারেশন টেণ্টে জেনারেল কটুকাটব্য শুরু করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। হার্ন এই গোলমালটার জন্য দায়ী। জেনারেলের পরিচ্ছন্ন ধোয়া মোছা মেজেতে একটা সিগারেট ফেলে আবার পা দিয়ে সেটা মাড়িয়েছে, এমনই তার দুঃসাহস ও স্পর্ধা! এ বিষয়ে কামিংসের প্রতিক্রিয়া ঘটছে অনেক পরে। প্রথমটা তিনি তাঁর অধঃস্তনদের ডেকে নিজের ওপরওলাদের কাছ থেকে হুমকী খাওয়ার ফলে যে উত্তাপ মনে জমেছিল তা উদ্গারিত করেছেন।

তিনি গর্জন করলেন: "আমার একটা সুবৃহৎ সৈন্যসমাবেশের বাসনা মনে ছিল, এই সমুদ্র উপকূলে আমি একটা ব্যাটালিয়ন নামাবার চেষ্টায় ছিলাম।" (এই দিকটা শত্রু-ঘাঁটির শেষ প্রান্তে), আর ইচ্ছা ছিল পিছন থেকে শত্রুকে হঠানোর। এর জন্য নৌবাহিনীর সমর্থন ও সহায়তা প্রয়োজন। তার জন্য সদরে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তবে তার কোনও আশা নেই। বিনা হাতিয়ারে আমাকে লড়াই ফতে করতে হবে।"

এমন ভাবে তিনি কথাকটি বললেন যে মনে হল সারা পৃথিবী এডওয়ার্ড কামিংসের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে।

তিনি আবার হুঙ্কার দিলেন—"যাই হোক, আর একটা পথ এখনও আছে। একটা স্কোয়াড (দল) এই জনমানবহীন অঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে এখানে আসছে, এরা শত্রুর পিছন দিক থেকে হামলা চালাতে পারবে। সব যদি ভালোয় ভালোয় ঘটে যায় তাহলে আমি এখান থেকে ওদের পিছনে একটা দল

পাঠাব, প্রতিরোধ ব্যবস্থা তারা ধ্বংস করবে, তার পর একটা ব্যাটালিয়ন নামিয়ে দেব। জেন্টলমেন, আপনারা বিষয়টি বিবেচনা করুন······"

সেই সিগারেটের নিক্ষিপ্ত টুকরো সংক্রান্ত ঘটনা যা নাকি অবজ্ঞা এবং ঔদ্ধত্যের প্রতীক, তার প্রতিক্রিয়া ঠিক এই মিটিং-এর পর ঘট্‌ল।

জেনারেল তাঁর তাঁবুতে হার্নকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন: "আচ্ছা, রবার্ট, আমরা এই যুদ্ধ লড়ছি কেন, এ প্রশ্ন কি তোমার কখনো মনে জেগেছে?"

"আমি ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে মনে হয় কতকগুলি ব্যক্তির সুবিধার জন্য কিছু প্রাণীকে মরতে হয়, এটা অবশ্য ভালো কথা নয়······"

"এই যুদ্ধ, ঐতিহাসিক অগ্রগতির পন্থা। অনেক দেশের মধ্যে আছে সুপ্ত শক্তি, সুপ্ত সম্পদ। আমাদের জাতকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে শক্তির বিপক্ষে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ভবিষ্যতের একমাত্র নীতি হল শক্তির নীতি,—সেই নীতি, সেই ন্যায়। আর শক্তি ওপর থেকে পড়ে নীচে প্রবাহিত হয়। সামান্য মাত্র প্রতিরোধের ফলে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়। তুমি আমার মেঝেতে ঐ সিগারেটের টুকরোটা ফেলেছিলে?"

হার্ন বল্‌ল—"আমিও ভেবেছিলাম, আপনি এই কথাটাই হয়ত তুলবেন।"

জেনারেল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল্লেন—"তুমি আমার কোনো একটা কর্মের প্রতিবাদ করেছ। এটা একটা শিশুসুলভ চপলতা। আমি এখন যে সিগারেটটা টানছি এটা যদি মাটিতে ফেলে দিই, তুমি কুড়িয়ে দেবে?"

"আমার মনে হয় আমি বল্‌ব আপনি নিপাত যান স্যার।"

"তুমি জানো, যদি তুমি ওটা না তোলো তাহলে তোমাকে পাঁচ বছর জেলে থাকতে হবে? উপযুক্ত বাধ্যতা সঞ্চারিত করার প্রয়োজন সার্থক করতে অপরিমিত শক্তিমত্তার দরকার।" তারপর সিগারেটটি মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে হুকুম করলেন:

"এটা তুলে ফেল রবার্ট!"

দীর্ঘকাল সেই কক্ষে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। হার্ন-এর মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তারপর অবনত হয়ে ধীরে ধীরে সিগারেটের টুকরোটি কুড়িয়ে নিয়ে এ্যাস-ট্রেতে ফেলে দিয়ে গম্ভীর গলায় বল্‌ল:

"জেনারেল. আমি বদ্‌লি হয়ে যেতে চাই।"

কামিংস হাসলেন, বল্‌লেন—"ভয় নেই আমিও তোমাকে আর আমার একান্ত দেহরক্ষী রাখতে চাই না।"

সার্জেণ্ট ক্রফ্‌ট সর্বপ্রথম জেনারেলের বিপর্যস্তকারী বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা শুনলেন যখন তাঁকে ইন্‌টেলিজেন্স তাঁবুতে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হ'ল।

ডেস্কের অপর প্রান্ত থেকে হুকুম হ'ল—"এই অঞ্চল সম্পর্কে চারদিনের ভেতর সমস্ত খবর যোগাড় করা চাই। তোমার টহলদারী বাহিনী আজ রাতে বেরিয়ে পড়বে। একটি নৌকায় নিয়ে গিয়ে তোমাদের ঐ জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে রবার বোটে করে গিয়ে এই পাহাড়ের ওপর একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বসাবে।" তারপর ম্যাপটা ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন: "তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে ০৬'০০ ঘণ্টায় একটা প্লেন উড়ে যাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে, তার সঙ্গে বেতার মারফত যোগাযোগ করবে। চতুর্থ দিনে ২৩'০০ ঘণ্টার সময় নদীর ধারে তোমাদের তুলে নেওয়ার জন্য নৌকা হাজির থাকবে।"

নির্দিষ্ট উপকুলে ক্রফ্‌ট তাঁর দলবলকে সন্ধ্যায় যথারীতি নির্দেশ দিলেন। একটি আক্রমণকারী গাড়ি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, মোটরটা ঝক্ ঝক্ করে শব্দ করছে, এখনই নিয়ে যাবে। গীয়ার চেক্ করে ক্রফ্‌ট ঘড়ির দিকে তাকালেন—"বোঝাই শুরু করো। রাইফেল উঁচু রাখো।"

একে একে সার বেঁধে লোকগুলি জলা-জমি পার হয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। মার্টিনেজ ছিল সর্বশেষে। ক্রফ্‌ট তাদের অনুসরণ করার উপক্রম করছেন, এমন সময় একটা জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। কমব্যাটের পরিপূর্ণ পোষাক পরে তরুণ লেফটেনাণ্ট হার্ন লাফিয়ে নামলেন, তার পর বিস্মিত ক্রফটকে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন:—'এই টহলদারীর ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে সার্জেণ্ট, শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত।' স্বয়ং জেনারেলই যে এই নির্দেশ দিয়েছেন, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তিনি শুধু বল্‌লেন: "সব তৈরী! চমৎকার!" শেষ দুজন নৌকার গলুই-এর ভেতর বসে পড়ল—নৌকা সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ল। এক মাইল দূরে দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করে আক্রমণকারী নৌকা ডাঙায় ভিড়ল। কিছু দূরে ক্রফ্‌ট চুপ করে বসে ছুরি শানাচ্ছে, তিক্ত নীরবতায় তার মন ভারাক্রান্ত। ট্রেঞ্চের ছুরিটা পকেট থেকে একটা পাথরের টুক্‌রো বার করে শানিয়ে নিচ্ছে আর দেখ্‌ছে হার্ন লোকজনের সঙ্গে কেমন প্রীতিভরে কথা বল্‌ছে, আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। ক্রফ্‌টের চোখ জ্বলছে। কি বিশ্রী কাণ্ড, নব্বুই দিনের এক বিস্ময়কর ঘটনা ওদের ঘাড় থেকে যেন ছুঁড়ে ফেলার প্রচেষ্টা। এতদিন বিনা অফিসারেই ক্রফ্‌ট প্লেটুন চালিয়ে এসেছেন, কাজ ত'

ভালোভাবেই চলেছে, যদি একজন লেফটেনাণ্টের প্রয়োজন ছিল তাহলে সাম ক্রফট কি অপরাধ করেছিল ?

নৌকা অন্ধকারে ওদের নামিয়ে দিয়ে রাত্রির ছায়ায় মিলিয়ে গেল। হার্ন এবং ক্রফ্‌ট সেই অঞ্চলের বৈমানিক মানচিত্র দেখতে লাগলেন। সম্ভাব্য আক্রমণের সূত্র সন্ধান করতে লাগলেন। হার্ন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন :

"আমরা নদীর পথ ধরে মাইল আটেক যেতে পারি, তারপর উন্মুক্ত দেশ পর্যন্ত পৌঁছে আমাদের অভিযান বন্ধ করব। লোকজনদের আমরা কি করছি তার একটা আভাস দিন।" হার্ন এই হুকুম দিলেন।

ক্রফ্‌ট সবাইকে বুলডগের মত ঘেউ ঘেউ করে সম্বোধন করে বল্‌ল : "শোনো ভালো করে, এই নদীর পথ ধরে যতদূর যেতে পার—যতটুকু জানি এ অঞ্চলে জাপানীরা নেই, তবু চোখ-কান খুলে রাখ।"

লোকগুলি কাঁধের যে যার পোঁটলা-পুঁটলি উঠিয়ে নিল। হার্ন এগিয়ে এলেন কথা বলার জন্য—"আমি তোমাদের জানি না, তোমরাও আমাকে জানো না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করবো, এমন কি তোমরা আমার শক্তিকে ঘৃণা করলেও। নাও, এখন এগোন যাক।"

সেই সেনাদল অতি কষ্টে বালিয়াড়ি ভেঙে পথ করে নিল। মানচিত্রে নির্দেশিত নদীর উৎস-মুখের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। হার্ন নেতৃত্ব করার জন্য এগিয়ে আছে, মাথার ওপর জঙ্গল সুউচ্চ ছাদের মত দেখাচ্ছে।

ক্রফ্‌ট নিঃশব্দে হেঁটে চলেছেন, মুখে দৃঢ়তার ছাপ। প্লেটুনের নেতাকে কড়া হতে হয়, বন্ধুভাবাপন্ন হলে চল্‌বে না।—এর মত। কার মত যেন—

যখন সবাই এসে একটা বাঁকের মুখে পৌছালো তখন ক্রফ্‌ট নিজের কোমরে একটা মোটা দড়ি বেঁধে সেই শাদা রঙের ফেনোচ্ছল জল ভেঙে দূর কিনারায় গিয়ে পড়ল। অপর তীরে একটি মোটা গাছের গুঁড়িতে দড়িটা বেঁধে লেফটেনাণ্টকে পার করা হল। তৃতীয় দফায় এল গাল্লাঘর, সে তীরের কাছাকাছি এসে পৌছাতেই তার পকেট থেকে একটি অহুন্মুক্ত খাম তার হাত থেকে জলে পড়ে প্রবল স্রোতে ভেসে গেল। সে একবার সেটি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ডুব দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্রফ্‌ট তাকে জড়িয়ে ধরে তীরে টেনে নিয়ে এলেন—গাল্লাঘর তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এইটি তার স্ত্রীর শেষ চিঠি।

ক্রফ্‌ট চড়া গলায় বল্লেন—"গেছে গেছে! এক টুকরো কাগজ মাত্র, এখন মনে থেকে ওসব মুছে ফেল।"

সেই প্রভাতে শুধু এই চিঠিখানিই যে হারাল তা নয়। প্লেটুন এক এক করে সেই শক্ত দড়ি ধরে ধরে এসে পৌছাল। নতুন আমদানি উইম্যান ঠিকমত পারল না, মাঝপথে পৌছে সে জলে পড়ে গেল, সবাই যখন লক্ষ্য করল তখন সে অনেক দূরে ভেসে চলে গেছে। ক্রফ্‌ট এবং হার্ন দুজনে দৌড়ে তীর-প্রান্তে গিয়ে দেখলেন যে এক টুকরো কাঠের মত উইম্যান ভেসে চলেছে।

ধীরে ধীরে ওরা দুজনে ফিরে এলেন।

নদীকে পেছনে ফেলে প্লেটুন ডাঙায় উঠতেই পরিক্রমা শেষ হল। এখন দুজনে মিলে প্রতি দফায় ওরা এগিয়ে চলে। পাতা লতার জাল ভেদ করে যাওয়া অতি নোঙরা কাজ। রোদের তেজ বৃদ্ধির সঙ্গে ওরা কাতর হয়ে গেল। গাছ কাটতে কাটতে পথ করে নিতে হচ্ছে।

অবশেষে যখন জঙ্গলের প্রান্তে পৌছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তখন চোখে পড়ল ঘাসের ঘন জঙ্গল এবং সামনের ছোট টিলা পাহাড় শ্রেণী। সেই পাহাড় শ্রেণী ছাড়িয়ে একটা পার্বত্য গিরিপথ দেখা যাচ্ছে এই পথ ধরে শত্রুর পিছনে পৌছাতে হবে।

হার্ন অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে ওঁর দলের সকলকে বল্লেন:

"জাপ লাইনের পিছনে আমরা আজ রাতে পোজিসন নিতে চাই। তার মানে অন্ধকার হওয়ার আগে পনের মাইল যেতে হবে। আর কিছু করার আছে সার্জেণ্ট?" ক্রফ্‌টকে প্রশ্ন করলেন লেফটেনাণ্ট।

ক্রফ্‌ট থুতু ফেলে বলল—"হ্যাঁ, সার, আমরা এবার উন্মুক্ত দেশে গিয়ে পড়ব। এই সবাই শোনো, পেট্রলের ডিসিপ্লিন ঠিক রাখা চাই। চেঁচামেচি হৈ-চৈ কিছু চলবে না। পনের মাইল কি পাঁচ মাইল কতটুকু পারব জানি না, তবে আমাদের এটা করতে হবে।"

নিজের কথার প্রকারান্তরে এই প্রতিবাদ শুনে হার্ন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু উনি ওদের ছিন্ন বাহিনী হিসাবে এগিয়ে দিলেন। গিরিপথের দিকে সবই এগিয়ে চলল। গিরিবর্ত্মের পাশে মাউণ্ট আনাকা বিরাট আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় ওরা গিরিবর্ত্মের প্রবেশ-পথের সামনাসামনি গিয়ে পৌছাল। সংকীর্ণ খাদ সূক্ষ্ম সবুজ গাছে ঢাকা, প্লেটুন সেখানে দাঁড়িয়ে তা বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করল। ক্রফ্‌টের চামড়ার মত মুখভঙ্গিমা যেন আশংকায় ভরে উঠল। ক্রফ্‌ট বললেন :

"আমার মনে হয় লেফটেনাণ্ট, ওরা নিশ্চয়ই এই গিরিবর্ত্ম পাহারা দিচ্ছে।"

হার্ন অনিশ্চিত কণ্ঠে জবাব দিলেন :—"আমরা ওদের লাইন থেকে অনেক দূরে আছি।"

হার্ন হলেন অফিসর, আর হার্ন কি, পুরানো ঘুঘুমাত্র। তাই আবার বলুন : "ঐ গিরিবর্ত্ম এত সঙ্কীর্ণ যে দু'জন মানুষ ওটা রুখ্‌তে পারবে না। আমাদের বেশ ভালো করে সব দেখতে হবে। দুটো দ'ল সবটা বিভক্ত করতে হবে। একদল এই মাঠটা অতিক্রম করবে, আর অপর দল তাদের রক্ষণ-ব্যবস্থা দেখা-শোনা করবে।"

সাধারণ জ্ঞানানুসারে হার্নকে এ কথায় রাজী হতে হয়। তবে তিনি জানতেন যে অন্যকালের চাইতেও এখনই যে-কম্যাণ্ড তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছে তা আবার শুরু করতে হবে। তাই তিনি সোজাসুজি যারা মাঠ অতিক্রম করে যাবে সেই দলের নেতৃত্ব ভার নেওয়ার জন্য জেদ করলেন। দ্বিতীয় দলের ভারপ্রাপ্ত ক্রফট সমগ্র দৃশ্যটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ক্রফ্‌ট ছাড়া, ব্রাউন ভীষণ অস্বচ্ছন্দভাবে কাশতে লাগল। সে বলল— "আমরা যদি ঐ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে না পারি তাহলে কি করবে স্থির করেছ ক্রফ্‌ট।"

ক্রফ্‌ট ধমক দিয়ে বলে ওঠেন—"আমায় বলছ কেন? হার্নকে প্রশ্ন করো। এই দলের তিনি অধিনায়ক। তবে কি জানো, সেনাবাহিনীতে কোনো কাজ যদি এক ভাবে না করা যায়, তাহলে অন্যভাবে করতে হয়।"

সৈন্যদল ঝোপের একেবারে ভিতরে গিয়ে পড়েছে এমন সময় পাতালতার ভেতর থেকে একটা কামান গর্জন করে উঠল। একটি গোলা হার্নের পাশ ঘেঁসে গেল, চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন—"সাবধান! গা ঢাকা দাও।" অভিশাপ দিতে দিতে সঙ্গীরা আশপাশের পাথরের আড়াল থেকে যতটুকু আত্মরক্ষা করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করল। পিছন থেকে ক্রফ্‌টের দল গাছগুলি লক্ষ্য করে সমানে গুলি ছুঁড়ে চল্‌ল। তার সারা দেহ দিয়ে ঘাম ঝরছে, হার্ন জানেন যে তাঁর শুয়ে পড়া চলে না, তিনি যে অফিসার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন—"গেট ব্যাক।" রেড, রীজেস, উইলসন, গাল্লাঘর—সকলেই হুকুম তামিল করার জন্য উঠে দাঁড়াল, হার্ন দেখলেন। গাছের ভেতর থেকে একটা বুলেট এসে উইলসনের পেট ভেদ করে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ল। হার্ন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে আহত লোকটির কি সেবা করা যায় দেখতে লাগলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।

আধঘণ্টা পরে উইলসন মারা গেল। যে খাদে প্লেটুন বাসা বেঁধেছিল সেই খাদের ভেতর পড়ে রইল তার মৃতদেহ। রেড আর রীজেস ওদের বিরাট কমরেডের দেহখানি তার জামা-কাপড়ে জড়িয়ে কবরস্থ করে ফেলল। ক্রফট সেই খাদের প্রান্তে বাইনোকুলার দিয়ে রহস্যময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার কাছাকাছি এসে হার্ন প্রশ্ন করলেন—'কি দেখ্‌তে পাচ্ছ?'

"তেমন কিছু নয়।" ক্রফ্‌ট যেন বাধা পেয়ে বিরক্তিভরে মুখ ফেরালো।

"সার্জেণ্ট, কতকগুলি ব্যাপার আছে যা সোজাসুজি করতে হয়। তুমি এই প্লেটুনে অনেক দিন আছো। আমি জানি কম্যাণ্ড ছাড়া অতি কঠিন। কিন্তু অবস্থা ত' এই। এখন এটা আমার প্লেটুন। পাকাপাকিভাবেই। আমি স্থির করেছি, ফিরে যাব। এই গিরিবর্ত্ম রুদ্ধ, কোনোমতেই এ অতিক্রম করা যাবে না।"

ক্রফ্‌ট গর-গর করে বললে—"আমরা কি একবার ঘুরে-ফিরেও দেখ্‌বো না? আমরা ত' নিশ্চিতভাবে জানিনা লেফটেন্যাণ্ট, যে জাপানীরা এখনও ওখানে আছে কিনা, ঐ গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটি বিচার করে দেখলে মনে হয় বড়জোর একটা স্কোয়াড ওখানে আছে মাত্র। হয়ত ওদের ওপর হুকুম আছে শত্রুসেনা দেখতে পেলে পিছু হঠার।"

হার্ন তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন—'সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

"আমাদের কি একটা সুযোগ দেবেন না? কারণ, আপনি ত' জানেন এই টহলদারী বাহিনী সমগ্র আক্রমণের রূপ পালটে দিতে পারে! লেফটেনাণ্ট দেখুন একটা কাজ আমরা করতে পারি, রাতের অন্ধকারে একজন কেউ গিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করে আসুক।'

হার্ন রাজী হলেন, "একজন! রাতের অন্ধকারে? তবে সে যদি কোনো কিছুর সামনে গিয়ে পড়ে—?"

ক্রফ্‌ট গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন—"মার্টিনেজ এই কর্মের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত! সে ইণ্ডিয়ান।

"বেশ মার্টিনেজ ঠিক রইল। তাকে বল্‌বেন ফিরে এসে আমাকে যেন জাগিয়ে দেয়।"

এই বোধ হয় প্রথম ক্রফ্‌ট ওপরওলার আদেশ অমান্য করলেন।

মার্টিনেজকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রফ্‌ট বললেন—জুলিয়ো, লেফটেনাণ্ট ফিরে যেতে চান। আমাদের দায়িত্ব কিন্তু একটা পথ খুঁজে বার করার, যে পথে একটা কমপ্যানী যেতে পারে অন্ধকার হলেই —আমি চাই, তুমি এই গিরিবর্ত্ম পর্যবেক্ষণে যাও। যদি জাপানীদের দেখতে পাও, তাহলে তারা সংখ্যায় ক'জন জানার চেষ্টা করবে। জুলিয়ো, তুমি ফিরে এসে কাউকে কিছু জানাবে না আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত। লেফটেনাণ্ট যদি জেগে থাকেন, বল্‌বে যে বিশেষ কিছুই ঘটেনি।"

মার্টিনেজ উত্তর দেয়—"ও. কে.। আপনি যখন বল্‌ছেন তাই হবে।" তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

চাঁদ উঠেছে, কম্বলে ঢাকা মানুষদের ওপর রূপালি ছায়া নেমেছে। অনেক আগেই মার্টিনেজ ফিরে এসেছে। মাঠ ভেঙে সে ছায়ার মত চলে এসেছে। তার ছুরির খাপ শূন্য, কারণ, খাদের ধারে ফেরার সময় মেসিনগান চালক একজন জাপ সৈনিকের কাছে এসে পড়ে—সৈনিকটা তাকে ঠিক সময়মত দেখ্‌তে পায়নি যে গোলা ছুঁড়বে বা চেঁচাবে, তার পিঠে ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছে। ফিরে এসেই সোজা ক্রফ্‌টের কাছে গিয়ে সবকিছু জানিয়েছে।

ক্রফ্‌ট চুপি গলায় বল্‌লেন—"তুমি তাহলে কিছুই দেখতে পাওনি? ও. কে।—ভালো, তাহলে এখন সরে যাও।"

সূর্যোদয়ের পর উঠে হার্ন ক্রুদ্ধগলায় জানতে চাইলেন—কেন তাকে জানানো হয়নি। ক্রফ্‌ট একগাল হেসে বল্‌ল—"আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন তাই। গিরিবর্ত্ম একেবারে ফাঁকা, শত্রুদল বোধহয় পালিয়েছে।"

"কথাগুলি ভালো শোনাচ্ছে না।"

নির্দোষ কণ্ঠে নিরীহ ভঙ্গিতে ক্রফ্‌ট বলে—"আমরা তাহলে পাহাড়ের দিকে হানা দিতে পারি।"

অসম্ভব! তবে গিরিবর্ত্মের দিক থেকে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকতে পারে। আর একবার চেষ্টা করা যাক।"

পশ্চাদপসরণ বন্ধ করতে পারার ফলে ক্রফ্‌টের মনে গভীর সন্তোষ জেগে ছিল, কিন্তু অপর সেনাদের মনে অস্বাচ্ছন্দ্য জেগে উঠ্‌ল যখন প্লেটুনকে বলা হল যে গিরিবর্ত্ম পার হওয়ার জন্য আবার চেষ্টা করতে হবে। দলের সকলের অস্বস্তি কাটানোর জন্য ক্রফ্‌ট বল্‌লেন যে, মার্টিনেজ গিয়ে দেখে এসেছে কেউ কোথাও নেই। তারপর হার্ন যখন নেতৃত্বের ভার নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন তখন সে গম্ভীর মুখে লাইনে যোগ দিল।

আজ সকালের প্রভাতী আলোয় প্রান্তরটুকু নিরীহ মনে হচ্ছিল। গতকাল যেখানে দলটি বাধা পেয়েছিল সেই অঞ্চলটি পার হয়ে সঙ্কীর্ণ খাদের মুখে গিয়ে পৌঁছাল। হার্ন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পিছনের সঙ্গীদের এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করছিলেন এমন সময় গোপন ঘাঁটি থেকে গোলা বর্ষিত হল। মার্টিনেজ যে জাপানী সেনাটিকে হত্যা করেছিল সে যে নিঃসঙ্গ ছিল না তা বোঝা গেল।

মনে হল যেন হার্নকে শূন্যে তুলে কে নিক্ষেপ করল, তিনি পিছনে হেলে পড়ে গেলেন। আর বাকী সবাই পাথরের খণ্ডের আশে-পাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ক্রফ্‌ট চীৎকার করে ওঠে—"এখান থেকে পালাও, ফায়ার করো! কিছু গুলি ছুঁড়ে যাও!" এই বলে ঘাসের সবুজ পাঁচিলের পাশে তিনি শুয়ে পড়লেন, ওদিকে রেড আর রথ লেফটেনান্টের দেহটা পিছনে টেনে নিয়ে এল।

পিছু হেঁটে এসে ওরা থামলো ক্রফ্‌ট সেখানে সেই ক্লান্ত লোকগুলিকে দিয়ে দুটি গাছের ডাল-পালা কাটালেন, তারপর তাতে একটা কম্বল বেঁধে ষ্ট্রেচার তৈরী করা হল। বুকের কাছে গোলাকার লালরঙে সিক্ত অংশ লাল গোলাপের মত দেখাচ্ছে, হার্ন শুয়ে আছেন আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

ষ্ট্রেচার তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রুথ একটি ভগ্নপক্ষ পাখি দেখতে পেল। সেই ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষদের কয়েকজন সেই অসহায় প্রাণীটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল এমন সময় তারা ক্রফ্‌টের নজরে পড়ল। রাগে ফেটে পড়ে তাদের হাত থেকে সেই প্রাণীটা কেড়ে নিয়ে ক্রফ্‌ট সেটিকে এক রকম চট্‌কে মেরে ফেলে দূরে ফেলে দিলেন। সমগ্র দলের লোকজন তার দিকে বিস্ময়ে ও বেদনায় আকুল হয়ে তাকিয়ে রইল।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রীজেস বলে ওঠে—"এটা করার অর্থ কি? ওকে মারার কোনো অধিকার তোমার নেই—"

"সাট্‌ আপ! সবাই চুপ করো! এই আমার হুকুম।" চীৎকার করে উঠ্‌ল ক্রফ্‌ট।

রেডের মুখে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠ্‌ল, সে বলে ওঠে, "তুমি হুকুম দেওয়ার কে ক্রফ্‌ট ?"

ক্রফ্‌ট আবার চীৎকার করে—"ওসব বাজে কথা ছাড়ো !" ভাবটা যেন ওদের সবাইকেই মারার জন্য ও তৈরী। "তোমাদের মধ্যে দু-একজন লেফটেনাণ্টের ষ্ট্রেচার ওঠাও, ব্রাউন, তুমি জানো কিভাবে এই পরিক্রমা থেকে পার হয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি ? তাহলে তুমি ওঁকে নদীর কূলে নিয়ে যাও। তারপর, যদি নৌকা আসা পর্যন্ত উনি বেঁচে থাকেন তাহলে ওদের সঙ্গে চলে যেয়ো। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা নৌকা পাঠাতে বোলো। আর তোমার সঙ্গে রীজেস ও গোল্ড্‌ষ্টাইনকে নিয়ে যাও।"

মিনেত্তা সহসা ভয় পেয়ে বলে উঠ্‌ল—"হে ! আমরা সকলে তাহলে ফিরে যাবো না ?"

ক্রফ্‌ট কঠোর গলা বিকৃত করে বলে ওঠে—"হে। তুমি কি, অফিসার নাকি ? আমাদের আর সবায়ের সঙ্গে তোমাকে আবার পাহাড়ে যেতে হবে।"

"পাহাড়ে ? আবার পাহাড়ে ?" সকলে একসঙ্গে শঙ্কিত গলায় বলে উঠল।

"পাঁচ মাইলের মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় একটা ফাঁক আছে, এখান থেকে পুব দিকে গেলেই সেই ফাঁক। এখন যদি আমরা বেরোই, তাহলে একদিনেই আমরা চড়াই শেষ করতে পারব।"

রেড করুণ গলায় প্রশ্ন করল—"আমরা ফিরে যাবো না কেন ?"

"সেই কর্মের জন্য আমাদের পাঠানো হয়নি ! আমি এখন এই প্লেটুনের অধিনায়ক। আচ্ছা ব্রাউন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে সরে পড়ো। বাকী সবাই জিনিসপত্র তুলে নাও, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ও. কে.। কাজ শুরু হোক। লাইনে দাঁড়াও।"

মাউণ্ট আনাকা থেকে সূর্যের শেষরশ্মি ক্ষীণ বিদায়োন্মুখ তখন, এক সার মানুষ মাতালের মত লাইন বেঁধে চলেছে, মাথাগুলি তাদের মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে তারা এগিয়ে এসেছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে উঠেছে, চড়াই ভেঙেছে। দুপুর থেকেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছে।…

ওদিকে সেদিনই সকালবেলা হেড কোয়ার্টার্সে একটা কাণ্ড ঘটছিল। জেনারেল কামিংস একটা সি প্লেনে উঠে তাঁর ওপরওলাদের কাছে নৌ এবং বিমানবহরের অভাব সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়েছেন। তাঁর অভিযান

চালানোর জন্য এই দুই বিভাগের সমর্থন অপরিহরণীয়। তাঁর যাত্রার অল্পকাল পরেই কর্নেল ডালেসন, যাঁর ওপর ভার পড়েছিল, সংবাদ পেলেন যে তোয়াকুর নিকটস্থ শত্রু-শিবির সহসা শূন্য হয়ে গেছে।

হঠাৎ জাপানীরা কেন তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। এমন একটা ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার অর্থ কি! হয়ত—

কিংবা এটা একটা ফাঁদ মাত্র। ডালেসন চিন্তিত হলেন।

ক্রফ্‌টের কাছে কিন্তু এই দিনটিতে চিন্তার অবসর ছিল না। তার একমাত্র লক্ষ্য হল ওর দলকে কেবল এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে ষ্ট্রেচার বাহকেরা কি ভাবে সমুদ্রোপকূলে এগিয়ে চলেছে সে দৃশ্যও মনে জেগেছে। তবে সে চিন্তা এখন ব্রাউনের, ক্রফ্‌টের নয়। সাম ক্রফটকে এখন এই অনিচ্ছুক দলটিকে পাহাড়ে টেনে তুলতে হবে।

পাহাড়ের চূড়ো যেখানে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে সেইখানে উঠে আবার নীচে নামার সময় অদূরে বজ্রনির্ঘোষের মত গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। সবাই জানতো যে আওয়াজ গোলন্দাজ বাহিনীর। নিশ্চয়ই অদূরে কিছু ঘট্‌ছে, ওখানে হয়ত দু দল সামনাসামনি পড়েছে।

পাহাড়ের গায়ে ঈগল পাখির মত দুটি হাত রেখে ক্রফ্‌ট তাঁর ভগ্ন এবং ক্লান্ত দলটিকে হুকুম দিচ্ছেন আর প্রাণপণে পাথর আঁকড়ে আছেন পাছে পড়ে যান। আর একটু হলেই ফাঁকটায় পৌঁছানো যায়। পাশের পাহাড়ে লাফিয়ে যেতে গিয়ে প্রায় পা ফসকে পড়ে গিছলেন আর কি। বাকী দল নীরবে দেখতে লাগল। তারপর দূর প্রান্তে পৌঁছে বাকী দলকে অনুসরণ করার হুকুম দিলেন।

ওরা সবাই লোকটির প্রতি ঘৃণায় আকুল হয়ে উঠেছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—"হারামজাদা ক্রফ্‌ট! কি ভেবেছে আমাদের, আমরা কি পাহাড়ী ছাগল?"

কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তা করা চলে না, আবার ক্রফ্‌ট হেঁকে ওঠেন—"ও, কে। মেন! এগিয়ে এসো, নাও শুরু করো!"

এই অভিযানে রথকে হারাতে হল। পা ফস্‌কে সে পাহাড় থেকে একেবারে নীচে গভীর খাদে পড়ে গেল, তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সমস্ত গিরিবর্ত্ম যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু—পড়ার সঙ্গেই সেই আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। দলের আর সবাই ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠে বিমূঢ় হয়ে শুনলো সেই সকরুণ ধ্বনি।

গাল্লাঘর ক্রন্দনাতুর কণ্ঠে বলে—"কোথায় চলেছি আমরা? কি প্রমাণ করতে চাই আমরা? আমরা যদিও উঠতে পারি, সমগ্র কম্প্যানির (দল) এই পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব। এ বেটা ক্রফ্‌ট পাগল হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে ও মারতে চায়। এ যে আত্মহত্যার সামিল।"

ক্রফ্‌ট আবার চীৎকার করে ওঠেন—"কই, কি হোল! এগিয়ে চলো সবাই!"

রেড এতক্ষণে আহত পশুর মত গর্জন করে ওঠে—"কেউ এক ইঞ্চি নড়বে না, কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে।"

বিরাট-দেহ সার্জেণ্ট ক্রফ্‌ট একটু শ্লেষভরে বলে ওঠেন—"ওঃ তাই নাকি!"

"আমরা সবাই ফিরে যাব, তুমি আর ফিরতে পারবে না। পারবে ক্রফ্‌ট? তুমি লেফটেনাণ্টকে মিথ্যা বলে একেবারে মেসিনগানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, সব কিছু জেনে শুনে। জাপানীরা এখানে নেই, একথা বলোনি? তুমি একা পাহাড়ের ওপর ওঠো, নয়ত—"

ক্রফ্‌ট ধীরে ধীরে নিজের রাইফেলটা উঠিয়ে নিয়ে ওদের দিকে রেখে বল্লেন: "আমি তোমাদের বলেছি অনেক বার, জিনিসপত্র উঠিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—নইলে আমি তোমাদের খুলি উড়িয়ে দেব।"

সবাই জানে ক্রফ্‌ট যা বলছে তা ঠাট্টা নয়। এই ওর আসল মনোভাব। তাই সবাই জিনিসপত্র উঠিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে আবার যাত্রা শুরু করে।

পর্বত-শিখরে ছায়াঘেরা অঞ্চলে পৌছে ওরা বিচ্ছিন্ন পাথরে ঘেরা একটা টিলা পাহাড়ে পৌছালো। আঁকা-বাঁকা একটা পার্বত্য-পথ বেয়ে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ে ক্রফ্‌ট ওদের জোর করে ওঠালো। লোকগুলি বুড়া মানুষের মত ঠক ঠক করে কাঁপছে, ক্লান্তিতে এবং দুর্দশায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে যেখানে ক্রফ্‌ট দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে পৌছে ওরা সবাই অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল, আর এগোবার শক্তি নেই কারো।

ক্রফ্‌ট তখনও গর্জন করেন, "আমিই এগিয়ে যাবো, তোমরা সবাই অস্ত্র-সাহায্য দিয়ে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।"

ক্রফ্‌ট বুকে হেঁটে—হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন আর মাটিতে কান পেতে শুনছেন। কোনো বাধা নেই,

প্রতিরোধের চিহ্ন নেই। গাছগুলির প্রায় প্রান্তে পৌছে উঠে বসলেন ক্রফ্‌ট, তারপর দলবলকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন।

সেই বিরল নীল আকাশ প্রকম্পিত করে সহসা একটি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বিস্ময় বিমূঢ় ক্রফ্‌ট পিছন দিকে হেলে পড়ে গেলেন। বিভ্রান্ত দলবল হতচকিত হয়ে পড়ল—, কে যেন অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল—'জ্যাপস্‌'।

গাছের আড়াল থেকে প্রায় পঞ্চাশজন জাপানী রাইফেলধারী সৈন্য এগিয়ে এল, অফিসারের হাতে একটা সামুরাই তরবারি—আর সেনাদল গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। ক্রফ্‌ট রাইফেলটা তুলে ধরতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অফিসার ওর বুকে সেই শামুরাই তরবারি প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

খরগোসের পালের মত প্লেটুনের আর সবাই পালিয়ে গেল।

ওদিকে অপারেশন টেণ্টে জেনারেল কামিংস ওপরওলাদের কাছে আরো নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রার্থনা জানিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরছিলেন। উপরওলাদের কাছ থেকে তড়পানি খেয়ে তিনি জ্বালায় ছট্‌-ফট্‌ করছিলেন। ওপরওলারা মনে করেন যে, কাজ সফল না হওয়াটা জেনারেলেরই অক্ষমতা। লড়াই যেন খালি হাতে হবে। এমন কি ওঁদের মতে জেনারেল নাকি শত্রুসৈন্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা করে বসে আছেন।

ফিরে এসে জেনারেল দেখেন অপারেশন টেনটে ভীষণ হট্টগোল। টেলিফোন বাজছে, ম্যাপ গড়াগড়ি যাচ্ছে। সব অফিসার মিলে চেঁচামেচি করছেন, হৈ চৈ বেঁধে গেছে। কোন্‌ একটা ইডিয়ট চেঁচাচ্ছে—"সেকেণ্ড ব্যাটালিয়ন জাপ হেড কোয়ার্টার্সকে পর্যুদস্ত করেছে, ওরা একেবারে বিতাড়িত।"

নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ উত্তেজিত কর্নেল ডালেসন তাঁর উপস্থিতি আবিষ্কার করে বলে ওঠেন—"স্যার! আমরা শত্রুদের আক্রমণ করে বিতাড়িত করেছি।"

কামিংস পাথরে গড়া মানুষ, গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন—"তোয়াকুর কি হল? সে বেঁচে আছে?"

"আমাদের একজন জাপানী বন্দী বলছিল তোয়াকু আমেরিকান লাইন ভেদ করে পালিয়েছে।"

"নির্জলা মিথ্যা! তোয়াকু নিশ্চয়ই এখনো এই দ্বীপেই লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বার করো। শুনতে পাচ্ছো! কোনো কথা শুনতে চাই না।"

কর্নেল নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে শুধু বল্লেন—"ইয়েস স্যার।"

সুদীর্ঘ দিনের অবশেষে অবসান ঘটে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সেই যেখানে সমুদ্রোপকূলে আক্রমণকারী বোট ভেড়ানো আছে। তিনজন শ্রান্ত মানুষ নীরবে বসে আছে ষ্ট্রেচারটা ওঠাবে বলে। কোনো রকমে তারা এখনও লেফটেনাণ্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন—

নৌকার চালক মৃদু গলায় বলে—এখন সব নির্ভর করছে তাড়াতাড়ি ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে পৌছে দেওয়ার ওপর। আমি বরং আরেকটা নৌকার জন্য বেতার মারফৎ খবর দিই, বাকী সবাই তাতে—"

কথাটা আর শেষ করা যায় না। জঙ্গলের ভেতর থেকে সহসা রাইফেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। নৌকার সবাই সতর্ক হয়ে উঠল। একটি বিপর্যস্ত আকৃতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বালি ভেঙে নামতে লাগল, সে গাল্লাঘর। তার পিছনে দ্রুতগতিতে আসছে মিনেত্তা, ব্রাউন, রেড আর মার্টিনেজ—

ওদের পিছনে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর জোনাকির আলোর মত গুলির চমক দেখা যাচ্ছে। নৌকার অস্ত্রশালা থেকেও বুলেট বর্ষিত হতে থাকে। নৌকার মেসিনগান চালক প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, আর বাকী লোকেরা এই শ্রান্ত, আহত, পলাতক মানুষগুলিকে টেনে তুল্‌লো নৌকার ওপর।

মার্টিনেজ ওদের নেতৃত্ব করে নিয়ে এসেছে, তাকেই সর্বশেষে জল থেকে টেনে তোলা হল। সে নৌকায় উঠে হাঁফাতে শুরু করতেই নৌকা ছেড়ে দেয়।

ডাক্তাররা দেখার পর যে হাসপাতাল শিবিরে হার্ন আহত অবস্থায় শায়িত সেখানে গুজবের আর অন্ত নেই। শিবিরের ছাদের পানে তাকিয়ে চেয়ে আছেন হার্ন, আশ-পাশের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—

"সবাই বলছে আমাদের এই ক্ষুদে টহলদারী বাহিনীর ঠেলায় তোয়াকুকে হঠে যেতে হয়েছে।"

"ওরা বলছে যে, আমরা প্রথম যখন গিরিবর্ত্মে আক্রান্ত হই, তখন ওরা বেতারযোগে সংবাদ পাঠিয়েছে যে অন্তত আধ-ডিভিসন সেনাদল পিছনে আছে। কারণ জাপানীরা দুটি কম্প্যানিকে উঠিয়ে নিয়ে ওপারে পালিয়েছে। ওদের লাইনে মস্ত ফাঁক পড়ে যায়, ফলে সমস্ত অভিযানটাই একেবারে বেলুনের মত ফেঁসে গেছে।"

"মনে হচ্ছে টহলদারী বাহিনীর বুদ্ধি আছে। তবে ঐ হতভাগ্য ক্রফ্‌ট—ওঃ—অমন ছোটলোক আর দেখা যায় না, যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনই নীচ, কিছুতে ভয় নেই—আঃ—ওসব ঐ ক্রফটেই সম্ভব !"

লোকেরা হার্নের পাশে এসে দাঁড়াত, ওঁর শরীর সম্পর্কে প্রশ্ন করত। হার্নের তা ভালো লাগত। সবাই বেশ ভালো লোক। হার্ন ভাবেন, যুদ্ধান্তে এদের কি হবে, গাল্লাঘরকে তার শিশুপুত্র মানুষ করতে হবে। মার্টিনেজ একেবারে জাত সৈনিক, আবার হয়ত সেনাদলে নাম লেখাবে। যতদিন না পেনসন নেওয়ার সময় হয় কাজ করে যাবে। গোল্ডষ্টাইন আর রীজেস ওদের খামারের কাজে ফিরে যাবে। রেডটা হালকা চরিত্রের মানুষ, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিন কাটাবে। আর মিনেত্তা—ওদের অনেক পয়সা—'

ওদের সকলের কথাই মনে মনে ভাবেন হার্ন, আর সকলের কল্যাণ কামনা করেন। ওরা সবাই ভালো। ওদের মঙ্গল হোক।

একদিন সকালে জেনারেল ওর খাটের ধারে এসে দাঁড়ালেন। ভঙ্গীটা একটু অন্যরকম। হার্ন তাঁর পাশবিক, শীতল দৃষ্টির পানে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন—

জেনারেল কামিংস অবশেষে বললেন—"তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে ভারী আনন্দ হল, রবার্ট। তোমার বাবাকে চিঠি দিয়েছি। তুমি আহত হয়েছ শুনে আমি দুঃখিত।"

—"তা একটু দুঃখ করবেন বৈকি জেনারেল !" কথার সুরে তিক্ততা ঢাকা গেল না। জেনারেল কিন্তু যাওয়ার জন্য অস্বস্তিভরে এগিয়ে গেলেন, যেন চলে যাচ্ছেন এই ভঙ্গি।

হার্ন হঠাৎ বলে ওঠে—"অনেক কথা মনে হচ্ছিল স্যার !" এই কথায় জেনারেল দাঁড়িয়ে পড়লেন। "আপনি যে-সব কথা বল্‌তেন তাই ভাবছিলাম স্যার। ভয়ের শক্তি আর শক্তির ভয়। ভয় দিয়ে মানুষকে জয় করা যায় না জেনারেল। তখন আমি ঠিক বুঝতাম না আপনার ভুল হচ্ছে না আমার, এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি।

কামিংস শুখ্‌নো গলায় বল্লেন—"বলে যাও, কি বুঝেছ বলো শুনি !"

"দুজন মানুষ আমাকে জঙ্গলের ভেতর আঠারো মাইল বয়ে নিয়ে এসেছে জেনারেল, দু'জন আশ্চর্য মানুষ। তারা আমাকে ভয়ে ভয়ে আনেনি, ভালবেসে এনেছে। এই ভালোবাসা ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি নয়, মানুষের প্রতি

মানুষের ভালোবাসা। ওরা নিজেদের ভালোবাসে, আমাকে যদি হারাতো, নিজেদেরও অনেকখানি যেত ওদের। ওরা আমাকে বাঁচিয়েছে, বরং আরেকটু বেশী করেছে। ওরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে মানুষের অন্তরে এমন এক শক্তি আছে যা সকল ভয়কে জয় করে, সকল দুর্দশা, সকল ক্লেশ।"

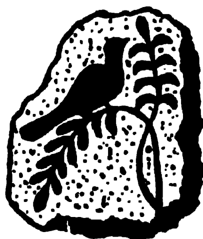
"রবার্ট! আমি দানব নই।"

"মানুষ দেবতা হতে পারে না জেনারেল! রাজনীতিবিদ আর জেনারেলদের সেই চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির নামই ভগবান। মানুষই তাই দেবতা। তাই সে অবিনাশী, তার ক্ষয় নেই, ভয় নেই।"

কিছুক্ষণের জন্য সেইখানেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংস দাঁড়িয়ে রইলেন। কথাগুলি তিনি শুনেছেন, হয়ত সত্যই শুনেছেন। তারপর তিনি দ্রুতপদে শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সেই চলে যাওয়ার চেহারাটা দেখলে হায়, কি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল প্রভাবে মানুষটা সহসা কেমন সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র, শীর্ণ হয়ে গেছে।

আর এদিকে—এই যে সব সাধারণ মানুষ, যারা টহলদারী বাহিনীর দলে একত্রিত হয়েছিল, যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অতি আকস্মিক পরিবেশে—তারা কেমন বৃহৎ হয়ে উঠেছে।

এই সব নগ্ন আর মৃত মানুষদের আগে কখনো এত বড়, এত বিরাট মনে হয়নি, আশ্চর্য!





মিখাইল জোস্‌চেংকো

সংকট

এই সেদিন মশাই গাড়ি গাড়ি ইঁট বড় রাস্তা দিয়ে গেল, স্বচক্ষে দেখ্‌লাম!

বুঝ্‌তেই পারছেন, আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠ্‌ল। কারণ, এর অন্তর্নিহিত অর্থ বাড়ি তৈরী হচ্ছে। বৃথা ত' আর লোকে গাড়ি গাড়ি ইঁট নিয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করেনা। কোথাও, কোনখানে ছোটখাটো বাড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে, এতে আর এতটুকু ভুল নেই, নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠ্‌ছে।

হয়ত বিশবছর পরে, বা তার চাইতেও কম সময়ে, এই শহরের সকল নাগরিক মাথা পিছু অন্ততঃ একখানি সম্পূর্ণ ঘর পাবে। আর যদি জন সংখ্যা দ্রুততালে বেড়ে না ওঠে তাহলে দুখানা ঘরও মিল্‌তে পারে। তারপর তিনখানা ঘর, একটা করে বাথরুম সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে।

এর পর আমরা একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারব মশাই, একটু আরাম পাব! একটা ঘরে ঘুমানো যাবে আর আর একটা ঘরে ধরুন অতিথি অভ্যাগত এলে বসানো যাবে, আর একটায় অন্য কিছু···আর তখন অনেক সময় পাওয়া যাবে —এইরকম স্বাধীন ও মুক্ত-জীবনে অনেক কিছু করারও অবসর পাওয়া যাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটু মাথা গোঁজার জায়গা জোগাড় করতেই যে প্রাণান্ত হয়ে উঠল। এই সংকটের জন্য ক্রমশঃই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠ্‌ছে।

সামনেই এই দেখুন না, আমি মস্কোতে থাকতাম। সেখান থেকে সম্প্রতি চলে এসেছি, আমার নিজের জীবনেই ত এই সংকট মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে হাড়ে হাড়ে জলছি।

মস্কৌ পৌছলাম বুঝলেন, তারপর জিনিস পত্তর লটবহর নিয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম, বিশেষ কোনও রাস্তায় নয়।

কোন রাস্তাই আমার জন্য খোলা ছিলনা, দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই, জিনিষগুলি নামিয়ে রাখ্‌বারও মত একটু স্থান সংগ্রহ করতে পার্‌লাম না।

এই ভাবে দু সপ্তাহ ধরে জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। কদিন ক্ষৌরকর্মের অভাবে কিঞ্চিৎ দাড়ি গজিয়ে উঠল, আর জিনিসপত্রও একটির পর একটি করে হারাতে লাগ্‌ল।

এর ফলে আমিও ভারমুক্ত হয়ে আরো সহজ ভাবে পথে পথে ঘুরতে লাগ্‌লাম। পরশ-পাথরের সন্ধানে ব্যস্ত ভ্রাম্যমানের মতো বাড়ি খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লাম। সন্ধান মিলল, অবশেষে বিধাতা সদয় হলেন।

একটি বিরাট বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে একটি ছোট্ট মানুষ নেমে আস্‌ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

তিনি বল্লেন—তিনশো রুবল পেলে আপনাকে বাথরুম শুদ্ধ দিয়ে দিতে পারি। চমৎকার ঘর। ছোটখাটো প্রাসাদও বলা চলে। তিনটে জলের কল, একটায় স্নানের বন্দোবস্ত ররেছে, জলের চৌবাচ্চা রয়েছে, এই বাথরুমেই আপনি বেশ থাক্‌তে পারবেন।—তারপর একটু থেমে বল্লেন—ঘরটিতে অবশ্য জানলা নেই, কিন্তু একটি দোর রয়েছে, আর হাত বাড়ালেই জল আর কল,—আরো বল্লেন—ইচ্ছে করলে চৌবাচ্চা ভরে নিয়ে সারাদিন জলেই সাঁতার কাটুন না, কেউ কিছু বলার নেই।

আমি বললাম, ধীর ভাবেই বল্‌লাম—কম্‌রেড, আমি মাছ নই, জলচর জীব নই, দিনরাত জলে ডুবে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই, শুখ্‌নো ডাঙাতে থাকাই আমার কাম্য, এই স্যাঁতসেঁতে ঘরটিকে একটু খট্‌খটে করে দিন বরং—

তিনি বল্লেন: মাফ্‌ করবেন, সেটি হবেনা, হলে অবশ্য খুসী হতাম কিন্তু উপায় নেই, এটা হ'ল এক রকম ছত্রিশ জাতের বাসা, তাছাড়া বাথরুমের জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে ভাড়াও যে পাই কম্‌রেড্‌।

আমি ম্লানমুখে বল্‌লাম—তাই ত', কোন উপায় নেই দেখ্‌চি। বেশ তিনশো রুবলই নিন, তাড়াতাড়ি আমাকে গৃহপ্রবেশ অর্থাৎ বাথরুম প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিন। তিন সপ্তাহ ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হাঁফিয়ে উঠেছি কম্‌রেড্‌, আর পারি না—

ভদ্রলোক লোক ভালো, বল্লেন, বেশ, বেশ! আমাকে তিনি ঘর দেখিয়ে দিলেন, আর তদবধি সেইখানেই থেকে গেলাম।

বাথরুমটা রাজসিক বটে, রাজা রাজড়ারই উপযুক্ত। যেখানে পা দেবেন সেইটাই শ্বেতপাথরের স্নানাগার, তারপর ধরুন জলের কল, মার্‌বেলের বিচিত্র কারুকার্য, একেবারে মার্‌বেল প্যালেস।

বস্‌বার জায়গা কোথাও নেই, বস্‌তে হ'লে ঐ স্নানমঞ্চের পাশেই একটু ঠাঁই করে নিয়ে বসতে হবে, তার ফলে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে, সোজা সেই মারবেল বাথের ভিতর টপকে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে হ'বে।

তিনশো রুবলের বিনিময়ে চৌবাচ্চাগুলিতে ঢাকার বন্দোবস্ত করে, তার উপরই বসবাস কর্‌তে লাগলাম।

এরই একমাস পরে ঘটনাচক্রে আমার বিবাহ হয়ে গেল।

এমন চমৎকার এক সুচরিতা তরুণী আমার পাণি-পীড়ন কর্‌লেন, যাঁর নিজেরও কোনো মাথা গোঁজার জায়গা নেই। গৃহাভাব!

ভেবেছিলেম এই বাথরুমের কথা শুন্‌লেই হয়ত আমাকে উনি অপছন্দ কর্‌বেন, বিবাহ নাকচ হ'বে, আমিও আর এ জীবনে গৃহসুখ, স্ত্রীর পরিচর্যা ও নানাবিধ দাম্পত্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌তে পারবো না; কিন্তু উনি এসব গায়ে মাখ্‌লেন না, আমাকেও প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন না। উনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত কর্‌লেন, তারপর বল্লেন:

বেশত, কতলোকই হয়ত বাথরুমে থাকে, তাছাড়া প্রয়োজনমত বাথরুমটাকে দু অংশে বিভক্ত করে নিয়ে একটায় শোয়া-বসার ব্যবস্থা করা যাবে আর একটা হবে ডাইনিং রুম।

আমি সবিনয়ে বল্‌লাম—আর্যে! পার্টিশন করা যায় বটে, কিন্তু শয়তান বাগাড়েরা কিছুতেই তা হ'তে দেবেনা—ওরা বল্‌বে 'পার্টিশন চল্‌বে না!'

বেশ, বেশ! সব ঠিক হয়ে যাবে।

যেমনটি ছিল তদবস্থাতেই আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বসবাস কর্‌তে লাগলাম।

বছর শেষ হবার আগেই আমার স্ত্রী একটি শিশু সন্তান প্রসব কর্‌লেন।

পুত্রের নামকরণ কর্‌লাম 'ভলোদকা'। আর বাথরুমেই বাস কর্‌তে লাগ্‌লাম, ঐ—মারবেল স্নানমঞ্চে তাকে স্নান করাই আর থাকি।

এর ফল ভালোই দাঁড়াল, বাচ্ছাটি প্রতিদিন স্নানাভ্যাস করার ফলে আর চট্ করে তার ঠাণ্ডা লাগ্‌তো না।

একটা শুধু মুস্‌কিল ছিল, একটু অসুবিধাই হত আমাদের। ছত্রিশ জাতের

বাস এইখানে। তাঁরা নিয়মিত ভাবে স্নান করতে আসতেন, আর সেই সময়টুকু আমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম।

বাসিন্দাদের কাছে সবিনয় নিবেদন জানিয়েছিলাম :

—আপনারা দয়া করে প্রতি শনিবার স্নান করুন, প্রতিদিনই কিছু স্নান করার প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি রোজ স্নান করেন ত আমরা কোথায় দাঁড়াই, আমাদের কথাটা একটু বিবেচনা করুন—

কিন্তু ওরা বত্রিশ জন, সবকয়টি পাকা শয়তান! সবাই গালাগাল দিতে ওস্তাদ। আমাকে সবাই বুঝিয়ে দিল একটু এদিক ওদিক হলে ওরা সবাই চাঁদা করে মেরে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

বলুন, এর পর আর কি করা যায়? আমি আর কি করতে পারি? আমরা যথারীতি বসবাস করতে লাগলাম।

কিছুকাল পরে আমার স্ত্রীর জননী তাঁর গাঁয়ের বাড়ি থেকে এই বাথরুমে এসে পদার্পণ করলেন, তিনি একটা মারবেল স্তম্ভের পাশে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন।

তিনি বল্লেন : আমার চিরদিনের বাসনা, বরাবরের সাধ, আমার নাতিটিকে নিজের হাতে দোল দেব, সে আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করোনা—একটু করুণ ভঙ্গীতেই তিনি বল্লেন।

আমি বল্লাম : না বঞ্চিত আমি কাউকে করবো না, আপনাকেও নয়। বল্লাম—হে বৃদ্ধা! মনের আনন্দে নাতিকে দোলা দাও, বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন! আর প্রয়োজন হ'লে বাথরুমের জল বোঝাই চৌবাচ্চাগুলোয় নাতি ও দিদিমা দুজনের ডুবসাঁতার কাটাও চলবে।

তারপর স্ত্রীকে বল্লাম :—আর্যে! তোমার অপরাপর আত্মীয়বর্গের আগমনও ত' আসন্ন; তা যদি হয় অবিলম্বে আমাকে জানাও, উদ্বেগাকুল হয়ে মনে মনে সব কথা চেপে রেখো না।

তিনি শুধু বল্লেন : না, কে আর আসবে! তবে আমার ছোট ভাইটি হয়ত বড়দিনের ছুটিতে একবার আসতে পারে।

তাঁর সেই স্নেহাস্পদ অনুজের আগমন প্রতীক্ষায় না থেকে আমি তখনই মস্কো ত্যাগ করলাম।

এখন ডাকযোগে পরিবারবর্গকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাচ্ছি। বাড়ির অভাবে কি জটিল সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে একবার ভাবুন ত'!



আয়ান ম্যাকলীন হানটার

রোমান হলিডে

য়ুরোপের রাজধানীগুলিতে শুভেচ্ছা সফরে বেরিয়েছে কিশোরী রাজকুমারী প্রিন্সেস্ এ্যান। রাজকুমারীর লণ্ডনের এই সফর সার্থক হয়েছে। ব্রিটিশ জনসাধারণের অকুন্ঠিত অভ্যর্থনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে চারিদিক। লাবণ্যময়ী রাজকুমারীর মুখের হাসি, মাথার চুল, চোখের দৃষ্টি, মর্যাদামণ্ডিত অভিজাত ভঙ্গিমা সকলের অন্তর স্পর্শ করেছে।

কলরব আর ক্লান্তিভরা তিনটি দিন কাটলো লণ্ডনে, তারপর বিমানে আমষ্টারডাম, সেখানে আন্তর্জাতিক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও একটি বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজের নামকরণ-উৎসব সারতে হ'ল প্রিন্সেস্ এ্যানকে। তার পরদিন পারী, ফ্রান্সের মাটিতে বসে প্রিন্সেস্ এ্যানকে স্বদেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য বহুবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হ'ল।

তারপর রোম···

বিরাট সামরিক কুচকাওয়াজ সংবর্ধনা জানায় রাজকুমারীকে, সংবাদচিত্রের ধারা-বিবরণী দিচ্ছে ঘোষক—"রাজকুমারী এ্যানের দেহে বা মনে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই, তাঁর স্বদেশস্থ রাষ্ট্রদূতের ভবনে এক বিশেষ ভোজসভায় রাজকুমারী সহাস্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সবাইকে।" ইত্যাদি!

অনেক রাতে এ্যামবাসী ভবনে বল নাচের আসর ভাঙলো। বিছানায় অবসাদক্লিষ্ট ক্লান্ততনু মেলে দিয়েছে কোমলাঙ্গী এ্যান, ঘুমের স্নেহ-কোমল

স্পর্শ টুকু পাওয়ার আগে মাথায় ব্রাস ঘস্‌ছে, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়সী কাউণ্টেস্ ভেরেবার্গ। কাউণ্টেস্ প্রিন্সেস্ এ্যানের একান্ত সহচরী ও অভিভাবিকা। এ্যান বলে ওঠে—"এই নাইট গাউনটা বড় বিশ্রী লাগে আমার, পাজামা পরে শুলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?"

এই বিস্ময়কর উক্তিতে আহত হ'লেন কাউণ্টেস্।

কাছাকাছি একটা পার্কে নাচ-গানের উৎসব হচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে জানলায় এসে দাঁড়ালো এ্যান। সতর্ক প্রহরী কাউণ্টেস্ তাকে জানলার ধার থেকে সরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল, সেই সঙ্গে ট্রে সাজিয়ে এল দুধ আর বিস্কুট। আবার বিদ্রোহের স্বর ধ্বনিত হ'ল রাজকুমারীর কণ্ঠে—

"আমরা যা কিছু করব সবই পু ষ্টি ক র হওয়া চাই।"

চোখের চশমা-জোড়া ঠিক করে নিয়ে কাউণ্টেস্ আগামী দিনের ক্লান্তিকর কার্যসূচী পাঠ করে শোনাতে থাকেন। সকালে এ্যামবাসীর কর্মচারীদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট সেরে নিয়ে যেতে হবে "পলিনারী অটোমোটিভ ওয়ার্কসে", তার পর কৃষিশালা পরিদর্শন, অতঃপর অনাথ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন—গেল সোমবারের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি।

ক্লান্ত এ্যান বলে ওঠে—"তারুণ্য ও প্রগতি।"

"এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এ্যামবাসীতে ফিরে প্রেস কনফারেন্স।"

নিষ্প্রাণ গলায় রাজকুমারী বলে—"মাধুর্য ও সৌজন্য।"

তার পর লাঞ্চ সেরে পুলিস গার্ড পরিদর্শন। প্রায় মনে মনেই বলে ওঠে এ্যান—"হাউ ডু ইউ ডু, চা র্ম ড!"

এর পর চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে কিশোরী এ্যান, বলে—"থাম থাম, আর বলতে হবে না।"

কাউণ্টেস্ তৎক্ষণাৎ বল্‌ল—"নার্ভ ঠিক নেই, ডাক্তারকে খবর দিই।" আর কিছুক্ষণ পরে কাউণ্টেস্ ডাক্তার বনাকোভেনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ততক্ষণে শান্ত হয়েছে এ্যান্।

রাজকুমারী শান্ত গলায় বলে—"লজ্জা করে ডাঃ বনাকোভেন, হঠাৎ কেমন কান্না এল।"

কাউণ্টেস্ বল্‌লেন—"প্রেস কনফারেন্সের আগে অন্ততঃ বেশ শান্ত ও সুস্থির থাকা চাই ডাঃ বনাকোভেন।"

এ্যান্ প্রতিজ্ঞা করে, "আমি শান্ত ও সুস্থির থাকবো, মিষ্টি করে হাসবো, বাণিজ্যিক সম্পর্কের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করবো।"

কিন্তু আবার সেই কান্না, চাপা কান্নায় আকুল হয়েছে এ্যান। আর হাইপোডারমিক গায়ে ফুটিয়ে ডাক্তার বলে ওঠে—"ইওর হাইনেস্, এইবার বেশ সুস্থ হবেন, আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। নতুন ওষুধ, একেবারে নির্দোষ ওষুধ।"

বিছানায় এ্যানকে শুইয়ে রেখে বললে: "ওষুধটা কাজে লাগতে একটু সময় লাগছে, একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন।"

"একটু আলো জ্বেলে রাখতে পারি?"

কাউণ্টেস্‌কে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার বলেন—"নিশ্চয়, এখন কিছুক্ষণ আপনি যা খুসী করতে পারেন।"

'যা খুসী করতে পারেন'! কতদিন আগে সে যা খুসী করেছে, জ্ঞান হওয়ার পর ত' নয়ই। ইতিমধ্যে সেই পার্ক থেকে আবার প্রচণ্ড হাস্যরোল শোনা গেল। সেই খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে সেদিকে চেয়ে রইল এ্যান।

'কিছুক্ষণ যা খুসী করতে পারেন।'—ডাক্তার নিজে বলে গেল। সহসা সে তার লম্বা চুল বেঁধে ফেলল—অতি দ্রুতভঙ্গিতে সাজসজ্জা করলো এ্যান, দরজার প্রহরীর চোখে ধুলো দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাতায়ন-পথ নেমে পড়ল রাজকুমারী, তাড়াতাড়ি স্বল্পালোকিত সিঁড়ি বেয়ে একেবারে সদরে এসে পৌঁছলো, সেখানে ধোবীখানার ট্রাক দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভার আসার আগেই তাড়াতাড়ি সেই ট্রাকে উঠে পড়ল এ্যান।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রাক এ্যামবাসী ভবনের গেট পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল,—পথ চলতে দেখা যায় পথের ধারে কাফেতে প্রেমিক-যুগল পরমানন্দে হাসছে। সেই দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে রাজকুমারী। বেশ ঝিমুনি ধরেছে, হঠাৎ পথের বাঁকে বিকট শব্দে ব্রেক করে ট্রাকটা দাঁড়াতেই চমক ভাঙলো এ্যানের, তাড়াতাড়ি ট্রাক থেকে নেমে পড়ে নিকটস্থ পার্কের পথ ধরে একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল—এইটুকু তার মনে আছে।

•

পার্কের কাছাকাছি এক হোটেলে এক দল আমেরিকান সংবাদিকের তাস খেলা শেষ হ'ল। জো ব্রাডলী চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ তনু, শীর্ণ, অঙ্গ, অথচ লোকটির আকর্ষণীয় অকৃতির সামনে সুচেহারাও ম্লান হয়ে যায়,—খেলায়

জিতে কয়েকটি লায়ার (ইতালীয় মুদ্রা) পেয়েছিল জো—তাতে তার মুখে হাসি আর ধরে না।

দাড়িওলা আরভিং রাডোভিচ, সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার, হাই তুলে বলে—"তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, কাল আবার হার রয়েল হাইনেসের কাছে যাওয়ার কথা,—অনুগ্রহ করে কয়েকটি ছবির পোজ দেবেন কথা দিয়েছেন।"

জো প্রশ্ন করে—"সকাল সকাল মানে? আমার ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ হ'ল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ—" তারপর সকলের দিকে হাত তুলে বলে, "রাজকুমারী এ্যানের পার্টিতে কাল সকালে আবার দেখা হবে।"

পার্কের ধার দিয়ে চলার সময় জো ব্রাডলীর চোখে পড়ল এক ধারে বেঞ্চে শুয়ে চমৎকার একটি মেয়ে—এত গভীর ঘুম যে, প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। তার কাঁধে হাত দিতেই মেয়েটি গুঞ্জনের স্বরে বলে ওঠে, "ভারী আনন্দ হ'ল, কেমন আছো সব?"

জো চীৎকার বলে—"উ ই, উঠে পড়ো।"

মেয়েটি নম্রভাবে জবাব দেয়,—"না ধন্যবাদ, আপনি বরং বসুন।"

"উঠে বসো,—শুনছো?"

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে—"দুটো পনেরো, বাড়ি ফিরে এসে পোষাক বদ্‌লাতে হবে।"

"যারা হজম করতে পারে না, তারা মদ টানে কেন?"

স্বপ্নের ঘোরে মেয়েটি বলে—

"If I were dead and buried
and I heard your voice,
beneath the sod of my heart of dust
would still rejoice—

জানেন কবিতাটা?"

"বাঃ.—বেশ শিক্ষিতা দেখ্‌ছি, পোষাকও বেশ পরিপাটি, এদিকে রাজপথে পড়ে আছো, এখন একটা বিবৃতি দেবে নাকি? কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আভাষ পাওয়া যায়।

অসংলগ্ন ভাবে কয়েকটি কথা বলে মেয়েটি আবার পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে,—জো তাকে টেনে ধরে দাঁড়-করায়। একটা ট্যাক্সি ডেকে বলে, "চলে এসো, ট্যাক্সিটায় উঠে বাড়ি যাও, কাছে টাকা পয়সা আছে ত?"

"ও-সব বালাই আমার নেই, টাকা আমার কাছে থাকে না।"

"কোথায় থাকো ?"

অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েটি বলে—"কলিসিউম।" শুনে ব্রাডলী বল্‌ল, "ততটা নেশা হয়নি দেখছি।" তখন মেয়েটি বলল—"তুমি ত' বেশ স্মার্ট, মদ আমি খাইনি, তবে আজ আমার ভারী আনন্দ।"

জোর করে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে তুলে ব্রাডলী ড্রাইভারকে নিজের ঠিকানা বলে দেয়। জো'র মনে হ'ল নিজের বাসায় নেমে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটু বেশী টাকা দিয়ে মেয়েটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে। কিন্তু জো ব্রাডলীর বাসায় পৌঁছানোর পর ট্যাক্সি ড্রাইভার মেয়েটিকেও ঠেলে বার করে দেয়—বলে, "আমার ট্যাক্সিটা ঘুমোবার জায়গা নয়।"

বিরক্ত জো ভাবে কি বিপদ; মেয়েটা নিশ্চয় তার সমস্যা নয়। কিন্তু তাকে ঠিক ফেলে দেওয়া যায় না। পথে ফেলে গেলে পুলিসে ধরবে। মেয়েটাকে টেনে তুলতে তুলতে জো আপন মনে বলে—"আমার মাথাটা দেখছি পরীক্ষা করা দরকার।"

ছোট্ট ঘরটিতে পৌঁছে মেয়েটি প্রশ্ন করে—"এটা বুঝি এলিভেটর ?" জো জবাব দেয়—"আমার বাসা।"

একটি চেয়োরে বসে পড়ে মেয়েটি বলে—"খুবই লজ্জা বোধ করছি, তবু না বলেও পারছি না আমার মাথাটা ভীষণ ঘুরছে, আমি এখানে একটু শুতে পারি।"

উৎসাহহীন কণ্ঠে জো বলে—"সেই রকম ত' মনে হচ্ছে !"

"একটা সিল্‌ক নাইট-গাউন পাওয়া যাবে,—গায়ে গোলাপ ফুলের বুটি দেওয়া থাকবে !"

আলমারি থেকে একটা ডোরাকাটা পায়জামা বার করে জো ব্রাডলী বলে—"আপাততঃ দুধের সাধ এই ঘোলে মেটাতে হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে—"পায়জামা! পায়জামা!" কথার অর্থ ঠিক না বুঝে জো বলে, "কি করি বলো, বহুকাল নাইট-গাউন পরা ছেড়ে দিয়েছি।"

ব্লাউজ আর স্কার্ট সামলাতে মেয়েটির কুণ্ঠিত ব্রীড়ানম্র ভঙ্গী দেখে জো ব্রাডলী বললে—"আমি বরং বাইরে গিয়ে একটু কফি খেয়ে আসি, তুমি ঐ কাউচে শুয়ে পড়ো।"

মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় মেয়েটি বলে—"বেশ, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম"—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জো ব্রাডলি বললে—"ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ।"

সেই মুহূর্তে এ্যামব্যাসী ভবনে রাজকুমারীর আকস্মিক অন্তর্ধানে বিশেষ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত গম্ভীর গলায় বললেন—"রাজকুমারী সিংহাসনের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারিণী। এই সংবাদ একান্ত গোপনীয় রাখতে হবে।"

জো যখন ফিরে এল তখন সেই ক্লান্ত মেয়েটি গভীর ঘুমে মগ্ন। বিছানায় শুয়ে পড়ল ব্রাডলী,—জান্‌লো না সেই মুহূর্তে সমস্ত সংবাদপত্রে এ্যামবাসী থেকে স্পেশাল বুলেটিন পাঠানো হ'ল, "হার হাইনেস প্রিন্সেস এ্যান সহসা অসুস্থ হওয়ায় সব কার্যক্রম বাতিল করা হ'ল…"

পরদিন সকালে এলার্ম ঘড়ি বেজে গেল তবু জো ব্রাডলীর ঘুম ভাঙে না, অবশেষে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বলে—"এই রে—প্রিন্সেসের সঙ্গে ইণ্টারভিউ—এগারটা পঁয়তাল্লিশ!"

এইটুকু শুনে পাশের কাউচ থেকে মেয়েটি চাপা গলায় বল্‌ল—"চুপ!" অন্যমনস্ক ভাবে বেরিয়ে যায় ব্রাডলী, মন ভালো নেই, এখনই গিয়ে নিউজ এডিটার হেনেসীকে ইণ্টারভিউ সম্পর্কে একটা মনগড়া কাহিনী শোনাতে হবে।

সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে পৌছতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনেসী প্রশ্ন করল—"কি হে একেবারে ইণ্টারভিউ সেরে এলে নাকি?"

জো তাকে আশ্বস্ত করে বলে—"এই তো ফিরছি।" তার পর রঙ ফলিয়ে রাজকুমারীর গুণগান করে। অবশ্য ঠিক কি রঙের গাউন পরেছিলেন মনে নেই।

হেনেসী বলল, "চমৎকার বিবরণ।" তার পর গম্ভীর গলায় বললে—"কিন্তু রাজকুমারী কাল রাত তিনটে থেকে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সব কার্যসূচী বাতিল হয়ে গেছে।" রোমের সমস্ত প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইন দিয়ে তারই সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রের সেই প্রথম পৃষ্ঠায় জো সবিস্ময়ে একটি মাত্র বস্তু দেখল—সেটি রাজকুমারীর ছবি!—তার ঘরের কাউচে যে মেয়েটি ঘুমে অচেতন—

সেই প্রি ন সে স্!

হেনেসী বলে ওঠে—"প্রিনসেস্! বেশ ভালো করে দেখে নাও। আবার কোনো দিন দেখা হবে হয়ত। ভয় নেই তোমার চাকরী যাবে না, চাকরী যখন যাব তখন আর তোমার কথা বলার সময় থাকবে না।"

জো'র ভঙ্গীতে কেমন একটা চাঞ্চল্য। সে প্রশ্ন করে, "রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রকৃত বিবরণের জন্য কত টাকা পাওয়া যেতে পারে? রোমের বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে রাজকুমারী এ্যানের গোপন ও অন্তরঙ্গ ইনটারভিউ এবং তার সচিত্র বিবরণ?"

হেনেসী বল্‌ল—"যে কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান এর জন্য চার-পাঁচশো টাকা দিতে পারে। কিন্তু ব্রাডলী এই উদ্ভট ইনটারভিউ তোমার হবে কোথায়? রাজকুমারী আজ রোগশয্যায়, আগামী কাল এথেন্স চলে যাবেন।"

জো চলে যাচ্ছিল সেই সময় হেনেসী বলে উঠল—"আমি একটা বাজী ধরছি—আরো পাঁচশ টাকা, এই ইনটারভিউটি তুমি কখনও আনতে পারবে না।"

জো বলল—"এই বাজী আমি জিতব, আর সেই টাকায় নিউইয়র্ক যাওয়ার এক পিঠের ভাড়া হবে।"

রাজকুমারী তখনও ঘুমে অচেতন। জো অতি মৃদু পায়ে বাসায় ফিরে কোমল কণ্ঠে বলল—"ইওর হাইনেস—"

বালিসে মাথাটা নড়ল—রাজকুমারী, "আঃ ডাঃ বনাকোভেন! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম রাস্তায় শুয়ে আছি, একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ এলেন, বেশ বলিষ্ঠ এবং লম্বা চেহারা, আর লোকটা যে কি"—ঠোঁটের ডগায় হাসি ফুটে উঠল রাজকুমারীর—"চ ম ৎ কা র!"

এতক্ষণে চোখ মেলে জো'র মুখের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী প্রশ্ন করল—"আমি এখন কোথায় বলতে পারেন?" তারপর এই ঘরটি জো ব্রাডলীর বাসা এই কথা শুনে দীপ্ত ভঙ্গীতে রাজকুমারী বলে ওঠে—"আমাকে এখানে আপনি জোর করে এনেছেন?"

চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জো ব্রাড্‌লীর, সে বলে ওঠে—"না, ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে।"

"তাহলে, এইখানে, আপনার সঙ্গে সারারাত কেটেছে?"

মাথা নেড়ে ব্রাডলী বলল—"ঠিক ঐ কথাগুলি বলা যাবে কি না জানি না, তবে কতকটা সেইরকম বটে।"

এতক্ষণে রাজকুমারী হাসলেন, মাপা হাসি নয়, রীতিমত আনন্দের হাসি। ব্রাডলীকে অভিবাদন জানালেন রাজকুমারী, প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে জো প্রশ্ন করে, "আপনার নাম কি ?"

রাজকুমারী ইতস্ততঃ করে বলে—"আমার নাম এ্যানিয়া। ক'টা বেজেছে এখন ?"

একটা বেজে গেছে শুনে রাজকুমারীর মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল, সহসা সে বলে ওঠে—"আমাকে কিন্তু এখনই যেতে হবে।"

জো বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাডোভিচকে ফোন করে জানালো, বিশেষ জরুরী ব্যাপার, ফটো তুলতে হবে, তাড়াতাড়ি এসো।

আরভিং রাডোভিচ্ বলল—"আমি বড় ব্যস্ত, এখন যেতে পারবো না।"

জো ক্ষুণ্নমনে ঘরে ফিরে এল। রাজকুমারীর সাজসজ্জা শেষ হয়েছে। রাজকুমারী বললে—"আমি শুধু আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার অপেক্ষায় বসে আছি।"

ব্রাডলী পৌঁছে দিতে চাইল, মেয়েটি ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—"আমি খুঁজে নেব'খন।"

মেয়েটী চলে যাবার পর জো বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখছিল; তারপর দৌড়ে নীচে গিয়ে বলল—"পৃথিবীটা অনেক ছোট।"

হেসে মেয়েটি বলল—"ভুলে যাবার চেষ্টা করব। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন ?"

গত রজনীর তাসের বাজীতে পাওয়া কিছু টাকা পকেটে ছিল—হাজার লায়ার (ইতালীয় মুদ্রা, ভারতীয় হিসাবে প্রায় সাড়ে সাত টাকা)—জো ব্রাডলী বলল—"এই টাকা আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাক্।"

কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই টাকা গ্রহণ করল রাজকুমারী, তারপর বলল, "টাকাটা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করব।" এই বলে রাজকুমারী পথে নামল।

জো বিদায় জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল না,—কিন্তু মোড়ের মাথায় মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গেই দ্রুত পদক্ষেপে তার পিছু নিল জো ব্রাডলী।

রাজকুমারী টাকাটা নিয়েছিল ট্যাক্সি ধরে এ্যামবাসী ভবনে ফেরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জীবনে সে কখনও একা বাইরে বেরোয়নি। তাই বাজার আর দোকান দেখে তার মাথা গুলিয়ে গেল। একটা চুলকাটার দোকানের

সামনে কেশ-প্রসাধনের বিভিন্ন ছবি দেখে লুব্ধ হয়ে ঢুকলো সেলুনে। সুদর্শন তরুণ নাপিত মেরিও তার চুলের প্রশংসা করে এবং সেই চুল ছাঁটতে চায় জেনে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়। কিন্তু চুল ছাঁটা শেষ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় মেরিও, একেবারে মোহিত হ'ল মেরিও। প্রিন্সেসকে আমন্ত্রন জানিয়ে বলে—"আজ রাতে নাচের আসরে এসো না—টাইবার নদীর ওপর বোটের ওপর—চাঁদের আলো, গান আর নাচ, রীতিমত রোমান্টিক পরিবেশ। তুমি যদি আসো চমৎকার হবে।"

রাজকুমারী ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—"না' আমার অন্য কাজ আছে।" মেরিও তবু অনুরোধ জানায়—বলে, "তবু যদি সময় করতে পারো।"

পথের ধারে আইসক্রীম কিনে একটা নির্জন সিঁড়ির ওপর বসে পরমানান্দে খাচ্ছিল রাজকুমারী। এমন সময় জো ব্রাডলী এসে হাজির। রাজকুমারীকে দেখে বিস্ময়ের ভাণ করে বলে—"আপনি যে! না আর কেউ!"

আগ্রহভরে চুলের দিকে ইঙ্গিত করে এ্যান প্রশ্ন করে—"কি পছন্দ হয়?"

ওর পাশে বসে পড়ে জো ব্রাডলী—"এই তাহ'লে আপনার জরুরী কাজ?"

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলে—"দেখুন, আমার একটি স্বীকারোক্তি করা প্রয়োজন, আমি কাল রাতে পালিয়ে এসেছি, স্কুল থেকে পালিয়েছি। দু'-এক ঘণ্টার জন্য বেরিয়ে এই বিপদ।" তার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ে বলে, "আমাকে এখন উঠতে হয়। একটা বরং ট্যাক্সি ডেকে নিই।"

"দেখুন—এক কাজ করুন, আর একটু সময় হাতে নিয়ে ঘোরা যাক, বরং একটু ছুটি নিন, এই ধরুন সারাদিনটা।"

ওর চমৎকার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যি এই ত' সে চেয়েছিল। সে বলে ওঠে—"আমিও ঠিক সারাদিন ধরে যা খুসী করে বেড়াব মনে করেছিলুম। পথের ধারে একটা কাফেতে বসা যাক্, কিংবা দোকানের জানালায় তাকিয়ে থাকি। কত মজা—কত আনন্দ!"

উৎসাহভরে জো বলে, "বেশ ত' দু'জনে মিলেই একটু ফুর্তি করা যাক্।" তার হাত দুটি ধরে জো বলে, "প্রথম ইচ্ছাপুরণ হোক, পথের ধারে কাফেতে বসা যাক্। কাছাকাছির মধ্যেই ত' রয়েছে **'Rocca'**।"

কাফেতে পাশিপাশি চেয়ারে বসে জো বলে—"স্কুলের মেয়েরা তোমার এই নূতন ধরণের ছাঁটা চুল দেখে কি বলবে ?"

সহসা মেয়েটি বলে ওঠে—"একেবারে মূর্চ্ছা যাবে, আর যদি শোনে আপনার ঘরে সারারাত কাটিয়েছি তাহলেই বা কি ভাববে !"

গম্ভীর গলায় জো বলে, "এক কাজ করুন, আমিও কাউকে বলবো না, আপনিও কাউকে সে সব কথা জানাবেন না।"

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই জো প্রশ্ন করে—"পানীয় হিসাবে কি নেওয়া হবে ?"

মেয়েটি বলল—"শ্যাম্পেন ! কদাচিৎ ও-জিনিষটা খাই, গেল বারে খেয়েছিলাম একটা সাম্বাৎসারিক উৎসবে, বাবার—বাবার চাকুরী পাওয়ার চল্লিশতম উৎসব।

জো হেসে প্রশ্ন করে—"কি কাজ করেন আপনার বাবা ?"

—"এই জন-সংযোগরক্ষার কাজ আর কি, যাকে বলে পাবলিক রিলেসনস্। আপনি কি করেন ?"

"এই কেনা-বেচার কাজ আর কি !" এমন সময় দূরে আরভিং আসছে দেখা গেল। তার বান্ধবী ফ্রানসেস্কার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। জো তাকে এক রকম জোর করে চেয়ারে বসিয়ে বলে—'এই হ'ল আরভিং রাডোভিচ আর ইনি অ্যানিয়া"—রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—"অ্যানিয়া স্মিথ্।"

উল্লাসভরে কি বলতে যাচ্ছিল রাডোভিচ,—পা দিয়ে আঘাত করে জো তাকে সতর্ক করে। তার পর তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, "সিগারেট লাইটারটা আছে ?" রাডোভিচের সিগারেট লাইটারের ভেতরে ক্যামেরা ফিট করা আছে। যার ছবি নেওয়া হয় সে কিছুই জানতে পারে না। জো বলে, "মেয়েটি জানে না আমারা কি করি, সুতরাং আমার সংবাদ কাহিনী আর তোমার ছবি একেবারে রাজযোটক।"

প্রথমটা প্রতিবাদ জানায় রাডোভিচ কিন্তু পরে যখন ভাবে চমৎকার 'স্কুপ' করা যাবে, তখন রাজী হয়।

দু'জনে টেবলে ফিরে এল, জো অ্যানকে একটি সিগারেট উপহার দেয়, রাজকুমারী বলে ওঠে—"জীবনে এই প্রথম ধূমপান।"

রাডোভিচের সিগারেট লাইটার জ্বলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ক্যামেরায় ছবি ওঠে।

ইতিমধ্যে সারা রোম নগরীতে অসংখ্য গোয়েন্দা রাজকুমারী এ্যানকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে রাজকুমারী কখনও এত হাসতে পারেনি, পারেনি এত আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে। প্রথমে একটা মোটর-বাইকে প্রমোদভ্রমণে বেরোল, পিছনে রাডোভিচ গোপনে ফটো তুলে চলেছে।

রাজকুমারীকে কিছুক্ষণের জন্য পুলিশ কোর্টে যেতে হয়। মোটর বাইকে আইনমাফিক বসেনি,—জো'র পরিচয়-পত্রে ওরা ছাড়া পেল। বিস্মিত এ্যান প্রশ্ন করে 'নিউজ সার্ভিস' সম্পর্কে, জো জবাব দেয়—"ও যা হয় একটা বললেই ছেড়ে দেয়। বিশেষ প্রেসের নাম করলে ত' কথাই নেই।"

সেই রাতে চন্দ্রালোকিত নৌকাবক্ষে নাচের আসরে এ্যানকে ওরা নিয়ে গেল! মেরিও এইখানেই নিমন্ত্রণ করেছিল। যে রাজকুমারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নেচেছে সেই নাচতে থাকে জোর সঙ্গে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। পরে মেরিও এসে নাচের আসরে যোগ দেয়, রাজকুমারী সেই নাপিতের সঙ্গেও নাচল।

ইতিমধ্যে পুলিসের গুপ্তচরে নদীবক্ষস্থিত সেই ভাসমান হোটেল ভরে গেছে। তারা সাদা পোযাকে এসেছে, কেউ তাদের চিনতে পারেনি।

একজন ডিটেকটিভ রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে বলে—"ইওর হাইনেস, এদিকে এসে নাচুন।"

রাজকুমারী তীব্র প্রতিবাদ জানায়—"ছেড়ে দিন আমাকে, মিঃ ব্রাডলী, মিঃ ব্রাডলী, দেখুন!"

জো দৌড়ে আসে, ডিটেকটিভদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ সুরু হয়, রাজকুমারীও এই হট্টগোলের ভিতর ডিটেকটিভ-দলনে অগ্রণী হয়ে ওঠে। পুলিসকে কাবু করে ওরা বেরিয়ে আসে বাইরে।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। জো'র বাসায় এসে পৌছল দু'জনে। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছে রাজকুমারী, রেডিওতে লঘু সঙ্গীতের সুর বাজছে। সহসা বিশেষ ঘোষণা শোনা গেল—

"রাজকুমারী এ্যানের রোগশয্যা থেকে আর কোনও নতুন সংবাদ নেই।

এতদ্বারা গুজবের সৃষ্টি হয়েছে, হয়ত তাঁর অবস্থা খারাপ। সারাদেশে এই কারণে উদ্বেগের সীমা নেই। রাজকুমারী…"

মুখখানি কাগজের মত শাদা হয়ে গেল রাজকুমারীর। তাড়াতাড়ি রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে বলে—"আমাকে এইবার যেতে হবে।" তার চোখে জল, প্রসারিত বাহু মেলে তাকে ধরতে যায় জো ব্রাডলী, বলে—"অ্যানিয়া তোমাকে কিছু বলার আছে—"

তায় গালে কোমল ঠোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে রাজকুমারী বলে—"না আমাকে এখনই যেতে হবে।"

বাসা থেকে বেরিয়ে গেল, উভয়ের মুখে এতটুকু কথা নেই, অসীম নীরবতা। এই স্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে না-বলা বাণীর গভীর আকুলতা। অবশেষে অতি মৃদু গলায় রাজকুমারী বলে ওঠে—"এখন তোমাকে ছেড়ে যাব, ঐ মোড়ের মাথায় নেমে যাব, তুমি গাড়িতেই থাক, প্রতিজ্ঞা করো আমার দিকে লক্ষ্য করবে না! আমি যেমন তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তুমিও আমাকে সেই রকম ছেড়ে দাও।"

ওকে বাহুপাশে বাঁধে জো ব্রাডলী, কয়েকটি নিশ্বাসবিহীন মুহূর্ত। কিছুক্ষণ দু'জনে ভুলে যায় পারিপার্শ্বিক জগতের সংবাদ। তারপর সহসা তার বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সজল চক্ষে রাজকুমারী গাড়ি থেকে নেমে যায়…

মোড়ের মাথায় মিলিয়ে যাওয়ার আগে আর একবার পিছন ফিরে চায় রাজকুমারী, মুখে তার দীপ্ত হাসির ভঙ্গিমা, এত মধুর হাসি জো আর দেখিনি। বিগত চব্বিশ ঘণ্টার আনন্দ, প্রেম, ও চাঞ্চল্য—জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এ্যামবাসীতে ফেরার পর রাষ্ট্রদূত বললেন: "আপনার কর্তব্যবোধ বড় কম রাজকুমারী!"

মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গিতে এ্যান জবাব দেয়—"কর্তব্যজ্ঞান যদি না থাকত, স্বদেশের এবং জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত না থাকতাম, তাহ'লে আজ আর এভাবে ফিরতাম না ইওর একসেলেন্সী।"—তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কোন দিনই হয়ত আর ফিরতাম না!"

উত্তেজিত ভঙ্গিতে সম্পাদক হেনেসী জো'র ঘরে এসে প্রশ্ন করে—"কই হে তোমার সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ-বিবরণী কই?"

শান্তগলায় জো জবাব দেয়—"কোনও কাহিনীই নেই।"

এই সময় অজস্র ফটো নিয়ে আরভিং ঘরে এল—হেনেসী ছবিগুলি দেখতে চায়; আরভিংও প্রায় দেখাতে যাচ্ছিল: কিন্তু জো ব্রাডলী তাঁর হাত থেকে খামটা নিয়ে বলে "এ সব একটা নাচের ছবি।"

হেনেসী রেগে চলে যাওয়ার পর বিস্মিত আরভিং বলে, "ব্যাপার কি? আর কেউ কিছু বেশী দেবে নাকি?"

আরভিং রাডোভিচকে খাম ফেরৎ দিলে বললে জো ব্রাডলী,—"এই ছবির সঙ্গে কোনও কাহিনীই আর নেই।"

এতক্ষণে বুঝলো ফটোগ্রাফার রাডোভিচ,—সে বলল, "বুঝেছি—কিন্তু রাষ্ট্রদূতের নিমন্ত্রণে যাবে না, রাজকুমারীর প্রেস কন্‌ফারেন্স?"

প্রেস কন্‌ফারেন্স, এত কঠিন প্রেস কন্‌ফারেন্স আর জীবনে আসেনি এ যে রোদন-ভরা প্রেস কন্‌ফারেন্স! এ্যামবাসীর অভ্যর্থনা-গৃহে রোমের সমস্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক উপস্থিত। রাজকুমারী এ্যান ধীর-গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রবেশ করলেন।

"হার রয়্যাল হাইনেস!" সবাই সে দিকে তাকায়।

সব সাংবাদিকের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে মধুর ভাবে হাসল রাজকুমারী। সিংহাসনে বসার পর চারদিক থেকে প্রশ্নবাণ সুরু হয়। বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিশ্বশান্তির প্রসঙ্গ, একজন প্রশ্ন করল, "আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?"

জো'র দিকে চোখ রেখে রাজকুমারী বললে, "এ বিষয়ে আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, যেমন শ্রদ্ধা আছে মানবিক মৈত্রীতে!"

এক জন প্রশ্ন করলে, "এত দেশ ভ্রমণ করলেন, কোন্ দেশ ভালো?"

রাজকুমারী বলল—"সবই ভালো, তবে রোমের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। সারা জীবন মনে থাকবে।" প্রশ্নোত্তর শেষ হ'ল, সবাই ক্যামেরা উঠিয়ে ফটো তোলে। তার পর সাহসিক গলায় রাজকুমারী বলে ওঠে, "আমি এইবার সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করব।"

মঞ্চ থেকে নেমে রাজকুমারী একে একে সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'ল ও করমর্দন করল। আরভিং সেই ফটোভর্তি খামখানি রাজকুমারীকে উপহার দেয়, বলে, "আপনার রোম-ভ্রমণের ছবি!"

ধন্যবাদ দিল রাজকুমারী। সাধারণ সৌজন্যসূচক প্রাণহীন উক্তি নয়।

জো'র সামনে এসে দাঁড়ালো রাজকুমারী। এবার অগ্নিপরীক্ষা, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, এ কি দুস্তর বাধা!

জো বলে—"আমি আমেরিকান নিউজ সার্ভিসের জো ব্রাডলী।"

রাজকুমারী বললে—"বড় আনন্দ হ'ল মিঃ ব্রাডলী!"

অতি কষ্টে কথাগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, রাজকুমারীর সংযত ভঙ্গিতে তা ধরা পড়লো না।

অতি ধীরে ধীরে আবার মঞ্চে ফিরে গেল রাজকুমারী। সারা সভাকক্ষ করতালি-মুখরিত। চমৎকার হেসে রাজকুমারী সেই অভিনন্দন গ্রহণ করল। অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ দৃষ্টি আর একবার জো ব্রাডলীর মুখে পড়ল, তার পর এ্যামবাসাডারের দিকে তাকিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করল।

মন্দিরের শেষ তীর্থযাত্রীটির মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল জো ব্রাডলী। রাজকুমারীকে ঠিক এই ভাবে জীবন থেকে কি সে মুছে দিতে পারবে? ভুলতে পারবে বিগত চব্বিশ ঘণ্টার এই বিরহ-মিলন-কথা?

সজল চোখে সেই শূন্যকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় জো ব্রাডলী।

পাথরের মূর্তির মত প্রহরীরা তার এই বিহ্বল ভঙ্গি লক্ষ্য করে।

ধীরে ধীরে এসে পথে দাঁড়ালো ব্রাডলী।





জেমস জোনস

ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি

জুন মাসের মাঝামাঝি বার্ট লী প্রিউইট ফোর্ট সাফ্টারের বিউগিল্কোর ত্যাগ করল। ওকে কর্তৃপক্ষ পার্ল হারবারের কাছে স্কোফিল্ড ব্যারাকস্ এ বদলী করলেন।

একদিকে ভালো হল, আবার সেই হাস্যময়, উদ্দাম প্রকৃতির এঞ্জেলো ম্যাগিওর সঙ্গে কাজ করা যাবে। তা ছাড়া ওখানে আর একজন বিউগিল বাদক ওর উপরওলা। মন্দের দিকে ক্যাপ্টেন ডানা হোমস্। রেজিমেণ্টের বক্সিং দলের শিক্ষক হিসাবে হোমস চান একটা শক্তিশালী দল গড়তে। প্রথম দিনেই প্রিউকে বলা হয়েছিল সে যদি বক্সিং দলে যোগ দেয় তাহলে আবার তাকে কর্পোরাল পদে উন্নীত করা হবে। প্রিউ কিন্তু আর বক্সিং করতে চায় না,—হাওয়াই অঞ্চলে আর্মি মিডলওয়েট হিসাবে তার খ্যাতি ছিল—কিন্তু বছর খানেক আগে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে, তার ফলে বেচারী ডিক্সী ওয়েলস্ আজ অন্ধ, সেই দিন থেকে প্রিউ তার মুষ্টিযুদ্ধের সরঞ্জাম তুলে রেখেছে চিরদিনের জন্য, আর সে কোনোদিন হাতে দস্তানা পরবে না।

হোমস্ তবুও জেদ করে বলেছিলেন—"এক জন মারা গেলে তুমি হয়ত বলবে যুদ্ধ থামাও। আমাদের প্রোগ্রাম অনুসারেই মানুষের মনোবল সব চেয়ে সহজে বাড়ানো যায়। আমার দলে একজন বিউগিল-বাদক আছে, ঐ চাকরীটা কেমন লাগে?"

প্রিউ দৃঢ়গলায় বলে—"না,—তার অর্থ যদি বক্সিং লড়া হয়, তাহ'লে বলব আমি আর বক্সিং লড়াই চাই না।"

কাপ্তেন হোমস্ গর্জন করে বলে ওঠেন—"বেশ আমরা অবশ্য তোমাকে জোর করে কিছু করাতে চাই না।"

জোর? জবরদস্তি? দৃঢ়চিত্ত মিলট ওয়ার্ডেন আরো স্পষ্ট করেই বলে—"তোমাকে লড়তেই হবে প্রিউইট, কাপ্তেন হোমস চান মেজর হোমস হ'তে। ওঁর ধারণা যদি একটা শক্তিশালী দল গড়তে পারেন তাহ'লেই মেজরত্ব লাভ করবেন। আমার কাজ ওঁকে খুসী রাখা। বুঝলে?"

ওয়ার্ডেন ঠিকই বলছিল; এর ফলে এখানকার 'ব্যবহারে'র বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে প্রিউকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে।

তবু কোনো মতে দৃঢ়ভাবে নিজের জেদ বজায় রেখেছিল প্রিউ। সে একদিন বলল: "ওয়ার্ডেন, যদি তুমি মনে করে থাকো এইভাবে যন্ত্রণা দিয়ে আমাকে বক্সিং দলে ভেড়াতে পারবে, তাহলে তুমি ভুল বুঝেচ। তুমি বা তোমাদের ঐ ডিনামাইট মার্কা হোমস্ বা তোমাদের এই ব্যবহারে আমাকে টলাতে পারবে না।"

প্রিউ যা বলেছিল তা ঠিক।

মিলট্ ওয়ার্ডেন, আজীবন এই সেনাদলে কাটিয়েছে, প্রিউইটের মতো এমন জেদী মানুষ সে পছন্দ করে না, আর সবাই যা চাইছে প্রিউ তার বিরোধী এ ওয়ার্ডেনের ভাল লাগে না। ওয়ার্ডেন জানে ছেলেটিকে শেষ পর্যন্ত দুদিন আগে বা পরে, নতি স্বীকার করতেই হবে। শুধু এইটুকু না হলে, এত দিনে সে কাপ্তেন হোমস্কে সুপারিশ করে বেচারী প্রিউ'র যন্ত্রণা কিছু লাঘব করার চেষ্টা করত।

কারেন কাপ্তেনের স্ত্রী। ওয়ার্ডেনের কাছে, সে এক বিস্ময়, নিজের অজ্ঞাতসারে সে ক্রমে কারণের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রথম দিন সামরিক ছাউনিতে তাকে দেখা অবধি এই অবস্থা হয়েছে। মেয়েটির সম্পর্কে নানাবিধ কলঙ্ককাহিনী জানা সত্ত্বেও ওয়ার্ডেন তাকে ভালো না বেসে পারেনি।

খুব সম্প্রতি ওয়ার্ডেন তার সঙ্গে দিন-ক্ষণ স্থির করে মেলামেশা করতে সুরু করেছে, বিশেষতঃ যে সব দিনগুলিতে কাপ্তেনের অপর কোনো রমণীর সঙ্গে হনলুলু বারে থাকার কথা।

ক্রমে ওয়ার্ডেন জানতে পারে কি কারণে কাপ্তেন-পত্নী কারেণ এই পথ ধরেছে। কাপ্তেন ডানা হোমস্ ওদের বিয়ের গোড়ার দিন থেকেই ব্যাভিচারী। যে রাতে কারেণের শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে রাতে অন্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে হোমস্ শহরে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে মত্ত। শিশুটি মৃত অবস্থায় জন্মালো, কারণ তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয় এমন কেউ ছিল না। এই ব্যাপারে তিক্ত ও বিষাক্ত হল তার মন। তাই ভুল পথে সে চলেছে বছরের পর বছর। তার পর এই হাওয়াই দ্বীপে ওর সঙ্গে ওয়ার্ডেনের দেখা……

এর পর—

ওয়ার্ডেনের জীবনে কারেণই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সৈনিক-জীবনের চাইতেও গুরুত্বপুর্ণ। কাপ্তেন ডানা হোমস্‌কে এমন ঘৃণা করে যে আজকাল প্রতিদিন প্রভাতী অভিবাদন জানানোর যান্ত্রিক কর্তব্যটুকুও তার কাছে ক্লেশকর হয়ে উঠেছে।

না, ও কোন বিরোধের মধ্যে যাবে না, এমনকি প্রিউইটের মত অমন সোনার চাঁদ ছেলেটির জন্যও নয়। হোস্‌মকে সে সুখী রাখবে, এবং সন্দেহমুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে।

যত দিন যায় প্রিউইটের প্রতি অত্যাচারও বেড়ে চলে, তবু সে বক্সিং লড়বে না কিছুতেই। শুধু প্রিউইটের বন্ধু ম্যাগিও তার দুঃখ একটু বোঝে বলে মনে হয়।

ম্যাগিও বলে—"ধরা দিওনা ভাই, তোমার মনের ভাব আমি বুঝি, যেন একটা ক্ষুদে বাক্সের ভেতর তোমাকে চাবি দিয়ে রেখেছে ওরা। আর বাইরে সারা জগৎ হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।"

ম্যাগিও একদিন ওকে টেনে নিয়ে গেল শহরের পানশালায়। সেদিন মাইনের দিন, মাইনে পাওয়ার পর ম্যাগিও ওকে বেসামরিক-পোষাক পরিয়ে 'নিউ কন্‌গ্রেস' ক্লাবে নিয়ে গেল। এই ক্লাবের সদস্য ম্যাগিও নিজে।

যে-স্ত্রীলোকটি এই ক্লাবের মালিক তার নাম মিসেস্ কিপফার, মহিলাটি রীতিমত ভদ্র এবং দক্ষিণ-আমেরিকা-বাসিনী। প্রিউ চার ডলার দিয়ে ক্লাবের

সদস্য হ'ল। সৈনিক আর নাবিকে সারাটি ক্লাব ভর্তি। এক ব্যক্তি একটি পিয়ানোর ওপর শক্তি-পরীক্ষা করছে সজোরে, তার নাম সার্জেণ্ট জুডসন, ওরা তার নামকরণ করেছে ফ্যাট্সো অর্থাৎ মোট্কু। সানড্রা বলে একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে ম্যাগিও নাচতে গেল, প্রিউ রইল একা।

সে দেখল কাউচে একটা মেয়ে একা বসে আছে, কি একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। আশ-পাশের কলরব যেন তাকে স্পর্শ করছে না। মেয়েটি সুশ্রী, বেশ সুন্দরী বলা চলে। প্রিউ সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে বলে—"আপনি কি খুব ব্যস্ত নাকি?"

ওর মুখের দিকে ডাগর চোখ দুটি মেলে মেয়েটি বলে ওঠে, "আমার নাম লোরেণ।"

ওর পাশে বসে পড়ে কথা বলে যায় প্রিউ।

মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বলে,—"আমার তোমাকে ভারী ভালো লেগেছে, এ্যানেট যখন তোমাকে ঘরে নিয়ে এল তখনই আমার চোখে লেগেছে।"

এই কথায় মনের সকল অন্ধকার ঘুচে গেল, প্রিউ আগ্রহ ভরে বলে ওঠে—"আমারও সেই অবস্থা, ঐখানে তোমাকে দেখেই ত' তাই এগিয়ে এলাম।"

ইতিমধ্যে "মোটকু"র সঙ্গে ম্যাগিওর তর্ক বেধেছে অত জোরে পিয়ানো বাজানো নিয়ে। প্রিউ উঠে গিয়ে ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করে—অনেক পরে সানড্রা আর প্রিউ ম্যাগিওকে এক রকম টেনে সরিয়ে নিয়ে আসে। রাগে গরগর করে ম্যাগিও, তারপর আবার নাচে যোগ দেয়। প্রিউ ফিরে এসে আবার লোরেণকে সন্ধান করে, সে তখন আর একজন সৈনিকের সঙ্গে বসে আছে।

একটু মুক্ত' হ'তেই লোরেণের কাছে এগিয়ে এসে প্রিউ রীতিমত কলহ সুরু করে।

তার এই ঈর্ষা-কাতরতায় বিরক্ত হয় লোরেণ, তবু মনে মনে একটু খুসীও হয়, বলে—"মিসেস্ কিপফার কি আমাদের মুখ দেখে মাইনে দেয়? এই সব ছোকরাদের কাছে মিষ্টি হয়ে থাকাটাই আমাদের কাজ, সেই জন্তেই আমাদের ভাড়া খাটানো হয়।"

প্রিউ তার মুখের পানে উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, "বেশ! আমার অন্যায় হয়েছে।"

লোরেণ বলে—"তার চেয়ে চলো মিসেস্ কিপফারের স্যুইটে যাওয়া যাক—সেইখানে বসাই ভালো। খুব বিশেষ ধরণের অতিথির জন্য উনি মাঝে মাঝে ঘরটা ছেড়ে দেন।"

মিসেস্ কিপফারের ঘরটি বেশ মনোরম, পরিবেশ চমৎকার। লোরেণের কাছ ঘেঁসে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাউচের ওপর বসলো প্রিউ।

কয়েক মিনিট পরে একটা বোতল হাতে এসে ঢুকলো ম্যাগিও। ঠাট্টা করে বললে—"আমি ধরেছি ঠিক,—বোতলটা তোমাদের কাজে লাগবে।" বোঝা গেল এর আগে দু'-চার পাত্র সে টেনেছে, প্রিউর সঙ্গে আর এক গ্লাস টেনেই সে নীচে গেল সানদ্রার সঙ্গে আবার নাচতে।

ও চলে যাওয়ার পর লোরেণ খুল্‌ল তার অতীত জীবনের কাহিনী। তার বাড়ি ওরিগন প্রদেশে। যেখানে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু সে আরেক জনকে বিয়ে করেছে। হাওয়াই দ্বীপে লোরেণ এসেছে অর্থের সন্ধানে। একদিন টাকা নিয়ে সে দেশে ফিরবে, সকলে চমকে উঠবে ওর ঐশ্বর্য দেখে।

প্রিউ শোনালো তার মনের কথা, ব্যথা ও বেদনা-ভরা দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস। মনের ভার অনেক কমলো—অন্ততঃ এই মুহূর্তে সৈনিক জীবনের গ্লানিকর নির্মম ব্যবহার সে ভুলে রইলো।

সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনের কাছেও মাইনের দিনটি একটি বিশেষ দিন। জনবহুল কুহায়ো পার্কের এক কোণে হোমস্-পত্নী কারেণকে খুঁজে বার করে সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেন। কারেণের সঙ্গে গাড়ি ছিল। ডায়মণ্ড হেডের কাছাকাছি একটা সমুদ্রতীর ওয়ার্ডেনের পরিচিত ছিল, গাড়ি চালিয়ে সেইখানেই গেল দুজনে, উভয়ে সাঁতার কাটলো একত্রে, তারপর বালির ওপর ওর বাহুলগ্ন হয়ে অনেকক্ষন শুয়ে রইল কারেণ।

মৃদু গলায় কারেণ এক নিঃশ্বাসে বলে যায়—"এমনটা যে হবে কোনোদিন ভাবিনি। তোমার মত এমন করে কেউ আমাকে কোনোদিন চুমায় চুমায় এমন আকুল করেনি।

এই কথাটিতে ওয়ার্ডেন বোঝে কারেণের জীবনে আরো অনেক পুরুষের পদক্ষেপ ঘটেছে। সব কাহিনী যদি সত্যি হয় তাহলে কারেণ বহুজনধন্যা।

চিন্তাকুল কণ্ঠে ওয়ার্ডেন বলে—"হয়ত সমুদ্রতীরে এমনই আরো অনেকেই এসেছে।"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কারেণের মধুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, সে শুধু বল্‌লো—"যে কথা কোনো দিন কাউকে বলিনি আজ তোমাকে হয়ত তাই বল্‌বো।"

তারপর তিক্তকণ্ঠে আরো বলে—"এ কাহিনী তোমাদের ব্যারাকে গিয়ে খোসগল্প করে আর পাঁচজনকে শুনিয়ো।"

সব কথাই বলল কারেণ। তার দুশ্চরিত্র স্বামীর কাণ্ড। তার মৃতজাত শিশু—আর তার পরবর্তী বন্ধ্যাত্ব!

রাগে ও অনুরাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়ার্ডেন তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে। কারেণ কাঁদছে, কিন্তু সমুদ্রগর্জনে তার কান্নার আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

নীরবে আরো কয়েক সপ্তাহকাল প্রিউইট সামরিক ব্যারাকের অত্যাচার সইলো। মাঝে মাঝে সে যেন তার বিউগিলের করুণ স্বর শুনতে পায়, তার ফলে তার মনে বেদনার সঙ্গে কিছু বিষাদ মেশানো আনন্দও জাগে।

ইতিমধ্যে কাপ্তেন একেবারে দানব হয়ে উঠেছেন। প্রাইভেট প্রিউইটকে বক্সিং দলে যে কোন উপায়ে নামানোর জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। কর্পোরাল বার্কলে প্রিউকে একদিন সতর্ক করে দেয় কাপ্তেন হোমার এবং বক্সিং দলের দু'-একজন সুবিধে পেলে ওকে ঠাণ্ডা করে ছাড়বে, ব্যারাকের বন্দিশালায় পুরে জব্দ করবে। বন্দিশালার কর্তা সেই মোটকু জুড্‌সন, আর অতি বীভৎস তার পৈশাচিক দণ্ডদানের প্রথা।

ওদের বক্সিং দলের থর্ণহিল, হেন্‌ডারসন, উইলসন আর গালোভিচ্ প্রভৃতি বক্সারবৃন্দ হোমসের হুকুম অনুসারে প্রিউইটের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে তুললো। একদিন গালোভিচের অত্যাচার সহের সীমানা ছাড়িয়ে গেল, প্রিউ সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু কাপ্তেন ওকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হুকুম দিলেন। কিছুতেই সে হুকুম যখন প্রিউইট মান্‌লো না তখন কাপ্তেন হোমস্ একজন পথচল্‌তি নন কমিসনড্ অফিসরকে ডেকে হুকুম দিলেন—

"কার্পোরাল পালুসো,—এই লোকটিকে ভারী বুট্, হেল্‌মেট আর পুরো বোঝা দিয়ে বেশ করে মার্চ করাও। তারপর একটা বাইসিকলে চড়িয়ে অনেক্ষণ ধরে যাতায়াত করাও।"

যে পথে যাওয়ার হুকুম হ'ল সে পথ অতি বন্ধুর এবং চড়াই আছে, রৌদ্রের

তেজ অতি প্রখর। সত্তর পাউণ্ড বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে সেই পথ ধরে প্রিউ শাস্তি ভোগ করে। পালুসো ওকে বিশ্রাম করতে বলে একটা সিগারেট দেয়, এমন সময় কর্ণেল উইলসন জিপে চড়ে সেই ধারে যাচ্ছিলেন, কৌতূহলবশে এই নিদারুণ দণ্ডের কারণটা কি তিনি জানতে চাইলেন।

পালুসো বলল্—"অবাধ্যতা, কাপ্তেনের হুকুমে এই দণ্ড হয়েছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কর্ণেল বললেন—"তোমাদের দলের নাম কি?"

"কম্পানী জি, ২১৯ নং স্যার!"

কাপ্তেনের দপ্তরে ফেরার পর হোমস আবার এক দফা ক্ষমা প্রর্থনা করতে বললেন। পুনরায় দৃঢ়ভাবে সে হুকুম অমান্য করলো প্রিউ। উত্তেজিত কাপ্তেন আবার সেই ভাবেই মার্চ করানোর হুকুম দিলেন। ওয়ার্ডেনকে কোর্ট মার্শেল করার কাগজপত্র তৈরী করতে আদেশ দিলেন। ওয়ার্ডেন বল্‌ল, "কিন্তু, প্রিউকে এখনও হয়ত বক্সিং করতে রাজী করানো যাবে।" এই বলে সে তখনকার মত কাপ্তেনকে ক্ষান্ত করলো।

পিক্‌দানি পরিষ্কার, পিতলের জিনিসপত্র প্রভৃতি পালিশ করতে হ'ল প্রিউকে। অত্যাচার বেড়ে চলে,—এখনকার অত্যাচারের তুলনায় আগের অত্যাচার যেন বিশ্রাম। তবু অনমনীয় রইলো প্রিউইট। সার্জেণ্ট মিলট ওয়ার্ডেন প্রিউইটের এই দৃঢ়তা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করলো।

একদিন এক চৈনিক বীয়ার দোকানে প্রাইভেট ম্যাজিওলী প্রিউটকে উপদেশ দিল ইনস্‌পেকটর জেনারেলের কাছে অভিযোগ জানাতে। প্রিউ বললো—"আমি অভিযাগ করতে চাই না ওদের নামে, আর বক্সিং করেও আনন্দ দেব না।"

সেইদিন সন্ধ্যায় 'মোটকু' জুডসনের সঙ্গে ম্যাগিওর রীতিমত এক ঝগড়া বেধে গেল। টেবলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মোটকু ম্যাগিওর বোনের সাঁতারের পোষাক পরা এক ফটো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একটা জঘন্য উক্তি করে বসলো। ম্যাগিও ওর মাথার উপর একটা চেয়ার ভাঙলো, মোটকু পকেট থেকে ছোরা বার করলো।

নিশ্চিত খুনোখুনী থেকে ওদের বাঁচালেন সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেন। ওয়ার্ডেন বোধ করি শয়তানেরও ভয় রাখে না।

সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"যত সব খুনে বদমায়েসের দল। আমি তোমাদের

একটা ভালো মেয়েমানুষ জুটিয়ে দেব!” অন্ততঃ সাময়িক ভাবে অবস্থা শান্ত হলেও মোটকুর চোখ জ্বলতে লাগল। আর ম্যাগিওর মুখখানি শাদা হয়ে গেছে।

ঝোঁকের মাথায় মোটকুর হাত থেকে খসে-পড়া ছুরিটা তুলে নিয়ে প্রিউ সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনকে অনুসরণ করে ছুরিটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য। সার্জেণ্ট কিন্তু ছুরিটা ওর কাছেই রাখতে বলল।

করুণ গলায় ওয়ার্ডেন বলে—“তোমার বড় কষ্ট যাচ্ছে, না খোকা?”

প্রিউ শুধু বল্‌ল—“ওরা না হয় মেরেই ফেলতে পারে, খেতে ত' আর পারবে না?”

“একটা সাপ্তাহান্তিক পাশ তোমাকে দেব, নেবে?”

সাপ্তাহান্তিক পাশ। তৎক্ষণাৎ লোরেণের কথা মনে পড়ে যায়।

প্রিউ ভেবেছিল ম্যাগিওর সঙ্গে যাবে, কিন্তু বাস যখন ছাড়ো ছাড়ো,—তখনও ম্যাগিওর পোযাক পরা হয়নি, সুতরাং প্রিউ একাই হনোলুলু গেল। সেদিন নিউ কনগ্রেস ক্লাবে ওর কিন্তু দুঃখের কারণ ঘটলো।

শ্রীমতী কিপফার—আগের মতই আনন্দময়ী ও ভদ্র। কিন্তু লোরেণ যেন সহসা পরিবর্তিত হয়েছে। হিকাম ফিল্‌ড্ থেকে অনেক সৈনিক আগে থেকেই এসেছে, তাদের নিয়েই সে ব্যস্ত। লোরেন বলল ওর কাজই হ'ল পাঁচ জনকে আপ্যায়িত করা। “তুমি কি চাও তোমাকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে অভ্যর্থনা জানাতে হবে? আমি এখানে কাজ করি, সেটা জানো ত? তুমি ত' ক' সপ্তাহ এদিকে মাড়াওনি। এখন কি আশা করো—?”

“ম্যাগিও একটু পরেই আসছে, এখন একটু বেরিয়ে পড়া যায় না?'

“বেরোব বল্‌লেই কি বেরোন যায়, জান না, মিসেস কিপফারেরও আইন-কানুন আছে?”

প্রিউর চোখ দুটো জ্বলছে, সে লোরেণকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলে: “ছোট ছেলে যেমন ক্রিসমাসের দিকে তাকিয়ে থাকে আমিও তেমনি এই দিনটির জন্য তাকিয়ে আছি। আর কয়েক মাসের মধ্যে হয়ত ছুটি মিলবে না। যাক্ গে, সে কথা ভেবে আর কি হবে, লোরেণের কাজ আছে, লোরেণ ব্যস্ত, তাকে আইন মেনে চলতে হয়।”—

উত্তেজিত হয়ে লোরেণ চীৎকার করে ওঠে—“থামো, থামো! আমাকে তুমি কি হিসাবে লোরেণ বলে ডাকো? আর ডেকো না! আমার নাম—

আসল নাম আলমা, আলমা বার্ক।" সে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আবার বলে, "মিসেস কিপফার একটা ফরাসী সুগন্ধির নাম থেকে ওটা বেছে নিয়ে আমার নামকরণ করেছে, তাঁর ধারণা ওতে বেশ ফরাসী আমেজ আছে।"

কিছুক্ষণ পরে আলমা মিসেস কিপফারকে শরীর অসুস্থ বলে ছুটি নিয়ে ওয়াইকিকি বারে চললো। সেখানে ম্যাগিওর জন্য অপেক্ষা করছিল প্রিউ। আলমা (এখন আর লোরেণ বলা চলে না) সেনা-ব্যারাকে প্রিউর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনে সমবেদনায় জ্বলে ওঠে। প্রিউ তাকে সৈনিক-জীবনের রহস্যময় কাহিনী বলে চলে।

সে বলে, "মানুষ যদি কিছু ভালোবাসে তাহলে সে অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। যখন সতের বছর বয়স তখন বাড়ি ছেড়েছি, বাবা-মা দুই তখন নেই। আমার তাই তিন কুলে কেউ নেই। সেনাদলে যদি না থাকতাম তাহ'লে কোনো দিনই হয়ত বিউগিল শিখতাম না। আর্লিংটন কবরখানায় 'আর্মিসটিস ডে'র দিন আমাকে বাজাতে বলে। প্রেসিডেন্ট সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

কয়েকমিনিট পর ম্যাগিও বদ্ধ মাতাল অবস্থায় এসে হাজির, গায়ে তার সামরিক পোষাক। শোনা গেল ওকে ব্যারাকে আটকে রেখে আর কার বদলীতে ডিউটি দিয়েছিল। সুতরাং বিনা ছুটিতেই এসে পড়েছে।

সে আনন্দভরে চেঁচায়, "ঐ ত',—ওদিকে রয়্যাল হাওয়াইয়ান, ঐখানে সব সিনেমা ষ্টাররা থাকে! আজ ভাই সাঁতার কাটার রাত, চমৎকার রাত!"

বন্ধুর জন্যে প্রিউর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। চিত্রতারকাদের সঙ্গে স্নান ও সাঁতার কাটার জন্য ম্যাগিও যখন ব্যাকুল, অন্ধকার পথে তার সঙ্গে প্রিউকেও যেতে হয়। ব্যাপারটি বুঝে আলমা প্রিউকে তার সঙ্গে যেতে বলেছিল।

ম্যাগিও জামা খুলে ফেলেছে—প্রিউ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় জিপ গাড়িতে এক জোড়া মিলিটারী পুলিশ সেই পথে এসে পড়ল। কোথায় লুকিয়ে পড়বে, না, ম্যাগিও তাদের সামনে গিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। প্রিউ-র আর কিছুই করার রইল না।

•

ম্যাগিও'র কোর্ট মার্শালের ফলাফল জানার জন্য সমগ্র সেনাদল আগ্রহান্বিত। ওয়ার্ডেন যখন শাস্তির ফলাফল জানালো তখন দেখা গেল সবাই যা আশংকা করেছিল তাই হয়েছে, ছ' মাস সামরিক জেল। কে যে এই

বন্দিশালার পরিচালক সবাই জানে, সেই শূকরাক্ষ মোটকু জুড্সন, তার হাতে আবার ছুরি থাকে।

সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনও চিন্তিত হতেন যদি তার নিজেরও যথেষ্ট ব্যক্তিগত উদ্বেগ না থাক্তো। কারেণের সঙ্গে তাঁর নোঙরা এক পানশালায় মেলামেশা ঘটতো। সেখানে অন্ততঃ কাপ্তেন হোমসের পরিচিত কোনো অফিসার থাকবার কথা নয়। কখনো কোনো দল এলে ওরা তাড়াতাড়ি পালাতো পিছনের দোর দিয়ে। ভয় এবং অপমান ওদের নিরন্তর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তার ফলে অন্তরের ভাবাবেগ অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম।

প্রিউর ভাবনা ম্যাগিওকে নিয়ে, সে তবু অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। আলমা আর তার বন্ধু জর্জেট ডায়মণ্ডহেডের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। প্রিউর এই দুঃখের সাহারায় সে এক মরুকানন বিশেষ, তাই সামরিক বিধির উৎপীড়নের ফলে সে এখনও ভেঙে পড়েনি। এই বাসাটিতে বই আছে, কিছু গ্রামোফোন রের্কডও আছে, আর আছে শান্ত নৈঃশব্দ্য। আলমা একটা অতিরিক্ত চাবী তৈরী করিয়ে ওকে দিয়েছে, যে কোন সময়ে প্রিউ তাই আসতে পারে, আলমা বাসায় না থাকলেও কোনো বাধা নেই।

প্রিউ এদিকে এই ভাবে শান্তিতে সন্ধ্যা যাপন করছে আর ওদিকে ওয়ার্ডেন আর কারেণের প্রেমলীলা প্রায় চুরমার হতে বসেছে।

একদিন গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে কারেণ বলে—"এই ভাবে আর চলে না—"

ওয়ার্ডেন মাথা নেড়ে বলে, "তোমার স্বামী হয়ত তোমাকে ডিভোর্স করতে পারেন কিন্তু আমাকে কি এখান থেকে বদ্‌লী করবে?"

কারেণ বলে—"একটা উপায় আছে,—তোমাকে অফিসার হ'তে হবে। কমিশন্ পেলে তোমার পক্ষে সব সম্ভব হবে। তোমাকে ওরা তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও বদ্‌লী করবে, আমিও ডানা হোমসের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারব।"

"অফিসর?" মাথা নেড়ে ওয়ার্ডেন বলে—"আমি নিজে চিরদিন অফিসারদের ঘৃণা করে এসেছি,—তা ছাড়া পরীক্ষাগুলোও কঠিন। তা ছাড়া—"

চটে উঠে কারেণ বলে—"সত্যি কথাটাই বলো না! কোনো দায়িত্ব-ভার নিতে চাও না। হয়ত আমাকে ভালবাসো না—"

ওয়ার্ডেন ধীর গলায় বলে—"তোমাকে ভালো না বাসলে হয়ত ভালই করতাম। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে যন্ত্রণায় আছি তা কি বলব! আমি যদি অফিসার হই তা' হলে সেনাদলের অতি বেয়াড়া অফিসারই হ'ব।"

সে সময় ঋতুটা হয়ত প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে তেমন অনুকূল ছিলনা। কারেণ ডানা হোমসের সঙ্গে ডিভোর্স চায়, হোমস রাজী হ'ল না, কারণ তার ফলে তার প্রমোশনের সুযোগ নষ্ট হবার সম্ভাবনা। কিন্তু কারেণ যখন কিছুতেই স্বীকার করলো না তার জীবনের এই নূতন অতিথিটি কে, কি তার নাম, তখন ডানা হোমস্ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার দাম্ভিকতা আহত হ'ল। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

এদিকে প্রিউ যখন আলমার কাছে থাকে, শান্তিতে থাকে, সে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানালো। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো আল্‌মা, এই প্রস্তাবে, সে প্রত্যাখ্যান করলো। বল্‌লে—"তুমি কি জান না নিউ কন্‌গ্রেস ক্লাবের মেয়ে আর আর ফুটপাথের মেয়ের মধ্যে মাত্র তুটি ধাপের তফাৎ।

প্রিউ আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বলল—"আমি সামান্য প্রাইভেট মাত্র। এমন কিছু উঁচুতলার হোমরা-চোমরা নই। আমি যদি সার্জেণ্ট হই তাহলে হয়ত আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে বদলী করবে ওখানে কয়েক জায়গায় বিবাহিত সৈনিকের আলাদা ব্যারাক আছে, যেমন "জেফারসন ব্যারাকস"।

তোমার এই কাপ্তেন হোমসের কাছে তুমি সার্জেণ্ট হওয়ার আশা রাখো?"

দাঁতের উপর দাঁত চেপে প্রিউ বলে উঠে—"বক্সিং লড়লেই আমার প্রমোশন হবে।"

"না ওদের অত্যাচারে এ ভাবে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না প্রিউ, আজ আমাদের পরস্পরকে অতি প্রয়োজন, কিন্তু আমি সৈনিকের স্ত্রী হ'তে চাই না। আমার এই পরিকল্পনা থেকে কেউ আমাকে হটাতে পারবে না। তবে এক বছর। এক বছর সময় তেমন কিছু নয়। এক বছরে আমি আমি অনেক টাকা সঞ্চয় করতে পারবো। দেশে ফিরে আমার আর মার জন্য একটা বাড়ি করবো 'একটা কন্‌ট্রি ক্লাবে কাজ নেব, গলফ্ খেলব। তখন নিশ্চয়ই উপযুক্ত অবস্থার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাব। তখনই উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারব। ঠিক অবস্থায় থাকলেই ত' নিরাপত্তা।"

তিক্ত অথচ সপ্রশংস কণ্ঠে প্রিউ শুক্‌নো গলায় বলে—"বেশ, তবে তাই হোক, তোমার আশা সফল হোক্।"

ওর মুখের দিকে সকরুণ ভঙ্গীতে তাকায় প্রিউ, যেন সে এইবার কেঁদে ফেল্‌বে সে শুধু বলে—"কিন্তু এ কথাও সত্য বলে জেনো তোমাকেও আমি হারাতে চাই না, তার কারণ আমার নিঃসঙ্গতা। হয়ত ভাবছ আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি, তাই না ?"

আলমা উত্তরে বলে "লোকে নিজেই যখন বলে, আমি নিঃসঙ্গ তখন তার ভিতর মিথ্যার আর কি আছে ?"

বন্দিশালার ভেতর থেকে নানা রকম গুজব বাইরে এসে পৌছায়, যাদের শাস্তির সময় শেষ হয় তারা বাইরে এসে নানাকথা বলে। ওদেরই একজন, প্রাইভেট নেয়ার এসে খবর দিল মোটকু জুড্‌সন ম্যাগিওর ওপর ভারী অত্যাচার করছে, লাথি মারছে, ম্যাগিও তেমনি মোটকুর মুখে থুতু ফেলেছে।

উদ্বেগে আকুল হয়ে প্রিউ বলে—"তোমার কি ধারণা এর ফল ভালো হবে ?"

নেয়ার জবাবে বলে, "হট্টগোল একটা হ'তেও পারে। মোটকু দু'বার ওকে সেলের ভেতর আটকেছে, আর ম্যাগিও বলে ও ঠিক পালাতে পারে। আমাকে ত' বলেছে একদিন লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

মনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রিউ প্রচণ্ড রোদের ভেতর ঘাস ছিঁড়ছিল। এদিকে সর্দারি করছিল সেই গালোভিচ্, সে আরো খাটাতে চায়, এক কাজ বার বার করানোর জন্যে চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত ভারী মিলিটারী বুটটা কর্মরত প্রিউ বেচারীর ক্ষতবিক্ষত হাতের ওপর সজোরে চাপিয়ে দিলো গালোভিচ। জ্বলন্ত চোখে প্রিউ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"বেশ, এইবার তোকে ঠাণ্ডা করবো ?"

গালোভিচ সার্ট খুলে ফেলে, সেও একজন পাকা কসাই, হাতের পেশী তার মাংসল ও সুদৃঢ়। যাকে সে ঘৃণা করে তার মাথা সে সহজেই কাটতে পারে। প্রিউ কম যায় না, তার হাতের মার বেশ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

এদিকে গালোভিচও একজন শক্তিশালী যোদ্ধা।

একজন ভিড়ের থেকে বলে ওঠে—"প্রিউ ওর মুণ্ডুটা থেঁতো করে দিক !"

সার্জেণ্ট দোহম জবাবে বলে—"একবার প্রিউ একজনের চোখ নষ্ট করে দিয়েছে তাই ভয় পায়।"

গালোভিচ্ প্রিউর ঠিক চোখের উপর একটা আঘাত করল কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। ডিকসী ওয়ালেসের কথা মনে পড়ে প্রিউর। সে পড়ে যায়,—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের উপর গালোভিচের আঘাত এসে পড়ে। অতি কষ্টে উঠে পড়ে, প্রিউ ওর পেটে একটি ঘুঁসি বসিয়ে দেয়, লোকটা যন্ত্রণায় কাতরায়। ওপরের বারান্দায় একজন মেজর আর একজন কাপ্তেন দাঁড়িয়ে এই লড়াই দেখছিলেন।

কাপ্তেন হোমসের মুখে খুসীর হাসি,—জনতার ভীড়ে মিশে তিনিও হাততালি দিচ্ছেন। প্রিউর ওপর এই অত্যাচার থামাবার দিকে আগ্রহ নেই। প্রিউ পড়ে গেল, গালোভিচ তাকে লাথির পর লাথি মারতে লাগল। উঠে পড়ে সহসা প্রিউর চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কঠিন আঘাত করল দুষমণের পেট লক্ষ্য করে, তারপর তার মুখের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলো। আবার রক্তপাত দর্শকগণ চীৎকার করে উঠলো।

গালোভিচ্ যন্ত্রণায় ছটফট করে। প্রিউ আবার তার মুখে আঘাত করলো। গালোভিচ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কাপ্তেন হোমস্ এতক্ষণে চীৎকার করে বলে—"বহুৎ আচ্ছা! এইবার কিন্তু খেল খতম।"

গালোভিচ্ ঘোঁত ঘোঁত করে বলে—"প্রিউইট আমার হুকুম মানতে চায়নি, উলটে লড়াই সুরু করেছে।"

একজন দর্শক বলে ওঠে—"প্রিউইটের কোনও দোষ নেই, ও নির্দোষ গালোভিচই সর্বাগ্রে গণ্ডগোল পাকিয়েছে।"

অবস্থাটা না বুঝে ডানা হোমস্ চার পাশে দেখতে থাকে,—সকলের মুখের এই একই কথার প্রতিধ্বনি। বিভ্রান্ত হয়ে কাপ্তেন হোমস্ শুধু বলে—"যাক গে, এ সব ভুলে, এখন যে যার কাজে যাও।"

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই মেজর আর কাপ্তেন তীব্র বিরক্তিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

যাক গে—'ব্যবহার' যাই হোক অত্যাচারের কথা ভুলে দলের এক জন হয়ে থাকাই ভালো। তাই সবাই যখন Choy's হোটেল বীয়ার টান্‌ছে, তখন প্রিউ বিউগিলে "Re-Enlistment Blues"-এর সুর বাজালো। সকলেই মহা খুসী। সানন্দে সবাই বীয়ার টানে।

একদিন রাতে হঠাৎ সার্জেণ্ট ওয়ার্ডেনের সঙ্গে প্রিউর দেখা হয়ে গেল,—পথের মাঝে একেবারে বুদ্ধমূর্তির মতো যোগাসনে বসে আছে ওয়ার্ডেন।

ওকে দেখেই হুকুম করে—"হল্ট্ ! কি হে খোকা ! এখানে কি ?"

যথেষ্ট বিনয় সহকারে প্রিউ বলল—"একটু মদ্যপান করতে চলেছি।"

আবার হুকুম—"সিট ডাউন,—বসো, আমার কাছেই বোতল আছে।"

প্রিউ বন্ধুর মত ওয়ার্ডেনের পাশে বসে পড়ে আকণ্ঠ পান করে বলে, "ধন্যবাদ !"

"ধন্যবাদ তোমাকেই দেব ! যে ভাবে গালোভিচটাকে ঠাণ্ডা করেছ সেদিন, বাহাদুরী আছে তোমার। জীবনটাই আজ জটিল হয়ে উঠেছে, জানো ত' ? আচ্ছা একটা ট্রাক এসে যদি আমাদের চাপা দেয় কেমন মজা হয় ?"

প্রিউ সবিস্ময়ে বলে—"মজার মধ্যে আমরা মারা যাব, কিন্তু তোমার কি হবে সার্জেণ্ট ? আমাদের সেনাদল দেখবে কে ?"

এদিকে বৃষ্টি পড়ছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই।

ওয়ার্ডেন প্রিউকে বলে—"এত সব জ্বালায় জড়িয়ে আছি, ভালোবাসার কথাই ধরো—মেয়েটা আমাকে বলে কি না,—বলে তোমাকে অফিসার হতে হবে। আমি অফিসার হলে কেমন হবে ?"

প্রিউ বলে—"তুমি একজন ভাল অফিসার হবে।"

Choy হোটেলের সঙ্গীতের স্বর ভেসে আসছে। একটা জীপ গাড়ির আলো এসে পথে পড়লো, ঠিক এই সময়েই ব্যারাক থেকে একটা সাইরেণ ধ্বনিত হ'ল। এই সাইরেণের অর্থ বন্দিশালা থেকে কেউ পালিয়েছে।

সহসা সেই প্রকাশ্য রাজপথে ম্যাগিও এসে দাঁড়িয়েছে, জামা কাপড় মলিন ও ছিন্ন,—জিপের হেডলাইটের আলোয় ম্যাগিওর বেদনা-ক্লিষ্ট অত্যাচার-জর্জরিত আকৃতি দেখা যায়।

প্রিউর দিকে তাকিয়ে সে বলে—"ভাবলুম, তুমি হয়ত Choy হোটেলে থাকবে,—দেখো যা বলেছিলাম, তাই করেছি, ঠিক পালিয়েছি বাবা, অনেক কায়দা করে পালিয়েছি।"

চিন্তিত প্রিউর নেশা ছুটে গেছে, সে ওকে ধরে বলে—"এঞ্জেলো এ কি হয়েছে ভাই তোমার শরীর, এত দাগ কিসের ?"

হাঁফাতে হাঁফাতে ম্যাগিও বলে—"মোটকুর অত্যাচার ! দশ বার আমাকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে।"

ম্যাগিও প্রিউর বাহুতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

ওয়ার্ডেন উঠে এসে দাঁড়িয়ে ম্যাগিওর দেহটা দেখে বলে—"প্রিউ—ওকে শুইয়ে দাও,—ও আর নেই! মারা গেছে।"

অদূরে অন্ধকারে সাইরেণ আর্তনাদ করছে—বন্দী পলাতক, তারই সংকেত।

সেই রাতে একটা বিউগিল সংগ্রহ করে বন্ধুর মৃত্যুতে অতি সকরুণ সুর বাজালো প্রিউ। সেই চন্দ্রালোকিত প্রান্তর যেন এক বুকফাটা কান্নায় ভরে গেল। সমগ্র ব্যারাকের যে যেখানে ছিল বিছানা ছেড়ে এসে নীরবে সেই সকরুণ বাঁশীর আওয়াজ শুনলো।

সেই রাতে নিউ কনগ্রেস ক্লাবের দিকে গেল প্রিউ। বাইরের জানলায় দাঁড়িয়ে মোটকুর সেই হাতুড়িপেটা পিয়ানোর সুর সে শুনলো। তারপর মোটকু জুডসন বেরিয়ে আসতেই প্রিউ চেঁচিয়ে উঠল—"হ্যালো মোটকু!"

সেই অন্ধকারপথে সার্জেণ্ট এগিয়ে এল, একটা বিপদের সম্ভাবনা সেও হয়ত ভেবেছে। কলহের সম্ভাবনায় সে কাছে এসে বলে, "কি হে, খুব যে সাহস, কি বল্‌ছ?"

"তুমি ম্যাগিওকে খুন করেছ, তোমার একটুকরো মাংস আমার চাই।" মোটকু তৎক্ষণাৎ ছুরি বার করলো। তৈরী প্রিউ, সেও ছুরিটা বার করে। এই ছুরিই সেই প্রথম কলহের রাত্রে মোটকুর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, ওয়ার্ডেন সেটা ওকেই উপহার দিয়েছিল। প্রিউ সেটা সযত্নে রেখেছিল।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে মোটকু জুডসনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—সে শুধু বলল—"আমাকে কেন খুন করলে? আমি তোর কি করেছি?"

এর পর আর প্রিউ ব্যারাকে ফিরলো না, সোজা আলমার বাড়ি চলে গেল।

ওয়ার্ডেন প্রথমটা প্রিউর এই অনুপস্থিতি গোপনে রেখেছিল। আর আহত প্রিউ জানল না যে দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে—

"সার্জেণ্ট জুডসনের আততায়ী আজও নিখোঁজ।"

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১

জাপানীরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলছে।

বেতারে তার বারবার ঘোষণা শোনা গেল।

আহত দুর্বল প্রিউ এই কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারে না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, সবাই ক্ষয় ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করছে, আর জাপানীদের অভিশাপ দিচ্ছে—যুদ্ধের সংবাদ প্রিউইটকে আকুল করে তুললো।

আলমা 'ব্লাড ব্যাংকে' রক্তদান করে ফিরে এল। উত্তেজিত প্রিউ বলে—আমি কোম্পানীতে ফিরে যাব, দু'-এক দিনের ভিতর আবার আসব।

আল্‌মা সবিস্ময়ে বলে, "সে কি? কোম্পানীতে ফিরবে কি, তুমি ত' পালিয়ে আছ, তোমাকে বন্দিশালায় আটক করবে।"

—"আমি যাব, ওরা নিশ্চয়ই আমার ব্যবস্থা করবে।"

আল্‌মা কাঁদে, বলে, "ওরা বুঝবে তুমিই খুনী। শাস্তি হবে।"

—"একবার ত' ফিরি, সব ঠিক হয়ে যাবে!"

আল্‌মা বলে—"না যেও না, আর তোমাকে ফিরে পাব না, আমি জানি আর তোমার দেখা পাব না—"

এক মুহূর্ত ওকে নিবিড় বাহুর বাঁধনে ধরে প্রিউ দোর খুলে বেরিয়ে পড়ে—সে ছুটলো সেনা-ব্যারাকের দিকে। রাতের সেই অন্ধকারে—সেনাদল চেঁচায়—হল্‌ট্! হল্‌ট্!

প্রিউ বলে—"আমি সোলজার।" সৈন্যদল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেনগান গর্জন করে উঠল।

আহত প্রিউর দেহ ঘিরে সব সৈনিকেরা দাঁড়ালো। মিলট ওয়ার্ডেন নতুন কাপ্তেনকে বলল—"এ আমাদেরই পুরানো সৈনিক এতদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সৈনিক হিসাবে কিন্তু এর মত নির্ভীক আর সাহসী দেখা যায় নি।"

সেদিন বিউগিল বাজালো স্বয়ং ওয়ার্ডেন। সুরজ্ঞান তেমন তাঁর নেই, তবু তিনি মনে মনে জানেন একজন সৎ সৈনিকের উদ্দেশ্যেই আজ বিউগিল বাজালেন।

সেই সঙ্গে পড়ল চোখের জল।



ও হেনরী

চোর

ছিঁচকে চোর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তাডাতাডি জানালাব ফাঁক দিে ঢুকে পডল।

বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি, এই অঞ্চলে ভদ্রপবিবাবই থাকেন। বাডিব দরজায় কাঠেব ফলক, দেওয়ালের আইভিলতা অনেকদিন ছাঁটা হয়নি। ছিঁচকের মনে হল গিন্নী এখন হয়তো সমুদ্রতীরের কোনো বাড়ির বারান্দায় বসে কারো সঙ্গে গল্প করছেন। যাঁর সঙ্গে গল্প করছেন তিনি ভদ্র, হৃদয়বান ব্যক্তি, মাথায় তাঁর জলবিহারের টুপী। গিন্নীমা হয়তো বলছেন, আমাকে কেউ চিনলে না, বুঝলে, না।

তেতলায় আলোগুলো দেখে এবং সময় বিবেচনা করে মনে হল গৃহস্বামী এতক্ষণে ঘরে এসেছেন এবং আলোটা নিভিয়ে এখনই বিছানায় গা এলিয়ে দেবেন। কালটা সেপ্টেম্বর, যখন মনটা চায় শান্তি, স্বস্তি।

ছিঁচকে চোর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিল। দেশলাইয়ের আলো তাব মুখে প্রতিফলিত হল, সেই আলোতেই বেশ বোঝা গেল যে, চোরটি তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ছিঁচকে চোর।

এই তিন নম্বরের ছিঁচকে চোররা তেমন মর্যাদা পায়নি এখনো, সমাজে তাদের আসন এখনও নির্ধারিত হয়নি। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চোরদের

পরিচয় পুলিস থেকেই দিয়ে দিয়েছে, তাদের একটা বিশিষ্ট ধরন আছে। গলায় রুমাল বাঁধার কায়দাটা দেখলেই তফাৎটা বোঝা যায়।

ছিঁচকে চোরের গলায় যদি ঐ রুমালটুকু না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে একেবারে থার্ড ক্লাস। তবে এরা ভীষণ বদমাস, একেবারে শয়তান। ওদেরই একজন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে এক বিটের সিপাইয়ের পকেট থেকে হাতকড়া চুরি করে পালিয়েছিল। ছিঁচকে চোরদের আরেকটা দল গলায় রুমাল বাঁধে, ওদের বলা হয় 'র‍্যাফেলস্'। দিনে তারা বেশ ছিমছাম ভদ্রলোক, চমৎকার কোট-প্যাণ্ট, ভালো রেস্তোরাঁয় খানা-পিনা করে, যেন একেবারে ভদ্রলোক। আসলে অবশ্য রাতে ছিঁচকে চুরি করাটাই ওদের পেশা। ওদের মায়েরা সব বেশ ধনী। থাকে সবাই ভদ্রপল্লীতে। যদি একবার জেলে আটক পড়ে তখন বলে নেল কাটার দাও, নখ কাটবো। পুলিস গেজেট দাও পড়বো। দেশে দেশে ওদের ঘরবাড়ি। খবরের কাগজে বিয়ের সংবাদ বেরোয় ওদের।

আমাদের এই ছিঁচকে চোরটার গায়ে নীল রঙের সোয়েটার। আংটিটা তেমন দামী নয়, আবার নেহাৎ সস্তাও নয়। এর শ্রেণী-বিভাগ করতে পুলিসকে হিমসিম খেতে হবে। এমন ভদ্র চেহারার সাদাসিধে ছিঁচকে চোর দেখা যায় না—ঠিক যেমন তার অবস্থা তেমনই এসেছে। প্রসাধন-পারিপাট্য নেই। তাই সে ধনীও নয়, নির্ধনও নয়।

লোকটা চারদিক দেখছে, মুখে তার মুখোশ নেই, হাতে নেই আলো, পায়ে নেই রবারের শব্দহীন জুতো। পকেটে শুধু আছে আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার। আর মুখে চিউইং গাম।

ঘরের মধ্যের আসবাবপত্রগুলি ঢাকনা দেওয়া, যাতে ধূলা না পড়ে। রুপোর বাসন-কোসন বোধহয় পাশের ঐ সেফ ডিপোজিট ভল্টে রাখা আছে। ছিঁচকে চোরটার মনে এতটুকু উচ্চাশা নেই। আধো অন্ধকারে আধো-আলোয় ঘরের মালিক যেখানে শান্তিতে নিদ্রামগ্ন, সেই ঘরে ঢুকে যেটুকু হাতে পেলে কিছু লাভ হবে তাই নিয়ে সরে পড়বে সে, তার বেশী কিছু নয়। খুচরো টাকা-পয়সা, হাতঘড়ি, হয়তো পাথর-বসানো একটা টাইপিন—এমনই দু-একটা খুচরো জিনিস। যা তার পক্ষে বেমানান, যার দাম বেশী তা নেওয়ার লোভ নেই। তবে নেহাৎ জানলাটা খোলা। সেখানেই তো কর্তব্যের খাতিরে একবার এই ঘরে ঢোকা।

ঘরে মৃদু গ্যাস জ্বলছিল। গৃহকর্তা বিছানায় শুয়ে, ড্রেসিং টেবলে অনেক মালপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো। নোটের বাণ্ডিল, একটা ঘড়ি, চাবির থোলো,

নিভন্ত চুরুট, চুলে বাঁধবার লাল সিল্কের ফুল আর কোষ্ঠ-পরিষ্কারের একশিশি দাওয়াই। শিশিটা নতুন কেনা, ছিপি খোলা হয় নি এখনো।

সবে ড্রেসিং টেবলের দিকে পা পা এগিয়েছে, এমন সময় গৃহকর্তা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে এপাশ ফিরলেন। ডান হাতটা বালিশের তলায় ঢোকালেন, কিন্তু সেটা বার করার আগেই ছিঁচকে চোর বলে উঠল—

"সাবধান! এতটুকু নড়বেন না।"

প্রথম শ্রেণীর চোর হলে বলতো 'হিস্', এই বলেই চুপ করাতো। গৃহকর্তা কিন্তু ছিঁচকে চোরের পিস্তলটার দিকে বিহ্বল ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন।

ছিঁচকে আবার হুকুম করে—"হাত দুটো উপরে তুলুন।"

যে সব ডেনটিস্টরা দাঁত তোলার সময় ভয় নেই লাগবে না বলে, তাদের মুখে বেশ কায়দা করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি থাকে, এই গৃহকর্তারও দাড়িটা সেই জাতের। আকৃতি দেখে মনে হয়, বেশ বলিষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। মুখ-ভঙ্গীতে মনে হয় বিরক্ত। বিছানায় উঠে বসে ডান হাতটা মাথার উপর তুললেন।

ছিঁচকে চোর হুকুম করে—"কি হল, ও হাতটাও তুলুন। আপনার দু হাতেই সমানভাবে গুলি চালানো অভ্যাস আছে কিনা কে জানে। তাড়াতাড়ি হাত তুলুন।"

ভদ্রলোক অতিশয় অসহায় মুখভঙ্গী করে বললেন—"ঐ হাতটাই তো তুলতে পারি না।"

—"কেন? ও হাতটায় আবার কি হয়েছে?"

—"সেই পুরানো বাতের ব্যথা।"

—"ফুলেছে নাকি?"

—"আগে ফুলেছিল। এখন আর ফোলাটা নেই, বেদনা আছে।"

ছিঁচকে চোর গৃহকর্তার দিকে রিভলবারটি ধরে একটু চুপ করে রইল। ড্রেসিং টেবলের ওপরকার মালপত্রগুলির দিকে তাকাল, তারপর বিছানার ওপরকার ভদ্রলোকটির দিকে অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল।

গৃহকর্তা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—"চুরি করতে এসেছ, চুরি করে সরে পড়। ওরকম ইয়াকির ভঙ্গীতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকো না। যা নেবার—চটপট নিয়ে পালাও।"

শুনে ছিঁচকে চোরটি সবিনয়ে বলল—"বেয়াদপি মাফ করবেন, স্যার। আমার বাতের ব্যথাটাও এখনই যেন চাগাড় দিল। আপনার বরাত ভালো

যে আমিও বেতোরুগী। আশ্চর্য, আমারও ঐ বাঁ হাতেই বাত। আমি ছাড়া অন্য যে কোনো চোর হলে আপনি বাঁ হাতটা ঠিক যে মুহূর্তে তুলতে পারলেন না, সেই মুহূর্তে আপনাকে গুলি করে বসতো!"

গৃহকর্তা নরম গলায় বললেন—"তোমার ঐ বাতটা কতদিনের।"

—"বছর চারেক হবে। বেশী দিনের নয়। ও বাতে একবার ধরলে আর সারা জীবনে তার মুক্তি নেই।"

—"আচ্ছা র‍্যাটল সাপের তেল কখনো ব্যবহার করে দেখেছ?"

—"র‍্যাটল স্নেকের তেল পিপে পিপে দিয়ে দেখেছি। যত সব সাপের তেল লাগিয়েছি, সেগুলি জোড়া দিলে এখান থেকে শনিগ্রহ পর্যন্ত আট বার যাতায়াত করা যাবে।"

গৃহকর্তা বললেন,—"অনেকে আবার 'চিজেলামস্ পিল'ও খেয়ে থাকে।"

ছিঁচকে বলে—"একেবারে ফাঁকি, আমি পাঁচমাস খেয়ে দেখেছি, কিছুই হয় না। এক বছর কিং কেলহামস্ একসট্রাকট, বাম অফ জিলেড-পুলটিস্ আর পটসের পেন-পালভারাইজার নিয়মিত ব্যবহার করে ভালোছিলাম। তবে পকেটে আমি যে বাদাম রাখি, তা খেয়েও উপকার হতে পারে।"

গৃহকর্তা আবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, ব্যথাটা সকালের দিকে বেশী, না রাতে—কখন বাড়ে?"

ছিঁচকে জবাব দেয়—"রাত্তিরে, আর মজা এই, ঠিক ঐ সময়টুকুতেই তো আমার কাজের চাপ। আচ্ছা, এইবার আপনার হাতটা বরং নামিয়ে নিন। দেখুন, ব্লিকারস্টাফস্ ব্লাড-বিল্ডারটা কখনও কি ব্যবহার করেছেন?"

—"না, ওটা কখনো ব্যবহার করিনি। আচ্ছা তোমার ব্যথাটা কি থেকে থেকে চাগাড় দেয়, না, সব সময়ে লেগে আছে?"

রিভলবারটা হাঁটুর উপর রেখে ছিঁচকে বিছানার উপর বসে পড়ে বললে—"ব্যথাটা হঠাৎ শুরু হয়। ঠিক যে সময় হওয়ার কথাই নয় সেই সময়টা আরম্ভ হল। এই সব কারণে দোতলা বাড়িতে চুরির কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কয়েকবার মাঝপথেই আটকে গেছিলাম। তবে স্যার, একটা কথা জানবেন—ঐ ডাক্তাররাও জানে না, এ রোগ কি করে হয় আর কি দিয়ে সারে।"

—"কথাটা একেবারে খাটি। আমার মনের কথা বলেছ। আমি হাজার হাজার ডলার জলের মত খরচ করেছি। বলি, ফলটা কি হল? সারল? আচ্ছা, তোমারও ফোলে নাকি?"

—"ফোলে। সকালটায় ফোলে, বৃষ্টি হলেও ফোলে।"

—"আমারও ঠিক ঐ রকম। মনে করো ফ্লোরিডায় একটা মৌসুমী হাওয়া উড়লো, তা আমি ঠিক এখান থেকে বলে দেব। অনেক সময় থিয়েটার হলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে আর রক্ষা নাই। কনকনানি শুরু হবে।"

ছিঁচকে এতক্ষণে রিভলবারটি পকেটে রেখে ভব্যযুক্ত হয়ে বসল। বলল—"দেখুন, ঐ আপোভেলডকুটা ব্যবহার করে কি দেখেছেন ?"

গৃহকর্তা চটে উঠলেন—"আরে রামো! একেবারে ফাঁকি, ওর চেয়ে রেস্তোরাঁর ভেজাল মাখন খানিকটা গায়ে মাখা ভালো।" ছিঁচকেও তাঁকে সমর্থন করে বলল—"একেবারে খাঁটি কথা। এই সব বাজে জিনিসে আমাদের কিস্সু হবে না। আমি স্পষ্ট বলছি আপনাকে, ওসব ফক্কিকারি। একটি মাত্র ওষুধ আছে এর, ছোট্ট ওষুধ এবং আরামদায়ক। আঙুরের চনচনে রস একটু পান করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নিন, চলুন। জামাটা গায়ে দিয়ে নিন। হোটেলে গিয়ে একপাত্র টানা যাক। উঃ, আবার কন্ কন্ শুরু হল।"

—"গেল সপ্তাহ ভোর এমন হল, কারো সাহায্য ভিন্ন জামা-টামা পরতেই পারি না। টমাস, আমার চাকর সে-ই পরিয়ে দেয়, সে হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

—"আপনি উঠে বসুন, আমিই জামা পরিয়ে দিই বরং।" গৃহস্বামীর মনটা খুঁত খুঁত করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। বললেন—"না না, সে হয় না। সে বড় খারাপ দেখায়। তোমাকে আবার কষ্ট দেব!"

ছিঁচকে বললে—"এই নিন আপনার শার্ট। উঠুন। জানেন, আমার পরিচিত একটা লোক দু হপ্তা আম্বেরিস্ অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে এমন সেরে গেছে যে, এখন দু হাত ব্যবহার করে নিজেই পোশাক পরে।"

ঘর থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন হোটেলের পথে। গৃহকর্তা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালেন। বললেন—"টাকা নিতে যে ভুলে গেলাম। ড্রেসিং টেবলে টাকাটা পড়ে আছে।"

ছিঁচকে তাঁর হাত ধরে বাধা দিয়ে বলে—"আপনি চলে আসুন স্যার। টাকার কথা চিন্তা করবেন না। আমার কাছে আছে কিছু টাকা। তারপর টেবলে বসেই প্রশ্ন করে—আচ্ছা উইচহেজেল আর উইনটার-গ্রীনের তেল কখনো ব্যবহার করে দেখেছেন কি ?" বাইরে মৌসুমী হাওয়া বইছে।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

যৌবন-বেদনা



হর্টনস্ বে শহরে জিম গিলমোর নবীন আগন্তুক। ক্যানাডা থেকে এসেই সে বুড়ো হর্টনের কাছ থেকে তার লোহার দোকানটা কিনে নিয়েছিল। উৎকৃষ্ট ঘোড়ার নাল সে তৈরী করতে ও লাগাতে পারত। কিন্তু তাকে দেখে মনে হত না যে সে অত পরিশ্রমী। সুন্দর ভব্য আকৃতি। দোকানটার ওপরে সে থাকত আর স্মিথের বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করত।

এই বাড়ীতেই কাজ করত লিজা কোট্‌স্। বিশালাকৃতি মিসেস্ স্মিথ—বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্না মহিলা—প্রায়ই বলেন যে লিজার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেয়ে তিনি কম দেখেছেন।

জিম লিজাকে লক্ষ্য করেছে। লিজার পা দুখানি ভারী সুন্দর। সব সময়েই সে ধবধবে আচকান গায়ে জড়িয়ে থাকে, পরিপাটি ভাবে তার মাথার চুল আঁচড়ানো। আর তার মুখখানাও জিমের ভালো লাগে: সদাই হাসিখুশী কিন্তু তাই বলে সে কখনো লিজার কথা ভাবে না। তেমন ভাবাবেগ নেই জিমের।

লিজার জিমকে ভালোই লাগে। একটু নয়, বেশ ভালো লাগে। জিমের চলার ভঙ্গী তার ভালো লাগে, বলে সে প্রায় রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসির কথা নয়, জিমের গোঁফজোড়াও লিজার পছন্দ। জিম যখন হাসে তখন তার সাদা দাঁতের সারি দেখে লিজা মুগ্ধ।

জিমকে যে আদপে কামারদের মত দেখায় না তার জন্য লিজার খুব ভালো লাগে। মিঃ স্মিথ এবং মিসেস্ স্মিথ যে জিমকে স্নেহ করেন তাতে লিজা খুশী। এক দিন সে আবিষ্কার করল যে জিমের হাতের উপরকার কালো লোমগুলোও তার ভালো লাগছে, আর তার অনাবৃত হাতের অংশের তুলনায় বাহুর যে অংশটা জামার ভিতর থাকে সেটুকু কি আশ্চর্য শাদা! এই রকম ভালো লাগায় লিজার কেমন আশ্চর্য মনে হয়! কেমন চমৎকার!

হর্টনস্ বে শহরে শুধু পাঁচখানা বাড়ী। তবে শহর বটে, একেবারে সদর রাস্তার ওপরেই—তার পারে বয়েন সিটি, অপর পারে শার্লে ভয়। সব রকম দোকানপাট ও ডাকঘর মিলিয়ে একটা বাড়ী এবং পরপর স্মিথ, ষ্ট্রাউড, ডিলওয়ার্থ, হর্টন এবং ভ্যান হুসেনদের বাড়ী—এই সব নিয়ে হর্টনস্ বে শহর। বাড়ীগুলোর চারদিকে দেবদারু গাছের সার, রাস্তায় আঁঠাল বেলেমাটির অংশ বেশী। রাস্তার দু পাশে উঁচু জমির ওপর আছে চাষের জমি আর কাঠ। তার ওপর দিকটায় আছে একটা মেথডিষ্ট চার্চ আর অন্য দিকে আছে শহরের ছোট্ট স্কুল। এই স্কুলটার সামনেই আছে লোহালক্কড়ের লাল রঙের দোকানটা।

পাহাড়ের গা বেয়ে একটা বেলেমাটির রাস্তা গাছগাছড়া ভেদ করে সোজা নীচে নেমে গেছে। স্মিথের বাড়ীর পিছনের দরজা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে জঙ্গলের সীমান্ত হ্রদের ধারে, উপসাগরের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে তা অত্যন্ত সুন্দর দেখায় আর উপসাগরটাকে নীল ও উজ্জ্বল মনে হয়। স্মিথদের এই দরজা থেকে লিজা প্রায়ই দেখে যে মালের নৌকোগুলো হ্রদের জলে ভেসে বয়েন সিটির দিকে এগিয়ে চলেছে। যখন সে দিকে তাকায় তখন মনে হয় যে নৌকোগুলো যেন চলছে না, কিন্তু ঘরের ভেতরে ফিরে গিয়ে কয়েকটা ডিশ ধুয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পায় যে সেগুলো অনেকটা এগিয়েছে। ভারী আশ্চর্য মনে হয় লিজার।

ইদানীং লিজা সব সময়েই জিম গিলমোরের কথা ভাবে। জিম তার দিকে নজর করে বলে মনেই হয় না। সে স্মিথের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে—দোকান, রিপাবলিকান পার্টি, জেমস্ ব্লেইন, আরো কত কী। সন্ধ্যাবেলায় বাইরের ঘরে বসে হয় সে 'টোলেডো ব্লেড' কিংবা 'গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিড্' খবরের কাগজ পড়ে। নয়তো স্মিথের সঙ্গে একটা জ্যাক লাইট নিয়ে হ্রদে মাছ ধরতে যায়। দিন কাটে এই ভাবে।

কিছুদিন পরে।

জিম, স্মিথ, এবং চার্লি ওয়াইম্যান একটা গাড়ীতে তাঁবু, কুড়ুল, রাইফেল এবং দুটো কুকুর নিয়ে দূরের পাইন বনে হরিণ শিকারে বেরোল। তারা যাওয়ার চারদিন আগে থেকেই লিজা এবং মিসেস্ স্মিথ তাদের জন্য খাবার তৈরী করছিল। সেই সময় জিমের জন্য বিশেষ কিছু তৈরী করার বড় আগ্রহ হয়েছিল লিজার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সে পারেনি। মিসেস্ স্মিথের কাছে বেশী করে ডিম ও ময়দা চাইতে সাহস হয়নি। আর কিনতেও ভরসা হয়নি তার—যদি রান্নার সময় মিসেস্ স্মিথ তাকে ধরে ফেলেন? হয়ত কিছুই হত না—আসলে ভয়ে ভয়েই শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি লিজা।

জিম চলে যাওয়ার পর যে কদিন কেটে গেল তার প্রতিটি মুহূর্তই লিজা জিমের কথা ভাবে। জিমের এই অনুপস্থিতি ক্রমশঃ যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে। জিমের জন্য ভালো করে ঘুম হয় না। কিন্তু তবুও এই কষ্ট গায়ে লাগে না। জিমের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়াতেও যেন আনন্দ আছে। জিমেরা ফিরে আসার আগের রাতটা লিজার অস্বস্তিতে কাটল। ঘুম এল না চোখে। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন এবং আধো ঘুম আধো জাগরনের মাঝখানে তার সারারাতটা কেটে গেল। পরদিন বিকেলে জিমদের গাড়ীকে যখন সে রাস্তা বেয়ে আসতে দেখল তখন আপনাকে কেমন দুর্বল মনে হল তার, মাথাটা ঘুরতে লাগল। জিমকে এক ঝলক না দেখা পর্যন্ত যেন সে স্থির হতে পারবে না, সুস্থবোধ করবে না, তার মনে হল যেন জিমকে দেখতে পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনই সারা অঙ্গে কেমন শিহরণ জাগছে।

গাড়ীটা এসে বড় দেবদারু গাছটার তলায় থামল। মিসেস স্মিথ ও লিজা বাইরে গেল। পুরুষ তিনটির এ কদিন দাড়ি কামানো হয়নি। শিকারের নেশায় উন্মত্ত ছিল। গাড়ীর ভেতরে তিনটে হরিণ পড়ে আছে, তাদের শীর্ণ পাগুলো গাড়ীর ধার থেকে বেরিয়ে আছে।

মিসেস স্মিথ তার স্বামীকে চুমু খেল, স্মিথ তাকে জড়িয়ে ধরে।

জিম লিজার দিকে তাকাল, হেসে বলল, "হ্যালো লিজ্"—লিজার মুখ চোখ চাপা আনন্দে রাঙা হয়ে উঠল।

জিম হরিণ তিনটে টেনে নীচে নামাল। তাদের মধ্যে একটা বেশ বড়। তা দেখে মেয়েদের চোখে প্রশংসা জাগে।

মৃদু হেসে লিজা প্রশ্ন করল, "ওটাকে বুঝি তুমি মেরেছ জিম?"

জিম মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ—হরিণটা বেশ সুন্দর দেখতে না ?"

সুন্দর দাঁত মেলে লিজা হাসল।

সেই রাতে চার্লি ওয়াইম্যান স্মিথদের বাড়ীতেই রইল। সে নিমন্ত্রিত। খাওয়াদাওয়ার পর সার্লেভয়তে ফিরে যাওয়া চলে না।

খেতে বসার আগে স্মিথ প্রশ্ন করল, "জিম, সেই জাগটার মধ্যে কিছু আছে নাকি ?"

"আছে—" বলেই জিম উঠে পড়ল'।

গাড়ীটার মধ্যেই জাগ্‌টা ছিল। তাতে পুরো চার গ্যালন হুইস্কী ধরে। ভরা না থাকলেও যা ছিল তার ওজন কম নয়। কিন্তু সেই ভারী জাগ্‌টাকে জিম সহজেই তুলে ধরে চুমুক দিল। বেশ কিছু গলায় ঢালে। মদ পড়ে তার সার্টের সামনের দিকটা একটু ভিজে গেল'।

যখন সে জাগ্‌টা নিয়ে ঘরে ফিরে এল তখন তাকে দেখে চার্লি এবং স্মিথ মুচকি হাসল।

লিজা তাদের তিনটে গেলাস এনে দিল। স্মিথ সবকটি গেলাসেই বেশ খানিকটা ঢালল।'

চার্লি স্মিথকে বলল, "তোমার সম্মানে পান করছি—"

স্মিথ বলল, "ঐ বড় হরিণটাকে স্মরণ করছি আমি—"

জিম তার গেলাস তুলে বলল, "আর যেগুলোকে সাবাড় করতে পারিনি, তাদের স্মরণ করছি।" এই বলেই সে গেলাসটা শেষ করল।

"আ হা"—

"সু ধা"—

"বছরের এই সময়টাতে এর চেয়ে সেরা আর কিছু পাওয়া যায় না।"

"আর এক পাত্তর হবে নাকি ?"

"হবে বৈকি।"

"আলবৎ হতেই হবে।"

"ঢাল' জোয়ান"—

"আগামী বৎসরকে স্মরণ করে"—

জিমের ভারী অদ্ভুত মনে হয়। হুইস্কীর স্বাদ আর প্রতিক্রিয়াটা খুব ভালো লাগল। ভালো মদ্য, উত্তম খাদ্য আর আরামদায়ক বিছানা—আঃ!

আর এক গেলাস পান করল, তারপর খেতে বসল'। বেশ নেশা হয়েছে তিন জনের, কিন্তু তবু তারা বেসামাল হল না।

টেবিলের ওপর সব খাবার সাজিয়ে দিয়ে লিজাও ওদের সঙ্গে খেতে বসল। খাবার ভালো হয়েছে। পুরুষেরা অস্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেইসব উত্তম খাদ্য চর্বণ সুরু করে।

খাওয়ার পালা শেষ হল। পুরুষরা আবার ড্রয়িংরুমে বসল। মিসেস্ স্মিথও লিজার সাহায্যে সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে ওপরে চলে গেল। তার মিনিট কয়েক বাদে মিঃ স্মিথও ওপরে গেল। জিম ও চার্লি তখনো বাইরের ঘরে বসে আছে।

রান্নাঘরে বসে রইল লিজা। উনুনের ধারে বসে, বই পড়বার ভাণ করে সে জিমের কথাই ভাবে, কান পেতে থাকে জিমের পদধ্বনির জন্য। এখনই ঘুমোতে রাজী নয় সে। কারণ জিম হয়ত এখনই বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের যাবে। সেই যাওয়ার সময়টিতে জিমকে এক নজর চুরি করে দেখে নেবে লিজা। সেই ক্ষণদর্শনের সুখস্মৃতিটুকু মনে নিয়ে সে বিছানায় গিয়ে শোবে।

জিমের সম্পর্কে লিজা যখন মনে মনে ভাবছিল ঠিক সেই সময়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এল জিম। তার মাথার চুলগুলো একটু অবিন্যস্ত, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল। তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে লিজা বইয়ের দিকে তাকায়।

জিম এসে তার পেছনে দাঁড়াল। তার নিঃশ্বাসের শব্দ লিজা শুনতে পায়। তারপরে সহসা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল জিম। জিমের হাতের নিপীড়নে তার স্তনবৃন্ত কঠিন হয়ে উঠে। ভয়ানক ভয় হয় লিজার। আজ পর্যন্ত তাকে কেউ আর স্পর্শ করেনি। বল-নৃত্যের ভঙ্গীতে জড়িয়ে ধরেছে জিম। মনকে সে প্রবোধ দিয়ে বলল, "এ যে আমার কাছে আত্ম-নিবেদন করতে এসেছে, আমার প্রেমের ভিখারী।"

ভীষণ ভয় হল লিজার, কি করতে হবে কিছু ভেবে না পেয়ে সে কাঠ হয়ে বসে। চেয়ারের পেছন থেকেই জিম তাকে চেপে ধরে, দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বনে তার ঠোঁট পুড়িয়ে দেয়। তীক্ষ্ণ, তীব্র ও বেদনাদায়ক অনুভূতি। অসহ্য মনে হয়। চেয়ারের পেছনে জিম, তবু যেন তাকে অনুভব করে লিজা। প্রথমে অসহ্য মনে হয়, তারপর কি যেন হয় শরীরের ভেতরে। একটা নরম ও উত্তপ্ত আবেগ তার সারা দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ওকে চায়, সেই মুহূর্তেই।

মৃদুগলায় বলল জিম, "চল—একটু বেড়িয়ে আসা যাক"—

দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলছিল কোটটা। লিজা সেটা টেনে পরে নেয়। তারপর দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে।

জিম ওকে একহাতে জড়িয়ে নেয়। বেলেমাটির রাস্তা, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়েই ওরা থামতে লাগল, পাগলের মত পরস্পরকে বুকে চেপে চুম্বন করে।

আকাশে চাঁদ নেই। ঘন গাছপালার ভেতর ছায়াঘেরা পথ। তারি ভেতর দিয়ে দুজনে চলেছে। রাস্তা শেষ হয়েছে হ্রদের ধারে পৌঁছে। সেখানে ডক, ডকের পাশে গুদামঘর। গুদামঘরের স্তূপীকৃত কাঠের গায়ে এসে জল আছড়ে পড়ছে। জায়গাটা অন্ধকার। একটানা, মৃদু জলের শব্দ।

বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু জিমের কাছে থাকার জন্য একটুও শীত করছে না, বরং শরীরকে আগুনের মত গরম মনে হচ্ছে লিজার।

গুদামঘরের অন্ধকার ছায়ায় বসে জিম লিজাকে আরো কাছে টেনে নেয়। লিজা কেঁপে উঠে। প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়। জিমের একটা হাত তার বুকের আবরণকে ছিন্ন করে তার স্তন দুটির ওপর খেলা করে, আর একটি হাত তার কোলের দিকে নামে। ভয় করে, জিম কি করবে তা কে জানে, তবু তার দেহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে চায় লিজা।

কোলের ওপর এতক্ষণ যে হাতটা মৃদু চাপ দিচ্ছিল তা পায়ের দিক থেকে হঠাৎ ওপরে উঠতে থাকে।

"না জিম, না"—লিজার মৃদু গলার অনুনয় শোনা গেল না।

জিমের হাত সচল।

"না জিম, কিছুতেই নয়"—

কিন্তু জিম বা জিমের হাত সে কথা শোনে না।

তক্তাগুলো কঠিন। জিম তার পোষাক খুলে ফেলেছে। লিজার ভীষণ ভয় ভয় করছে। তবু সে ওকে চায়।

"অমন কোরো না জিম—না, না"—

"না লিজা, শোন লিজা - এর প্রয়োজন আছে"—

"না, কোনো প্রয়োজন নেই—এ অন্যায়—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—থামো—জিম, জিম, উঃ"—

ডকের তক্তাগুলো ভারী কঠিন। অসমতল, নিপীড়ন করছে ওদের।

লিজার কষ্ট হচ্ছে। লিজা জিমকে ঠেলে দেয়। জিম ঘুমোচ্ছে। সে একটুও আর নড়ছে না, নড়বে না। জিমের দেহের তলা থেকে সে আপনাকে নিঃশব্দে মুক্ত করল। তারপর উঠে বসে, স্কার্ট এবং কোটকে গুছিয়ে নেয়, চুলটাকে ঠিক করে নেয়।

জিম ঘুমোচ্ছে। তার মুখটা ঈষৎ বিস্ফারিত। লিজা তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা চুমু খায়। সে তখনো ঘুমোচ্ছে। লিজা তার মাথাটা তুলে একটু ঝাঁকুনী দিল। সাড়া দেয় না জিম, মাথাটা এপাশ ওপাশ গড়িয়ে ঢোঁক গিলল।

লিজা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডকের প্রান্তে পৌছে সে জলের দিকে তাকায়। জলের ওপর কুয়াশা। ঘন কুয়াশা। ঠাণ্ডা। লিজার শীত করছে। ভারী দুঃখবোধ হয়। বিপন্ন মনে হয়। মনে হয় তার সব কিছুই যেন হারিয়েছে, চুরি গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

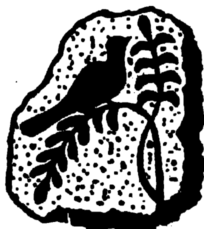
জিম শুয়ে আছে, সেখানে আবার গিয়ে তাকে ঝাঁকুনী দেয়। না, জিমের এতটুকু হুঁশ নেই। লিজার দু'চোখ বেয়ে প্লাবন নেমেছে।

"জিম—জিম, শুনছ জিম?"

জিম একটু সজীব হয়ে আবার বেশ কাঠ হয়ে শুল। লিজা নিজের কোটটা খুলে তার গায়ের ওপর চাপা দেয়। পায়ের তলায় জামাটা সযত্নে গুঁজে দিল। তারপর উঠে, ডক পার হয়ে বেলেমাটির রাস্তায় পা দেয়। এখন বাড়ী ফিরে যাবে সে। কিন্তু এই রাতে আর ঘুম কি আসবে তার?

পেছন থেকে ঘন কুয়াশা ধীরে এগিয়ে আসছে—

চারিপাশে কুয়াশার ঘনঘোর অন্ধকার।





আলবার্তো মোরাভিয়া

শিশু

আমাদের বাসায় এসে শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের মহিলাকর্মী সবাই যেমন প্রশ্ন করে সেই ভাবেই প্রশ্ন করলেন, আমরা এত বেশী সন্তানের জন্ম দিই কেন। আমার স্ত্রীর মেজাজটা সেদিন গরম ছিল। তাই তিনি একেবারে নির্জলা সত্য কথাটাই বলে দিলেন, 'পয়সা থাকলে আমরা রোজ সন্ধ্যায় সিনেমায় গিয়ে ছবি দেখতাম। তা পয়সা যখন নেই তখন কি আর করি। বিছানার আশ্রয় নিই, ছেলেপুলে এই ভাবেই আসে।'

এই মন্তব্য শুনে মহিলাটি বেশ বিব্রত হয়েই বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে গেলেন। আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বল্লাম, 'সব সময় এভাবে স্পষ্ট কথা বলা ভাল নয়। তাছাড়া, কথা বলার আগে কার সঙ্গে কথা বলছ তা বুঝে দেখ।'

আমার যখন বয়স কম ছিল, বিবাহ হয়নি, তখন খবরের কাগজের পাতায় স্থানীয় সংবাদ পাঠ করে আমোদ পেতাম। এই স্তম্ভে মানুষের জীবনে যা কিছু দুর্দশা ঘটা সম্ভব তার বিবরণ থাকত। যথা, রাহাজানি, খুন খারাবি, আত্মহত্যা, ঘটনা ও দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এ সব ঘটনার মধ্যে সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে 'মর্মন্তুদ ঘটনা' বলত, আমি ভাবতাম, অন্তত আমার ক্ষেত্রে তা কখনও ঘটবে না। কেউ এমন হতভাগ্য হতে পারে যে কোন বিশেষ দুর্ভাগ্যের জন্য নয়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য কোনও মর্মান্তিক ঘটনার পাত্র হয়ে দাঁড়াব, এ কথা ভাবা যেতনা। তখন আমার

বয়স কাঁচা, জানতাম না যে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করার অর্থ কি। এখন দেখি, ধীরে ধীরে আমি নিজেই একটা মর্মান্তিক ঘটনার পাত্রে পরিণত হয়েছি।

তখন পড়তাম, 'ওরা দুঃসহ দারিদ্র্যে দিন কাটায়।' আজ আমি সেই দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেই আছি। কিংবা পড়তাম, 'ওরা যেখানে বাস করে তাকে শুধু নামেই বাসা বলা চলে।' আমি বস্তির এক খাটালে আছি স্ত্রী এবং ছটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। আসবাব বলতে কিছু নেই, মাটিতে শুধু কয়েকটা মাদুর বিছানো। বর্ষার দিনে মাথায় জল পড়ে, যেমন ভিয়া রিপেটার বাগানের আসনগুলোতে পড়ে। আবার কোনদিন পড়তাম, 'হতভাগিনী যখন জানল যে সে গর্ভবতী হয়েছে তখন সে এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল—কামনার এই ফসলের হাত থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে।'

যাই হ'ক, আমরাও এই রকম একটা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছি। যখন জানলাম যে আমার স্ত্রীর সপ্তম সন্তান আসন্ন তখন দুজনে মিলে স্থির করলাম, একটু শীত কমলেই বাচ্চাটাকে কোন একটা গির্জায় ফেলে দিয়ে আসব—যদি কেউ তাকে দেখে দয়া করে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে।

শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের কর্মীদের সহায়তায় আমার স্ত্রী প্রসূতি সদনে গেলেন, তারপর একটু সুস্থ হতেই বাচ্চা কোলে নিয়ে বস্তিতে ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বললেন, 'জান, যদিও হাসপাতাল হাসপাতাল, তবু মনে হচ্ছে সেখানে থেকে গেলেই পারতাম!'

বাচ্চাটা যেন সব বুঝছে, এমন তারস্বরে কেঁদে উঠল যে না শুনলে বিশ্বাস করবেন না। চমৎকার নাদুসনুদুস, ভারী গম্ভীর গলা। মাঝ রাতে যখন কান্না জুড়ে দেয় তখন ঘুমোয় কার সাধ্য।

মে মাস পড়তে বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠল। বিনা ওভারকোটেই বাইরে যাওয়া যায়। এমনি এক দিনে আমাদের খাটাল ছেড়ে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমার স্ত্রী বাচ্চাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে রইলেন। তার গায়ে এমনই কাঁথাকম্বল জড়িয়েছেন যে সোজাসুজি যে কোন বরফজমা মাঠে ফেলে আসা যায়।

শহরে পৌঁছে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা চাপা দিতেই হয়তো আমার স্ত্রী অনর্গল বকতে শুরু করে দিলেন। শীঘ্রই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। চুল এলো-মেলো, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তিনি নানান গির্জার নাম করতে লাগলেন যেখানে বাচ্চাটাকে ফেলে আসা যায়, বিশেষ করে সেই সব গির্জা,

যেখানে ধনীরা বেশী যায়। কারণ, আমাদের মতো গরিবই যদি ওকে নেবে তাহলে আমাদের বাচ্চা আমরা নিজেরাই তো রাখতে পারি।' পর মুহূর্তেই আবার বলেন, ম্যাডোনার নামে উৎসর্গ করা কোন গির্জায় রেখে যাওয়াই ভাল। তাঁর নিজেরও তো একটি সন্তান ছিল, তিনি বুঝবেন, আমাদের ইচ্ছে পূরণ তিনি করতে পারেন। এ ধরনের কথাবার্তা ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল, এবং আমাকে বেশ উত্তেজিত করেও তুলছিল। কারণ, যা করতে যাচ্ছি তা আমার ভাল লাগছিল না, অতিশয় অপমানকর লাগছিল। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে লাগলাম এই ভেবে যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং আমার স্ত্রীর উপর রেগে যাওয়াও ঠিক হবে না। তাঁর কথার মোড় ফেরাতে মাঝে মাঝে এক আধটু আপত্তি জানাচ্ছিলাম। এক সময় বললাম, 'একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। ওকে সেণ্ট পিটারে রেখে দিই না কেন?'

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে আমার স্ত্রী বললেন, 'না, ওটা বড় বিরাট জায়গা, কারও চোখেই পড়বে না, বরং ভিয়া কনডোটি ছোট্ট গির্জা, সেখানে রাখলে হয়। আশপাশে কেমন সুন্দর সুন্দর দোকান পসার। হরদম বড়মানুষদের আনাগোনা। হাঁ, সেই বেশ হবে। ঐ ঠিক জায়গা।'

বাসে উঠে জনতার মাঝখানে আমার স্ত্রী নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। কখনও বাচ্চাটার গায়ের কম্বলটা বেশ করে জড়িয়ে দিতে লাগলেন, কখনও তার মুখের কাপড়টা সরিয়ে ভাল করে মুখটা দেখতে লাগলেন। চাপাচুপি অবস্থায় বাচ্চাটা বেশ ঘুমচ্ছিল। তার গোলগাল শুভ্র কম্বল-জড়ানো মুখখানা বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমাদের মতো বাচ্চাটারও পোষাক-পরিচ্ছদ তেমন ভাল নয়, ভালর মধ্যে ছিল এক জোড়া নীল রঙের উলের দস্তানা। বাচ্চাটা হাত দুটো তুলেই রেখেছিল, যেন সবাইকে দেখাতে চায় তার দস্তানা জোড়া।

লারগো গোলডিনিতে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর মুখে একেবারে খই ফুটতে শুরু হল। একটা সোনারুপোর দোকানের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে লাল ভেলভেটের উপর সাজানো গয়নার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেখ, দেখ কি চমৎকার! গহনা কিংবা শখের জিনিস কিনতে এই রাস্তায় অনেক বড়লোক আসে। এ-দোকান ও-দোকান করার ফাঁকে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে। এমনই খোশমেজাজের মাথায় আমার বাচ্চাটাকে দেখে কেউ না কেউ কোলে তুলে নেবে।' স্বর্ণালঙ্কারের

দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে প্রায় আত্মগতভাবেই আমার স্ত্রী এই কথাগুলো বলে গেলেন।

আমার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করতে আমার সাহস হল না। আমরা একটা গির্জার ভিতরে প্রবেশ করলাম। ছোট্ট গির্জা। হলদে পাথরের মতো রঙ করা, চারদিকে ছোট ছোট কুঠরী, একটা উঁচু বেদী। আমার স্ত্রী বললেন, 'এখন আমার মত বদলেছে, সব দেখে শুনে মোটেই আর ভাল লাগছে না।' যাই হ'ক, পুত সলিলে আঙুল ডুবিয়ে সারা দেহে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করলেন। তারপর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে সারা গির্জাটা ঘুরে দেখলেন, মুখে একটা অস্বস্তি এবং সংশয়ের ভাব। চুড়োর দীপাধার থেকে একটা শীতল স্বচ্ছ আলো এসে পড়েছে নিচে। আমার স্ত্রী একটা পার্শ্বকক্ষ থেকে আর একটাতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বসবার জায়গা, বেদী, ছবি—সব দেখতে লাগলেন। হয়তো ভাবছেন কোন্‌খানে ছেলেটাকে রাখা ঠিক হবে। আমি পিছনে পিছনে ঘুরছি। নজর সব সময় দরজার দিকে। হঠাৎ সোনালী-চুল, গায়ে লাল পোষাকপরা, ঢ্যাঙা মতন এক তরুণী এসে ঢুকলেন। ঢুকেই হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসলেন। তাঁর আঁটসাঁট স্কার্টে টান পড়তে লাগল। মাত্র মিনিটখানেক প্রার্থনা করলেন,তারপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বেরিয়ে গেলেন। আমার স্ত্রী এতক্ষণ সব দেখছিলেন। বললেন, 'না' এ তেমন সুবিধের জায়গা নয়। এখানে যারা আসে সবাই এই তরুণীর মতো। তাদের ভীষণ তাড়া, বাইরের দোকানে গিয়ে মজা লোটাতেই এদের বেশী আগ্রহ। চল, আমারও যাই।' বলতে বলতে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন।

আমরা বেশ জোরকদমে করসোর পথে পিছিয়ে এলাম। সামনে আমার স্ত্রী, পিছনে আমি। পিয়াজা ভেনেৎসিয়ার কাছে আমরা আর একটি গির্জায় গিয়ে ঢুকলাম। এই গির্জাটা আগেরটার চেয়ে অনেক বড়, চারদিকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। নানাবিধ গিল্টিকরা সাজসজ্জা আর রূপো-বাঁধানো পবিত্র চিহ্ন চারপাশে টাঙানো। ম্লান আলোকেও সেগুলো ঝকঝক করছে। ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। এক নজরে দেখে নিলাম ভিতরে অনেক লোক। সব বড় ঘরের মানুষ। মেয়েদের সকলেরই মাথায় টুপি, পুরুষদেরও বেশ পরিচ্ছন্ন পোষাকপরিচ্ছদ। মঞ্চ থেকে যাজক হাত নাড়ছেন—কোন উপদেশবাণী প্রচার করছেন নিশ্চয়। সবাই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাবলাম, এই সুযোগ, কেউ আমাদের দিকে তাকাবে না। আমার স্ত্রীকে ফিসফিস করে বললাম, 'এখানে রেখে যাবে ?'

আমার স্ত্রী মাথা নাড়লেন। আমরা একটা পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম। ঘরটা বেশ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। ভিতরে কেউ নেই। কম্বলে বাচ্চাটার মুখ ঢেকে আমার স্ত্রী তাকে একটা চেয়ারের উপর রেখে দিলেন—যেন ভারী পুঁটলিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর হাঁটু মুড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমি আর কি করি, দেয়ালের গায়ে পবিত্র সিলভার হার্টস দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ পরে আমার স্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, দৃঢ় মুখভঙ্গি, দেহে ক্রশ-চিহ্ন আঁকলেন। তারপর গির্জাঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ালেন। পিছনে একটু তফাতে আমি। এমন সময় যাজকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অ্যাণ্ড যিসাস্ শেড: পিটার, হুইদার গোয়েস্ট দাউ?' কোথায় চলেছ পিটার? চমকে উঠলাম, যেন এই প্রশ্ন আমাকেই করা। আমার স্ত্রী দারজার পরদাটা সরাতে যাবেন এমন সময় আর এক কণ্ঠস্বর শুনে আমরা দুজনে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। 'সিনোরা, চেয়ারের উপর কি যেন একটা ফেলে যাচ্ছেন।' দেখি কালো পোষাক পরা সেই শ্রেণীর এক ধর্মিষ্ঠা মহিলা যাঁরা গির্জায় গির্জায় ঘুরে বেড়ান।

আমার স্ত্রী বললেন, 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে ভুলেই যাচ্ছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।' আমরা পুঁটলিটা উঠিয়ে নিয়ে গির্জার বাইরে চলে এলাম—মৃতকল্প, শরীরে যেন প্রাণ নেই।

বাইরে এসেই আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আমার এই বেচারা বাচ্চাটাকে কেউই নিতে চায় না।' কথা বলার ভঙ্গিটা অনেকটা তার মতন যে কিছু বেচতে এসেছে অথচ খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না, তাড়াতাড়ি জিনিসটা বেচে ফেলার মতলব অথচ বাজারে তার ক্রেতা নেই। দ্রুতপদে পথ চলতে শুরু করলেন। যেন মাটিতে পা পড়ছেই না।

আমরা পিয়াজা শান্তি এপোসটলীতে এসে পৌঁছলাম। গির্জাটা খোলাই ছিল। ভিতরে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী গির্জাটার ছায়াময় বিরাটত্ব দেখে ফিসফিস করে বললেন, 'ঠিক এমনটিই চেয়েছিলাম।' বেশ দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এক পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে বাচ্চাটাকে একটা বেঞ্চের উপর রেখে দিলেন। তারপর গায়ে ক্রশ-চিহ্ন না এঁকেই, প্রার্থনা না জানিয়েই, বাচ্চাটার কপালে একটা চুমো না দিয়েই দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন—যেন তাঁর পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সারা গির্জাটা যেন এক উৎকট চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল—বাচ্চাটা গলা ফাটিয়ে কেঁদে

উঠেছে। তার দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে, পেটের জ্বালা ধরেছে। সম্ভবত এই তীব্র কান্নার শব্দে আমার স্ত্রীর মাথাটা গুলিয়ে গেল। তিনি প্রথমটা দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন, তারপর ফিরে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন পাশের কুঠরীটাতে। খেয়ালই নেই কোথায় আছেন, কি করছেন। তারপর বেঞ্চের উপর বসে পড়ে বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিয়ে ব্লাউজের বোতামটা খুলে তার মুখে স্তন গুঁজে দিলেন। বাচ্চাটা স্তন পেয়ে বুভুক্ষু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল, তার কান্না থামল। এমন সময় একটা রূঢ় কণ্ঠস্বর আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'এটা ঈশ্বরের আস্তানা, এখানে ওসব চলবে না, বেরিয়ে যাও।'

লোকটা গির্জার চাকর। বেঁটেখাটো বুড়ো মানুষ, পাকা দাড়ি, চেহারার অনুপাতে গলার আওয়াজটা অতিশয় উগ্র। আমার স্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। নিজের বুকটা ঢেকে তারপর ভাল করে বাচ্চার মাথাটা ঢেকে বললেন, 'ম্যাডোনার ছবি নিশ্চয় দেখেছ। তিনি তাঁর বাচ্চাকে কোলে নিয়েই থাকেন সব সময়।'

লোকটা বললে, 'স্পর্ধা তো কম নয়! ম্যাডোনার সঙ্গে তোমার তুলনা? আচ্ছা ঁত্যাদোড় মেয়েছেলে।'

যাই হ'ক, আমরা সেই গির্জাটাও ত্যাগ করলাম। আমরা পিয়াজ্জা ভেনেৎসিয়ার বাগানে গিয়ে বসলাম। সেখানে আমার স্ত্রী পরমানন্দে বাচ্চাটাকে অনেকক্ষণ স্তন্যপান করালেন। বাচ্চাটা পরিতৃপ্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গির্জাগুলো বন্ধ হয়ে আসছে, আমরা হত-চকিত, বিভ্রান্ত। কি যে করা যায় বুঝতে পারছি না। যা করা উচিত নয় তাই করতে এসে কি নাজেহালটাই না হতে হচ্ছে! আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। স্ত্রীকে বললাম, 'দেখ, দেরী হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আর চলে না, যা হয় একটা কিছু স্থির করে ফেলতে তো হবে।' আমার স্ত্রী অতিশয় তিক্তগলায় বললেন, 'তোমার নিজেরই তো রক্তমাংসে গড়া বাচ্চাটা; শেষকালে কি লোকে যেমন বেরালছানা ফেলে যায় সেইভাবে ফেলে যাব, এই কি তোমার ইচ্ছে?'

আমি বললাম, 'না, না, তা নয়। যা করার তা এখনই করে ফেলতে হবে, হয়তো কিছুই করা যাবে না।'

স্ত্রী উত্তরে বললেন, 'আসলে তুমি ভাবছ, হয়তো আমার মত পরিবর্তন হবে, আমি বাচ্চাটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তোমরা, পুরুষরা সব ভীরু।'

বুঝলাম, অন্তত এই মুহূর্তে তাঁর কথার প্রতিবাদ করা উচিত হবে না। একটু নরম হয়ে বললাম, 'ভাবছ তোমার মনে কি হচ্ছে তা আমি বুঝছিনা? তবে এটাও জেনো, ওর যাই কিছু হ'ক না কেন, আমাদের খটিালে থাকলে যা হবে তার চেয়ে ভালই হবে। এমন একটা বাসা যার না আছে পায়খানা, না আছে রান্নাঘর, শীতকালে ছারপোকা আর গ্রীষ্মকালে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে—' আমার স্ত্রী একথার উত্তর দিলেন না।

কোথায় যাচ্ছি না বুঝেই আমরা ভিয়া নাৎসিওনেলের দিকে এগিয়ে চললাম। একটু গিয়েই একটা ছোট্ট গলি। অন্ধকার, জনমানবহীন। একটি বাড়ির সামনে একটা ধূসর রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে। হাতলটা ধরে ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। স্ত্রীকে বললাম, 'নাও, তাড়াতাড়ি সারো। এই সুবর্ণ-সুযোগ! পিছনের সীটে রেখে দাও।' আমার স্ত্রী আমার কথামতো বাচ্চাটাকে গাড়ীর পিছনের সীটে রেখে দিতেই আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অতি দ্রুত কাজটা সারলাম। কেউ আমাদের লক্ষ্য করেনি। আমার স্ত্রীর হাত ধরে পিয়াজা ডেল কুইরিনেলের দিকে এগিয়ে চললাম।

পার্কটা শূন্য এবং একেবারে অন্ধকার। বড় বড় বাতির তলায় আলো জ্বলছে। নীচে অন্ধকারের মধ্যে রোম আলো-ঝলমল হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রী ফোয়ারার কাছে এগিয়ে গেলেন। একটা বেঞ্চে বসে হঠাৎ কান্না শুরু করে দিলেন। এ দুঃখ যেন তাঁর একার! আমার দিকে পিছন ফিরে বসে কাঁদতেই লাগলেন।

বললাম, 'এ আবার কি!'

স্ত্রী বললেন, 'ওকে ফেলে দিয়ে এসে এখন মনে হচ্ছে যেন সব হারিয়েছি, আমার বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে।'

আমি সাহস করে বললাম, 'তা বটে! তবে ওসব সয়ে যাবে।'

আমার স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখের জল থামল—বাতাস লেগে যেমন পথের উপরকার বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'আমি ওখানে যাব, নিজে গিয়ে সম্রাটকে সব কথা বলব।'

হাত দিয়ে তাঁকে আটকে বললাম, 'পাগল হলে নাকি! তুমি কি জান না এখন আর সম্রাট টম্রাট কেউ নেই?'

'তাতে কি? তাঁর জায়গায় যিনি আছেন তাঁকেই বলব। কেউ না

কেউ আছেনই একজন।' তিনি সেই প্রাসাদের বিরাট সিংদরজার দিকে এগিয়ে চললেন। কি যে করতেন শেষ পর্যন্ত চরম হতাশায়, কে জানে, আমি মরিয়া হয়ে আমার স্ত্রীর একটা হাত ধরে বললাম, 'দেখ, ভাবছি কি, না হয় গাড়ী থেকে ছেলেটাকে ফিরিয়েই নিয়ে আসি। আর একটা বেশী না হয় হবে। এমন কি আর—'

প্রস্তাবটা যেন সর্বরোগহর মহৌষধি, আমার স্ত্রী রাজার কাছে দরবার করতে যাওয়ার কথা ভুলে গেলেন। বললেন, 'কিন্তু গাড়িটা কি এখনও আছে ওখানে?' এই বলে যেখানে গাড়িটা ছিল সেই দিকে চলতে লাগলেন। আমি পিছনে পিছনে যেতে যেতে বললাম, 'পাঁচ মিনিটও তো হয়নি এখনও।'

গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে। আমার স্ত্রী যেই দরজাটা খুলতে গেছেন একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, কে তোমরা? কি করছ এখানে?'

আমার স্ত্রী লোকটির দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে পিছনের সীট থেকে পুঁটলিটা উঠিয়ে নিলেন। লোকটি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। 'কি নিচ্ছ ওটা তোমরা? এটা আমার গাড়ি। আ মা র—'

আমার স্ত্রীর চেহারা তখন দেখবার মতো। তিনি লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে হাত দিচ্ছে তোমার জিনিসে? তোমার গাড়িতে আমি থুতু ফেলি। থু, থু—' সত্যিই আমার স্ত্রী সত্যই গাড়ির দরজায় থুতু ফেললেন। লোকটি হতভম্ব হয়ে বললে, 'কিন্তু ঐ পুঁটলিটা?'

'পুঁটলি নয় মোটেই। এটা আ মা র বাচ্চা। দেখ, ভাল করে দেখ।' বাচ্চার কাঁথাকম্বল সরিয়ে তার মুখখানা ভদ্রলোককে দেখালেন আমার স্ত্রী। 'তুমি আর তোমার স্ত্রী সাতজন্মেও এমন সোনার চাঁদ বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে না। আবার নতুন করে জন্মালেও তোমরা পারবে না। গায়ে হাত দিও না বলছি, তাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করব। পুলিশ ডাকব। বলব, আমার বাচ্চা চুরি করে পালাচ্ছিলে!'

ভদ্রলোক মূর্ছাই বা যান! তারপর পথের উপর যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম পায়ে পায়ে সেইদিকে এগিয়ে এলেন।



প্যাণ্টালেমন রোমানফ

ভাবনা নেই

একজন কমসোমল (কম্যুনিষ্ট যুবসঙ্ঘের সদস্য) ট্রামে চাপা পড়ল, ষ্ট্রেচারে করে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মজা দেখবার জন্য বহু লোকের জনতা পিছন পিছন চলেছে।

• আহত দক্ষিণ হস্তখানি পথচারী একজনের চামড়া বেল্টে বাঁধা হয়েছে। জামার ছিন্ন অংশ তখনো তাতে ঝুলছে, রক্তের চাপ মাটিতে চুঁয়ে পড়ছে।

ছেলেটির মুখ অবসন্ন, মাথাটি ষ্ট্রেচারের উপর গড়িয়ে পড়ছে, বিবর্ণ পাংশু দেহ—ঘামে তার সারা মুখখানি ভিজে গিয়েছে।

সাদা চাদরের উপর সংজ্ঞাহীন ছেলেটিকে রাখতে রাখতে একজন ষ্ট্রেচারবাহক বলল—"এই মোড়টায় কি কাণ্ডটাই হলো, চল্‌তি ট্রাম থেকে নামতেই, বাসের ধাক্কায় পেছনের ট্রামের চাকার ভিতর চলে গেছে একেবারে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সংবিৎ ফিরে এল, মুখে বেদনার আভাসমাত্র নেই, যেন এইমাত্র তার ঘুম ভেঙ্গেছে। কড়িকাঠের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে—আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে চোখ ফিরাবার চেষ্টা করল।

জ্ঞান হতেই একজন ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে বললেন—"তোমার বাড়ীর ঠিকানা, বাবার নামটা বলো ত দেখি, তার পর বেশ সাহসের সঙ্গে কাজ করতে হবে।"

তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটি বলল—"তার জন্যে ভাববেন না আপনি।" কতকটা বিরক্ত হয়ে সে কথা কয়টি বলল—যেন ডাক্তারটিকে তার তেমন ভালো লাগে নি।

—"১৭৩৪০ আলেকজান্দ্রোভা—কেন তাতে কি দরকার ?"

—"দরকার একটু আছে, তোমার হাতটা কেটে গেছে কি না তাই।"

—"হাত ? কোন হাত ?"

—"বুঝতে পারছ না—ডান হাত।" ডাক্তারবাবু তাঁর সহকারীদের অপারেশনের ব্যবস্থা ঠিক রাখতে আদেশ দিলেন।

—"সর্বনাশ হয়েছে ডাক্তারবাবু—এ হাত না হলে চলবে কি করে ?"

—"কি চলবে ? কি কাজ করো তুমি ?"

—"কাজ ? কত কাজ, সভা-সমিতি, ফুটবল, ক্যাম্পের কাজ—আমার নিজের টিম আছে।"

—"ও দু' দিনেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে, বাঁ হাতে লিখতে শিখবে। ফুটবল ত' পা দিয়ে খেলবে, আর সব মাথার কাজ। বুদ্ধিটা ঠিক থাকলেই হলো, ও তুমি কিছু ভেবো না।"

ছেলেটি একটুও না ভেবে বলল—"ঠিক বলছেন আপনি," কিন্তু একটু পরেই আবার বলতে লাগল, "কিন্তু তাহলেও ডাক্তারবাবু যা হবার তা হয়েছে, কিছুকাল আগেও ইচ্ছামত য করতে পারতাম এখন আর ত পারবো না, পাংচুয়ালিটি দেখাতে গিয়েই আমার এই সর্বনাশ হলো। উঃ!"

"বড় কষ্ট হচ্ছে না ?"—প্রশান্ত স্বরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটি সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে আহত নিষ্পিষ্ট হাতটির দিকে একবার লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল। ডক্তোরবাবু বললেন—"ডাকাত ছেলে ! তোমার বাপ-মা কিন্তু কষ্ট পাবেন।"

ছেলেটি বলল—"মাকেই ত আমার ভয়।"

সবিস্ময়ে ডাক্তারবাবু বললেন—"সে কি হে ! এমন শক্ত ছেলে তুমি, মার সঙ্গে দেখা করতে ভয় কি ?"

ছেলেটি বলল—"মানে ঠিক ভয় নয়, তবে মেয়েদের কান্না আমার সহ্য হয় না।"

—"আজকালকার ছেলে, দুর্বলতা তোমাদের নেই বুঝি ?"

—"যাক এসব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, এতদিন বাহাদুরি করে আসছি, অবশেষে আজ বিপদে জড়িয়ে পড়লুম, নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলেই এই হলো আর কি।"

অপারেশন হবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা হাসপাতালে এলেন। সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গী। বেশ সঙ্গতিপন্ন বলে মনে হয়। হাতে একটি ব্যাগ। মহিলাটির চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের চিহ্ন বর্তমান। মনের যন্ত্রণা গোপন করার চেষ্টা তাঁর অপরিসীম।

এক জন নার্সকে দেখে মহিলাটি বললেন—"ট্রামে চাপা পড়েছে, কমসোমলের একটি ছেলে, তাকে দেখতে চাই।"

নার্স ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছিল, বলল—"যিনি এখন ডিউটিতে আছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

বয়স্কা একজন নার্স মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—ইনিই হয়ত ছেলেটির মা, আহা! অনেক অপারেশন দেখেছি, কিন্তু মার চোখের জল আমার সহ্য হয় না।—এই নার্সটিই ডাক্তারকে অপারেশনের সময় সাহায্য করেছিলেন।

বারান্দায় একজন ডাক্তার ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছিলেন, মহিলাটি তাঁহাকে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি এখন ডিউটিতে আছেন ?"

—"হ্যাঁ, বলুন আপনার কি দরকার ?"

"আমার ছেলে, মানে যে ছেলেটি ট্রামে চাপা পড়েছে তাকে দেখতে এসেছি।—ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে বেঁচে আছে ত ?"

—"আপনি ভয় পাবেন না, আমরা ভালো বন্দোবস্তই করেছি। কিন্তু এখন ত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করা চলবে না, কোনোরকম কান্নাকাটিতে হয়ত উল্টো বিপত্তি হবে।"

মহিলাটি বললেন—"কান্নাকাটি ? কিছু ভাববেন না আপনি, আমি শুধু দেখব, একটা কথা তাকে বলতে চাই।"

মহিলাটির দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃপ্ত ভঙ্গীতে ডাক্তারবাবু অভিভূত হলেন। অবশেষে বললেন—"বেশ আসুন, কিন্তু কান্নাকাটি চলবে না, ছেলে যাতে মনে জোর পায় এমন কথাই বলবেন।"

মহিলাটি বললেন—"কিছু ভাববেন না আপনি।" ডাক্তারকে তিনি ক্ষিপ্রপদে অনুসরণ করলেন।

ঘরের ভিতর ঢুকতেই ছেলেটিকে দেখা গেল। ছেলেটিও মাকে দেখল। তারপর সলজ্জ ভঙ্গীতে একটু হাসল মাত্র। কিন্তু সে হাসির উত্তর পাওয়া গেল না—মার কাছ যেতে এতটুকু সহানুভূতি মিলল না।

মা তিরস্কার করতে লাগলেন—"কি ডাকাত ছেলে তুমি। জানি একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটবে। বুদ্ধি-সুদ্ধি একদম নেই তোমার।"

মার মুখের দিকে ছেলেটি নীরবে তাকিয়ে রইল। তার মুখ-চোখের আকুলতা মার কথায় অবদমিত হয়েছে।

ছেলেটি ম্লান হাসিয়া বলল—"এতদিনে তবু সত্যি কথা বললে মা, একথা চিরদিন আমিই বলে এসেছি, তবে একথা ঠিক, আমি এখনো সত্যি ছেলেমানুষ।"

"তোমার কিন্তু অন্য ধারণা ছিল, কথা বলবার আগে ভেবে একবার দেখবে।"

"যা বলবার বলো মা, আর হয়ত সুযোগ হবে না। তবে ডাক্তারবাবু-বলেছেন শীঘ্রই সব অভ্যাস হয়ে যাবে। কিছু ভেবো না মা!"

সদয় কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বললেন—"মাথাটা ঠিক আছে, নইলে—"

মহিলাটি কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—"বেশ! আজ আমি যাই, আবার কাল আসবে।"

ঘর ছেড়ে মহিলাটি তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন—কিন্তু বেশীদূর চলবার শক্তি তাঁর নেই, দক্ষিণের বারান্দায় তিনি অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। মাতৃহৃদয়ের আকুল স্রোতে তাঁর গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন—"শীঘ্রই সেরে উঠবে, ভয় কি তোমার।"

ছেলেটি বিষণ্ণ সুরে বলল "কিছু ভাববেন না আপনি,"—তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল—"কি আশ্চর্য। মার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। এর মধ্যে আমি···"

আর কিছু সে বলতে পারল না, দাঁত দিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত চেপে ধরল বটে, কিন্তু নয়ন-নদীর দুকূল বয়ে অশ্রুজলের বন্যা তার পাংশু মুখখানিকে প্লাবিত করে ফেলল।



ওয়াল্‌টার কফ্‌ম্যান

অন্ধকার দিন

জর্জ আমার বন্ধু কিন্তু এখন আর ওকে দেখতে পাইনা। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে তাকে আমি পিছনে হারিয়ে এসেছি। হয়তো সে তখন আর এই ইহলোকেই নেই। তবুও সে আমার বন্ধু—যতদিন বাঁচব, ততদিন এই বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রেখে যাবো আমি।

বাড়ীটি সুন্দর ছিল আমাদের। শ্বেত পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে একটু উঠে সদর দরজার পাশে কলিং বেল। তার আওয়াজ শুনে পরিচারিকা কেটি এগিয়ে আসতো দ্রুত পায়ে। হলের দামী কার্পেটের উপর দিয়ে এসে ভারী স্প্রিং-লাগানো কাচের দরজাটি সে খুলে দিত। তখন নবাগতর সামনে আভ্যন্তরীন স্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশটি প্রকাশিত হত। বাবা বসে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলে সে তাঁকে ওঁর স্টাডিরুম বা লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে যেত। আর মায়ের কাছে কেউ এলে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরের বসবার ঘরটিতে। দেওয়ালের উপরে ফ্রেমে আঁটা ওয়াটার কলার ল্যাণ্ডস্কেপ টাঙানো। চেয়ার-টেবিলে গুলি এসে পড়তো চারপাশের জানালা দিয়ে রবিরশ্মি। জানালা দিয়ে নীচের সুরভিত উদ্যান চোখে পড়তো।

বেশ মনে আছে আমার, জর্জ কোনদিনও ভিতরে আসেনি। ও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো ঠিক সময়টিতে রাস্তার ধারে। হয়তো বা কিছুটা গর্ব, কিছু

কুণ্ঠা মেশানো ভীতি ছিল ওর—ওর জগত থেকে স্বতন্ত্র পরিবেশে ও আসতে চাইত না। আমি সিঁড়ি দিয়ে ছুটে যেতাম ভারী দরজাটি ঠেলে বেরিয়ে আসতাম। জর্জের পাশে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতাম, কিরে এসেছিস। জর্জ বলতো, বাদাম খাবি—ওর এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে বড় বড় বাদাম বার করে আমার হাতে দিত। চল্ তবে আগুনে ভাজা করি, আমার কথায় তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিত। হাসতে হাসতে হাত ধরাধরি করে আমরা দৌড়তাম দুজনে বনের দিকে। পথের উপরে পকেট থেকে দুটি একটি বাদাম পড়ে যেত, তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটতাম।

বনের মধ্যে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আগুন জালিয়ে কাঁচা বাদামগুলি ভাজতাম। দেখতাম বাদামগুলোর কেমন রঙ বদলাচ্ছে আর শব্দ করে ফাটছে। চারপাশে সুদীর্ঘ ওক, এলম, আর বার্চ গাছের সমাবেশ। আকাশে হালকা মেঘ। গাছের পাতায় ঝলমল করছে সোনা ঝরা আলো। সেদিনও জর্জ শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুনটাকে আরও গনগনে করে তুলছিল। আমি একটি কাঠি দিয়ে বাদামগুলো নেড়েচেড়ে দিচ্ছিলাম। চুপচাপ। শুধু ডালপালার মরমর শব্দ আর বাদাম ফটফট। হঠাৎ জর্জ বললো, জানিস, বাবা হিটলারের যুবদলে ভর্তি হতে দেবেন না আমাকে—যা-ই হোক না কেন। ও প্রশ্ন করে—তা তুই কি ওদের দলে যেতে চাস্? কিছুতেই না, আমি বল্লাম। ও জবাব দেয়, তোর কথা আলাদা, তোরা ইহুদি। আমি এবার বল্লাম, যদি তা না হোতাম—তা হলেও ভর্তি হতে যেতাম না হিটলারের দলে! কারণ জিজ্ঞাসা করায় একটু চড়া গলায় বলে উঠলাম, আমি কারো হুকুমের চাকর হতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে বললো, ঠিক বলেছিস্, আমিও না। তারপর বললো, দুর ছাই, ওসব কথা ছাড় এখন। কিছুক্ষণ পরে একটা বাদাম ভেঙে শাঁসটা মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে আবার বলে, আচ্ছা জানিস্ নাৎসিরা কেন ইহুদিদের ঘৃণা করে এতো? কথাটা আমার বুকে বিঁধলো। সেই বয়সেই জানতাম, নাৎসিরা আমাদের ঘৃণা করে, কারণ জানতাম না। সেই মুহূর্তে জর্জের কথায় কেমন যেন থতোমতো খেয়ে গেলাম। অপরাধীর মত ধরা গলায় বললাম, জানি না, ভাই। জর্জ আমাকে লক্ষ্য করলো। তারপর একটা বাদাম ভেঙে আমার মুখে দিয়ে বললো, নে খা, ভুলে যা ও-সব বাজে কথা। আমি ওদের কেউ নই। তুই আর আমি দুজনে বন্ধু, আবার জিজ্ঞাসা করলো বেশ জোর দিয়ে—কিরে বন্ধু নয়, তুই বল? হেসে উঠলাম আমরা দুজনে।

আজ এই মুহূর্তটিতে যখন ওর কথা লিখতে বসেছি, মনে হচ্ছে উভয়ের মধ্যে আজ কী বিরাট ব্যবধান। কতো পরিবর্তন ঘটে গেছে জার্মানীর, সারা জগতের। অনেক দেরী হয়ে গেছে। তবু লিখছি—লিখতে হবেই যে আমাকে। জর্জ আজো আমার প্রিয় বন্ধু, আর যে শ্রেণীর মানুষের সমাজে ওর জন্ম সেই রোজ খেটে খাওয়া মানুষেরা আমার বন্ধু। জার্মানীর সেই মানুষগুলির জন্যে আমি গর্ব করি।

মা, ষ্টিফান এসেছে,—ছোট বাগানটিতে আমাকে নিয়ে ঢুকে জর্জ ওর মাকে বলতো। লজ্জায় হাত দুটো আমার গায়ের সঙ্গে সেটে গিয়েছিল, মাথা নত করে তাঁকে অভিবাদন করতাম। সেটি তরিতরকারির বাগান। একমনে আগাছা তুলছিলেন। হাসিমুখে বললেন, এসো এসো তুমিই জর্জের বন্ধু! বাঃ বেশ। ওতো খালি তোমার কথা বলে। মাটি আর ঘাস মাখানো একটি হাত দিয়ে চোখের সামনে পড়া একগুচ্ছ চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন খোকা ষ্টিফানকে ঘরে নিয়ে বসা। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি কেটলিটা চড়িয়ে দিস্। খানিকটা এগিয়ে আবার মাটিতে ঝুঁকে পড়লেন—আর একটু কাজ হয়তো বাকী ছিল। সাধারণ পোশাকে মাঝারি চেহারা। পিছনের সোনালি চুলের ফাঁক দিয়ে কি সুন্দর আকৃতিটি চোখে পড়েছিল আমার। কী সহজে ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। ধর্ম বা আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা সেদিন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ওর মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন, যাবার সময় আবার এসো—ভারী আনন্দ হবে।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন! জার্মানীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলছে। আমাদের বাড়ীর ওপর প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সেই ভারী কাচের দরজাটি ভেঙে চুরমার—একদিকে হেলে আছে তার কাঠামোটা। দরজার পাশে ছোট কলিং বেলটা উপড়ে তুলে নেওয়া হয়েছে—তার পিছনের ছেঁড়া তারের মুখ দুটো হাঁ করে রয়েছে অভাগার মতো। হলের কারপেটের শোচনীয় অবস্থা। এখানে ওখানে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। বাবার স্টাডি আর লাইব্রেরী ওলট পালট: চেয়ার টেবিল ভাঙা আলমারির কাচ ভেঙে ছড়িয়ে আছে। বাবার অতো সাধের সংগ্রহ আইনের বই আর উপন্যাসগুলি মলাটের বাঁধন ছিঁড়ে মেঝের ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। মায়ের দোতলার ঘরটির দিকে

তাকিয়ে আমি কান্না চাপতে পারছিলাম না। গদি আঁটা নরম চেয়ারগুলির কংকালগুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। দেওয়ালের ওয়াটারকালার ল্যাণ্ডস্কেপগুলিকে নির্মম বেয়োনেটের স্পর্শে টুকরো করেছে। সুন্দর পিয়ানোটিও চুরমার।

সেই দিনটি এখনও আমার বুকে নিদারুণ ক্ষতের মতো জ্বলছে—এ মিলাবে না কোনোদিন! জার্মানী রক্তরাঙা—ইহুদীরা সেদিন তাদের বুকের রক্ত ঢেলে পথ পিছল করে দিয়েছিল, যে পথ ধরে হিটলার হাসতে হাসতে তার সাধের সিংহাসনে গিয়ে বসেছিল।

দিন যেন কাটেনা,

রাত এলো অনেক পরে।

আমরা স্তব্ধ। সব কান্নাও যেন স্তব্ধ। বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। সবাই আমরা আসন্ন ধ্বংস চিন্তায় মুহ্যমান।

অনেক রাত্রে একটি মানুষ এলেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে তিনি এলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললেন, ষ্টিফান কোনো ভয় নেই। তুমি আর আমি, আমরা দুজনে মিলে আবার সব গড়ে তুলবো। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা হয়ে গেল তার জন্যে আমারই লজ্জা হচ্ছে! তারপর ভাঙা একখানি টেবিল ও একটি চেয়ার নিয়ে ঠেলাগাড়িতে তুললেন। নিয়ে গেলেন—সারিয়ে আনবেন। উনি কাঠের কাজ জানেন।

তিনি আমার সেই একমাত্র বন্ধু—জর্জের বাবা!





আলবেয়র কাম্যু

ব্যাভিচারিণী

অনেকক্ষণ ধরে মাছিটা চক্রাকারে ঘুরছে বাসটার ভিতরে। বাসের জানালাগুলো সব বন্ধ। মাছিটা অবিরাম উড়ে চলেছে, নিঃশব্দে। হঠাৎ মাছিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। একটু পরে জেনী দেখতে পায় তার স্বামীর হাতের ওপর মাছিটা বসে আছে।

হিমেল হাওয়ায় আকাশ ভরে আছে, মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় বালির রেখা পড়ে যাচ্ছে বাসের জানালায়। মাছিটা এই ধাক্কায় নড়ে উঠছে, শীতের ভোরের সেই আবছা আলোয় বাসটা অতি ধীর গতিতে চলেছে। জেনী তার স্বামী মার্সেলের দিকে চোখ ফেরায়। মার্সেলের কপালটা তেমন চওড়া নয়, তার উপর ছড়িয়ে আছে শুভ্র কেশগুচ্ছ। মুখখানার মাঝখানে উদ্যত হয়ে আছে খাড়া নাকটা। যেন কোন বিষণ্ন অরণ্য-দেবতা, কপালে শিঙ, পিছনে লেজ।

পথের উপরকার অসংখ্য খানা-খন্দে পড়ে বাসটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। প্রতিটি ধাক্কায় জেনীর দেহ তার স্বামীকে স্পর্শ করছে। মার্সেল নিস্পৃহভঙ্গিতে বসে আছে, যেন এক নিদারুণ শূন্যতার প্রতীক। তারে হাতে ছোট্ট একটা ক্যানভাসের সুটকেস, বেশ জোর করে আঁকড়ে ধরে আছে। মাছিটার এই নিঃশব্দ পরিক্রমা তার নজরে পড়ে নি।

শীতের হাওয়া বাসের চারপাশের কুয়াশাকে নিবিড় করে তুলছে। যেন একটা অদৃশ্যহাত খেলাচ্ছলে অজস্র বালি ছুঁড়ে ছুঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কুয়াশার এই প্রাচীর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে বাসটা। ধূলিরুক্ষ এই প্রান্তরপ্রান্তে মাঝে মাঝে কিছু চাকচিক্য দেখা যায়, চকিতেই মিলিয়ে যায়। কয়েকটা শীর্ণ তালগাছ, ধাতু-নির্মিত স্তব্ধ মিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ চোখে ভেসে আসে হঠাৎ আবার মিলিয়ে যায়।

স্তব্ধতা ভেঙে মার্সেল বলে ওঠে, কী বিচিত্র এই দেশ !

বাসের যাত্রীরা সব আরবী তাদের দেহ ঢিলা জোব্বায় আবৃত, আর মুখটা ঢাকা, ঘুমের ভান করে চোখ বন্ধ করে আছে সবাই। কেউ আবার সীটের ওপর আরাম করে পা তুলে দিয়ে বসেছে, গাড়ির ঝাঁকানি খেয়ে মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। জেনী এদের দিকে একটু চোখ মেলে দেখছিল, এদের এই নিঃশব্দ উদাসীনতা জেনীর অসহ্য মনে হয়। যেন অনন্তকাল ধরে চলেছে সে এই অন্তবিহীন পথে।

এরা সেই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের প্রহরী, ওদের সঙ্গে যেন কোন সুনীল দিগন্তে পাড়ি দিয়েছে। অথচ মাত্র দুঘণ্টা আগে ভোর বেলার আবছা আলোয় রেলস্টেশন ত্যাগ করে জেনীরা বাসে উঠেছে। বাসটা কঙ্কর-কঠিন, ধূলি-ধূসরিত জনহীন প্রান্তরে ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে আকাশ যেখানে মিশেছে মাটির বুকে সেই প্রান্ত পর্যন্ত একটানা সরল মসৃণ পথ সামনে বিছানো।

এর মাঝেই এক সময় প্রান্তর পার হয়ে উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কোথাও কিছুই দেখার নেই। অতি মৃদুগতিতে যেন তারা নিদ্রাহারা নিশীথের নীরব তমসায় দুঃসাহসিক অভিযানে চলেছে। এই অন্ধকার, কিন্তু বায়ুতরঙ্গে মুখরিত। জেনী মাঝে মাঝে জিভ বুলিয়ে তার ঠোঁটটা সিক্ত করছে, বালির টুকরো চোখ থেকে বের করার চেষ্টা করছে।

জে নী !

মার্সেলের এই গভীর গলার আওয়াজে শিউরে ওঠে জেনী। তারপর তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এই রকম একটা রাশভারি মানুষের এমন একটা হালকা নাম হাস্যকর মনে হয়।

মার্সেল বলে, আমার সেই নমুনার বাক্সটা কই ? জামা কাপড়ের নমুনা ? মাথা নিচু করে, অতি কষ্টে পা বেঁকিয়ে সীটের নিচে হাতড়াতে গিয়ে জেনীর মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ একদিন ছোটবেলায়

সে শরীরচর্চার জন্য পুরস্কার পেয়েছে। বেশীদিনের কথা নয়, পঁচিশ বছর, যেন মাত্র গতকাল, কে বলবে পঁচিশ বছর!

এই সময়টা বিবাহ এবং বন্ধনমুক্ত জীবনের মাঝখানে একটা কিছু ঠিক করার জন্য সে সংশয়-দোলায় দুলেছে। আজ আর সে সেদিনকার মতো একা নয়। আইনের ছাত্র মার্সেলকে সে নির্বাচন করেছিল। তার স্বামীর মুখের তীক্ষ্ণ হাসি, আর উদ্‌গত ঘনকালো চোখদুটির প্রেমে সে আকুল হয় নি। তবু এই মার্সেলকে ভালই লেগেছিল। মার্সেল পরিশ্রমী, মানসিক দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তার চরিত্রে সুস্পষ্ট, তারই এই মানুষটির সান্নিধ্য জেনীর ভাল লেগেছে। এই লোকটিই তার জীবনের নিরালা নির্জনের সেই নিদারুণ শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুলেছে।

জেনীর এক সময় হঠাৎ মনে হয় বাসটার ভিতর দুটি চোখ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে একমাত্র চঞ্চলতা। সোজাসুজি ঘাড় ফিরে দেখে নেয় জেনী।

একজন সৈনিক, তার অঙ্গে ফরাসী বাহিনীর পোষাক। এই মরু সাহারায় নির্বাসিত হয়ে আছে। মুখটা রোদে পোড় খেয়ে গেছে, মাথায় টুপী। মুখটা লম্বা, শেয়ালের মতো ধূর্ত মুখভঙ্গী। তার সেই নিমেষহীন দৃষ্টিতে একটা জ্বালা আছে, একটা ভাল না লাগার ভাব। জেনী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাওয়া ভরা কুয়াশার দিকে তাকিয়ে তেমনই উদাস ভঙ্গীতে বসে আছে মার্সেল।

গায়ের কোটটার মধ্যে গুটিয়ে বসতে বসতে জেনীর মনে পড়ছিল সৈনিকটার মুখ, যেন শুকনো বালি আর পাথর দিয়ে গড়া। রৌদ্রদগ্ধ আরব মানুষগুলি সামনেই বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে আছে। সে যেন দুটি কাঠের টুকরোর মধ্যে রাখা একটি কীলকখণ্ড। কোটটা বেশ ভালো করে হাঁটুর ওপর টেনে নেয় জেনী। শরীরটা তেমন ভারী-ভুরি নয়। মনে হ'ল, তার এই দীর্ঘছন্দ শরীরটি বহু মানবের চোখে তৃষ্ণা জাগিয়েছে। তার শরীরের এই উত্তাপভরা বিস্তারে, আহ্বানভরা পরিবেশে একটা শিশুর মুখের কথা মনে পড়ে, সেই উদ্ভাসিত মুখ মনে জাগে।

এইবারকার এই ভ্রমণের সম্পর্কে মনে মনে যে স্বপ্নের জাল রচনা করেছিল জেনী তা সার্থক হয় নি। মার্সেল যে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ব্যবসার সাফল্য চায় সে খবর পেয়ে জেনী আপত্তি করেছিল। সমুদ্রের ধারায়

যৌবন বেদনারসে উচ্ছল যে দিনগুলি মিলিয়ে গেছে তার কথা স্মরণে জেগেছে। তবু অলস স্বামীটির দিন কেটেছে—আধা ইউরোপীয় উপনিবেশের ছায়াঘেরা একটা ছোট্ট দোকানে সেখানে নানারকমের জিনিসপত্র গোছানো। আরবী পরদা আর সৌখীন আসবাবে দোকানটা সাজানো, ছোট্ট ঘরের মাঝে, আধ-খোলা বাতায়নের আলো-আঁধারিতে কেটেছে নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান নিস্তরঙ্গ জীবন। আকাশ, সমুদ্র সব কিছু কোথায় বিলীন, আজ সেসব ইতিহাসের মতো প্রাচীন। একমাত্র অর্থ ছাড়া জীবনের যে আর কোন অর্থ আছে সে কথা মনে নেই মার্সেলের। জেনীকে সে অনেক দিয়েছে অকৃপণ হাতে, তবু জেনীর মনে হয় জীবনের যা আদিম দাবী তা পূর্ণ করতে পারল কই। প্রখর তপনতপ্ত দিনগুলি ক্লান্ত কঠিন মধুর নিবিড় অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

দোকানের দৈনন্দিন বেচাকেনা আর হিসাবনিকাশের ভিতর কত সময় কেটে গেছে। জেনীর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার খাতিরে মার্সেল তার পসরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কখনও দক্ষিণের উঁচু অঞ্চলে। আরব ধনী এবং মার্সেলের মাঝে কোনও দালাল রাখে নি, সরাসরি তাদের সঙ্গে কাজ করেছে। এই যাত্রায় জেনী আসতে রাজী হয় নি, তবু আসতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। গরম বাতাস, মাছির ভ্যানভ্যানানি আর নোংরা হোটেল থেকে ভেসে আসা মশলার গন্ধ তার কাছে অতি আতঙ্কের বস্তু। সে ভাবে নি যে এই শীতজর্জর, তীক্ষ্ণ হিমেল হাওয়ায় মরুর দীর্ঘশ্বাসের ভিতর পাওয়া যাবে একটা ধূলিরুক্ষ নতুন পৃথিবীর সন্ধান। সে মনে মনে তালবনে ঘেরা নরম বালি মাটির একটা সাম্রাজ্য কল্পনা করেছিল। চারিদিকে শুধু পাথর, পথে পাথর ছড়ানো, পাথরের স্পর্শে প্রতিটি ধূলিরেণুতে, পৃথিবীর পথে, সমুদ্রের বুকে, এর মাঝে কে আবার সাজিয়ে রেখে গেছে শুকনো ঘাস।

এরই মাঝে এক সময় বাসটা থেমে পড়েছে কখন। কল-কব্জার মেরামতি প্রয়োজন। দরজাটা খুলে ড্রাইভার নেমে গেল। খোলা দরজার ফাঁকে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বাসের ভিতর প্রবেশ করতেই যাত্রীরা সব আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মুখ ঢেকে নেয়, এরা সব্বাই আরবী। জেনী বাইরে তাকিয়ে দেখে চারপাশে আপাদমস্তক আবৃত একদল লোক স্থাণুর মতো বসে আছে, তাদের মুখে একটা নিঃসীম শূন্যের নিরাসক্ত দৃষ্টি, তারা ভেড়া চরায়, নির্নিমেষ নয়নে বাসটার দিকে চেয়ে আছে। বাসের ভিতর বাণীহীন স্তব্ধতা।

যাত্রীরা মাথা নত করে শোনে এই প্রান্তরের বুকে ভেসে আসা শৃঙ্খলমুক্ত মরুদানবের উদ্দাম নৃত্যের ধ্বনি। ড্রাইভার আবার দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে এসে নিজের আসনে বসল, বাস চলতে শুরু করল।' সেই ধূলিরুক্ষ মেষপালকের দলের ভিতর থেকে কার একটা শীর্ণ হাতের আন্দোলন কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

জেনীর চোখের পাতা ক্লান্তিতে বুজে আসছিল। সহসা লক্ষ্য করল তার সামনে লজেন্সের উন্মুক্ত বাক্স প্রসারিত, হাসিমুখে সামনে ধরেছে সেই সৈনিক, ধন্যবাদ দিয়ে একটা লজেন্স্ জেনী হাতে তুলে নেয়। পকেটের ভিতর বাক্সটা রেখে সৈনিক চোখ ফিরিয়ে নেয়, সেই সঙ্গে মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। মার্সেলের দিকে তাকায় জেনী, সে তেমনই ধূমায়িত কুয়াশার পানে চোখ মেলে আছে। বাসটা চলেছে অবিরাম। ক্লান্ত যাত্রীর দল প্রাণহীন পুতুলের মতো নিঃশব্দে বসে রয়েছে।

ধীরে ধীরে মরুকাননের মাঝে অনেকগুলি মাঠকোটার বস্তির ভিতর পথ করে নিয়ে বাসটা ভিতরে ঢুকছে। এক পাল ছোট ছেলেমেয়ের দল বাসটার চারপাশে চক্রাকারে ঘুরে মজা উপভোগ করছে। তেমনই উদ্দাম হাওয়ার ঢেউ বইছে। এই বাড়িগুলোর দেওয়ালে বালির দাপট আটক পড়ছে, মেঘম্লান আকাশের তলায়, এই কলরবমুখরিত প্রাঙ্গণে ব্রেকের কর্কশ আওয়াজ করে বাসটা পোড়ামাটির এক তোরণের নীচে দাঁড়ায়। এতক্ষণে বাসের বাইরে এসে দাঁড়াতে পায় জেনী। তার দেহটা যেন ঝিমঝিম করছে। মার্সেল বাস থেকে তার মালপত্তর নামাচ্ছে, যেন কতকাল লাগছে, এই কাজটুকু শেষ করতে। হঠাৎ নজরে পড়ে এই কুটিরশ্রেণীর এক ফাঁকে সব কিছু ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পীতরঙের মিনারচূড়া, আর বাঁ দিকে চোখ ফেরাতেই দেখা যায় মরুকাননের তালগাছের সুনীল বনরাজি। তার মনে হয় ঐখানেই যাওয়া থাক, এই শীতজর্জর প্রখর প্রহরে তার দেহলতা যেন থরথর করে কাঁপছে! মার্সেল কোথায়! এদিকে এগিয়ে আসছে সেই সৈনিক। সে তাকে অভিবাদন জানায় না, তার দিকে তাকিয়ে তার মুখে শিষ্টতার হাসিও দেখা যায় না, কোথায় মিলিয়ে গেল। আর জেনীও মার্সেলকে ফেলে রেখে হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়ে। হোটেলের কর্মচারী রাস্তার দিকের একটা ঘর দেখিয়ে দেয়। প্রায় নিরাভরণ, বালির আস্তরণে মোড়া সেই ঘরটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায় জেনী। চুনকাম করা দেয়াল থেকেও

যেন শীত ঝরে পড়ছে। কোথায় রাখা যাবে হাতব্যাগ, কোথায় মেলে দেবে এই দেহভার, কিছুই ভেবে পায় না জেনী। হয়তো এমনই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নয়তো শুয়ে—কিছুই বোঝা যায় না। হাতের আঙুলের মাঝে ব্যাগ তেমনই ভাবে ধরে ছাদের পাশে একটা ফাঁক দিয়ে আকাশের একটা প্রান্তে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জেনী। এ যে তার কিসের প্রতীক্ষা তা বোঝে না। নিদারুণ নিঃসঙ্গতা আর প্রখর হিমবায়ু তাকে কাতর করে তুলেছে। তার মন থেকে যেন কিছুতেই একটা ভার নামিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, সেখানেও যেন দিনের আকাশখানা মেঘে-মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। রাস্তা থেকে মার্সেলের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, সেই ধ্বনি কিন্তু জেনীকে সচেতন করে না, সব কিছু সে ভুলে গিয়ে যেন এক স্বপ্নলোকে পৌছেচে। বাতায়ন পথে ভেসে আসছে এক অশান্ত নদীর তরঙ্গধ্বনি, আর তালবনের মাঝ থেকে একটা দুরন্ত হাওয়া ছুটে আসছে। সেই হাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে জেনী। হাওয়ার এই অশান্ত গর্জন আর নদীর কলোচ্ছ্বাস যেন প্রবলতর হয়ে ওঠে, চারদিক ভরে যায় সেই সুরের প্লাবনে। দিশেহারা জেনী কল্পনার অঞ্জন চোখে মেখে দেখতে পায় তালবনের উন্মুখ আকুলতা, ঝড়ের স্পর্শ টুকু পাওয়ার জন্য তারা যেন বাহু মেলে দিয়েছে। জেনীর ক্লান্ত চোখে আবার তন্দ্রার জড়িমা নেমে আসে। তার পা দুটি জড়িয়ে শীতের স্পর্শ শরীরে প্রবাহিত হচ্ছিল, শীতের সেই সুতীব্র তীক্ষ্ণতার মধ্যেই জেনী দাঁড়িয়ে থাকে, তার দেহ ভারী হয়ে উঠছে, সারা-দেহের ক্লান্তিতে আপনাকে সে মেলে দেয়।

জেনী স্বপ্ন দেখছে অনেক তালবনের, অনেক আকুল তালবনের, আর সে জড়িয়ে আছে তার নিজের স্বপ্নে, সে যে সময় কিশোরী ছিল সেই সোনালি অতীতের স্বপ্ন!

রুটি, মাংস আর কফি দিয়ে ভোজন সমাধা করে সবাই বেরিয়ে এল। অনেক দর কষাকষি করে মার্সেল একটা আরবী ছেলেকে ঠিক করেছে, তার তোরঙ্গটা সে বয়ে নিয়ে যাবে। ধূলিময় তরুবীথিকার মাঝখান দিয়ে পথ চলেছে চকের দিকে। পিছনে চলেছে জেনী। ওদের জন্য উদাসীন ভঙ্গিতে আরবীরা পথ ছেড়ে দেয়। মৃত্তিকাগঠিত দুর্গের সিংহদ্বার পার হয়ে পার্ক, তোরণদ্বার আর বিপণিশ্রেণী পিছে ফেলে ধীরে ধীরে এক বৃদ্ধ আরবীর দোকানঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পুদিনায় ভেজানো চায়ের গন্ধ নাকে ভেসে আসে, দরজার প্রান্তে এসে দাঁড়ায় জেনী। বৃদ্ধ আরবী চায়ের মজলিসের

সিংহাসনে সমাসীন, সেখান থেকে সে নামে না। আত্মবিশ্বাসহারা মানবীর মতো ম্লান হাসি হেসে, কপাল থেকে কম্পিত ঘামের স্পর্শ মুছে নিয়ে তোরঙ্গ বোঝাই পণ্যদ্রব্য দিয়ে আবার ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়। মার্সেল এতক্ষণে বলে, এরা নিজেদের একেবারে স্বয়ং খোদাতালা মনে করে, অথচ ব্যবসা করে যায়। দিন দিন সব যা হচ্ছে—বুঝলে জেনী।

জেনী নীরবে এগিয়ে চলে। হাওয়ার সেই উদ্দামতা এখন শান্ত। মেঘঢাকা আকাশের গায়ে কয়েকটা যেন গর্ত হয়েছে, হিমজর্জর নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য সেখান থেকে ভেসে আসছে। পিছনে গুলবাগ। সেটা পিছনে রেখে সংকীর্ণ পথ ধরে ওরা চলেছে। প্রাচীরগাত্রে ঝরা গোলাপের পাপড়ি। পথের ওপর পড়ে আছে কীটদষ্ট বেদানা। বস্তির বাতাসে শুকনো ধুলো আর কফির ভুরভুরে গন্ধ, কাঠকয়লার ধোঁয়া, ছাগল আর নুড়ি পাথরের বোটকা গন্ধ। পথ চলতে চলতে পা দুটো ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসে জেনীর, এদিকে স্বামীর মনটা যে খুশিতে ভরা তা বুঝতে পারে জেনী। বুড়ো আরবীর দোকানে তেমন সুবিধা না হলেও অন্যত্র ব্যবসাদারিতে ঠকতে হয় নি। মার্সেল সোহাগভরে ডাকছে জেনীকে। স্বামীর আকাশ-কুসুমের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে নিতান্ত যান্ত্রিক ভঙ্গিতে সাড়া দেয় জেনী।

দলটি এবার আর এক পথ ধরে শহরের মাঝামাঝি এক বাগিচার ধারে এসে পৌছায়। একজন আরবী আভিজাত্যের গর্বিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসে। মার্সেল সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন কিছুর দিকে সে তাকায় না। নিরাসক্ত ভঙ্গি, তোরঙ্গটাও তার চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। তাই তাড়াতাড়ি হাতল ধরে ট্রাঙ্কটা টেনে নেয়। লোকটা তেমনই উদ্ধত ভঙ্গিতে চলে যায়। জেনী মার্সেলের আশাহত মুখের দিকে চেয়ে দেখে। মার্সেল বলছে, এরা সব যেন হাত দিয়ে মাথা কাটতে পারে, এমনই মেজাজ হয়েছে আজকাল। জেনী নিরুত্তর। আরবীটার ঔদ্ধত্যে সকলের মন বিষিয়ে উঠেছে। সব আনন্দ সহসা ম্লান হয়ে যায়। জেনীর মনে হয় ছুটে পালায়। মনে জাগে পিছনে ফেলে আসা ফ্ল্যাটের স্মৃতি। মনে পড়ে হোটেলের ম্যানেজারের সুপারিশ, দুর্গের ছাদে দাঁড়িয়ে গোটা মরুভুমির দৃশ্য দেখা যায়। মার্সেল কিন্তু ক্লান্তির দোহাই পেড়ে নিরস্ত করেছিল। তারপর জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার না-বলা বাণীর গভীর আকুলতা লক্ষ্য করে বলেছিল, বেশ তো চল না, যাওয়া যাক।

হোটেলে তোরঙ্গটা রাখতে গেল মার্সেল।

হোটেলের সামনের সেই রাস্তাটার ওপর দাঁড়িয়ে জেনী ভাবে, এই জনারণ্যে একটিও রমণীর মুখ দেখা যায় না, অথচ কেউ তো তার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে না। রৌদ্রদগ্ধ কতকগুলি শীর্ণমুখ ও বুভুক্ষু চোখ জেনীর দিকে চোখ মেলে থাকে, অথচ তারা তাকে দেখছে না। জেনীর মনে হয়, এরা সবাই একসূত্রে বাঁধা, বাসের সেই সহযাত্রী সৈনিক আর এই সব আরবী মানুষ, সবাই অহংকারে ভরা, ওর দিকে স্পষ্ট না তাকিয়েও কায়দা করে মুখটা এ দিকেই রেখেছে। শ্রান্ত শরীর নিয়ে আকুল এই নিঃসঙ্গ মেয়েটির চার পাশে ঘুরে ওরা চলে যায়। জেনীর অন্তরে একটা আকুলতা জেগে ওঠে, এ সবের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি চায়, মুক্তি চায়; ডানা মেলে দিতে চায় মহাশূন্যে। কেন? এখানে আমি এ ভাবে থাকব কেন? তারপর দেখা গেল মার্সেল তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

অপরাহ্ণ বেলায় দুর্গের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে ওরা। আকাশ তখন নীলিমায় নীল, যবনিকা স্তব্ধ মহাকাশ মৌনতায় মগ্ন। সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা আরবী তাদের গাইডের কাজ করার আবেদন জানায়। এর কোন প্রয়োজন নেই, সে যেন জেনীর আগে থেকেই জানা। সে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে দাঁড়ায় প্রখর আলোর প্রাঙ্গনে। শুষ্কতায় ভরা গহীন মরু পারাবার। মরুকানন থেকে মরুবিজয়ী তরঙ্গ ভেসে এল, তা যেমন শুচিতায় স্নিগ্ধ, তেমনই বৈচিত্র্যে ভরা। তাদের এই গতিবিভঙ্গের সঙ্গে বাতাসের গতিও প্রবল হয়ে ওঠে দীর্ঘছন্দ বাতাস। পায়ে চলার শব্দ স্বচ্ছ আলোকের মধ্য থেকে বৃত্তাকারে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে, তালবনের পিছনে প্রসারিত সুদূর দিগন্তের নিবিড় ঐশ্বর্যের দিকে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওরা। জেনীর মনে হয়, সব কান্না মিলে যেন একটা নিদারুণ আর্তনাদে পরিণত হ'ল। সেই শব্দ তরঙ্গ ভরে দেয় সকল শূন্যতাকে, তারপর এক সময় হারিয়ে যায় তার প্রাণশক্তি, তখন সে সব নীরবতা সামনে রেখে মিশে যায় অন্তহীন পারাবারের গহীন অন্ধকারে।

পূব থেকে পশ্চিমের এক বাঁকা রেখার দিকে সোজা তাকিয়ে থাকে, দৃষ্টিপথে কোন বাধা নেই। নীচের দিকে দেখা যায় অজস্র আরবী বসতি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো, তাদের ছাদে লাল লঙ্কার গাছে অজস্র

ফল ধরেছে। চারপাশে কেউ কোথাও নেই, বসতির ওপার থেকে কফির বীজ ভাজার সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়, আর শোনা যায় অর্থহীন কার পদ পরশন ধ্বনি। দূরে তালবন দেখা যায়, মাটির দেয়াল দিয়ে চৌকস ভাবে ভাগ করা। সেই তালের বনের মাথায় হাওয়ায় হাহাকার। অনেক দূরে সুদূর দিগন্তে দেখা যায় ধূসর গৈরিক পর্বতমালা। মরুকাননের পশ্চিম দিকটায় একটা তালবন, তার চারপাশে মজা নদীর বেড়। সেই অঞ্চলে কালো কালো অসংখ্য তাঁবু পড়েছে, আর তাঁবুর চারপাশ ঘিরে বেড়াচ্ছে উটের সার, এখান থেকে তাদের ছোট দেখাচ্ছে। একটা ধূলিরুক্ষ পরদার পটভূমিতে আঁকা বিমূর্ত শিল্পীর ছবির মতো এই সংকেতময় চিত্রের মধ্যে আছে একটা সুগভীর অর্থ, সেই রহস্যের সমাধান করতে হবে। মরুর উর্দ্ধলোকে আছে অখণ্ড স্তব্ধতা, সুদূর বিস্তারী এক নভোঅঙ্গন।

রেলিংয়ে সারা দেহ ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে জেনী। তার ঠিক সামনেই যে নিবিড় শূন্যতা প্রসারিত তা থেকে সে যেন আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে নি। এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়েও দাঁড়িয়ে আছে জেনী, পাশেই আছে মার্সেল, শীতে কম্পমান। সে ফিরে যেতে চায়, কি যে দেখার আছে এখানে কে জানে! তবু জেনী দিগন্তভরা সেই শূন্যতা থেকে চোখ তুলে নিতে পারে না। তার চোখ পড়ে আছে অনেক দূরে, যেখানে আকাশ মিশেছে মাটির বুকে। ধরণীর আর গগনের নিবিড় মিলনের সেই দৃশ্য দেখছে জেনী। তার মনে হয় এই মহালগ্নে সেই গোপন সংবাদটি জানা গেছে, যার প্রতীক্ষায় আছে সেই বস্তুটির শেষ পর্যন্ত সন্ধান মিলেছে। অপরাহ্ণের অন্তিম আলোকরেখা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে, মধুগন্ধে ভরা স্নিগ্ধ সমীরণ। সূর্যের সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে যেন তরল হয়ে আসছে, স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল আর ঠিক এই এই উজ্জ্বল মুহূর্তে কালের গতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল এক ক্লান্ত রমণী, সময় আর অভ্যাসের সরু মোটা দুই তারে যে জটিল জট বেঁধেছিল তার জীবনে সেই গ্রন্থি যেন সহসা খুলে গেল। তাঁবুর দিকে তাকিয়ে ছিল জেনী, ওখানে যারা থাকে তাদের সে কখনও দেখে নি, সেই নিবিড় অন্ধকারে এখন আর প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। যাদের কখনও চোখে দেখে নি তাদেরই ভাবনায় মন ভরে ওঠে জেনীর। এই ঘরছাড়া বিরাগী মানুষের দল জীবনজোয়ারে ভাসমান হয়ে ভেসে চলে এক সুবিশাল মহাসাগরে। অনেক দূরে, চোখের আলোর বাইরে, সহস্র যোজন দক্ষিণে প্রথম দিনের প্রাণগঙ্গায়

অভিসিঞ্চিত বনরাজি ঘেঁষে ওরা চলেছে। অনাদি কালের সূচনা থেকে কঙ্কালসার শুকনো পৃথিবীর অসীমে মানুষের বিরতিবিহীন পরিক্রমণ। উদার প্রসন্নতায় জীবন ওদের কাছে ধরা দেয় নি। তবু ওরা সসাগরা পৃথিবীর মালিক, সম্পদবঞ্চিত কিন্তু কারও কাছে মাথা নত করে নি।

এই অকারণ ভাবনা তার অন্তরকে একটা বিষণ্ণ বিষাদে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, চোখে ঘুম নেমে আসছে, কিন্তু এর পিছনে যে কি হেতু তা জেনী অনুমান করতে পারে না। তার মনে হয় এই সম্পদের সম্ভাবনা তার জীবনেও তো ছিল, কিন্তু সে আর সম্ভব হবে না, কিংবা সেই অসম্ভবই আজ এই মহালগ্নে সম্ভব হতে চলেছে। আবার চোখ তোলে সীমাহীন স্তব্ধতার দিকে, মহামৌনের আলোক পারাবারের পানে। আরবী পল্লীর কেন্দ্র থেকে যে ধ্বনিতরঙ্গ উঠছিল তা হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল সেই সঙ্গে থেমে গেল বিশ্বসংসারের গতিভঙ্গি। এই আশ্চর্য মুহূর্তটুকুর ওপারে নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা। জীবন এখানে নির্বাণলাভ করেছে, কামনাবিরহিত নির্বাণ, সবখানেই বেদনার, বিস্ময়ের ক্রন্দন জেগে উঠেছে, এ কান্না শুধু ওর একার নয়

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য মিলিয়ে গেল সন্ধ্যাবেলার দীপ্তবহ্নি সূর্য। আলোর আলোড়ন শুরু হ'ল, তার রঙ পরিবর্তন হ'ল, এ রঙ গোলাপের রঙ। অস্তাচলের এই গোলাপী আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূব দিগন্তে ঘনায়মান হয়ে ওঠে ধূলিমলিন অন্ধকার। রাতের প্রথম প্রহরের কুকুরের ডাক শোনা যায়, সেই ধ্বনি শীতের হাওয়ায় প্রকম্পিত হয়ে জেগে ওঠে।

জেনী বোঝে তার দেহ শীতের স্পর্শে কম্পমান। মার্সেল বিরক্ত গলায় বলে, তোমার এই পাগলামির জন্য কি ঠাণ্ডা লেগে মারা যাব! একটা দুর্বিসহ ক্লান্তিতে তনু, মন আচ্ছন্ন। দেহের সেই অসহনীয় গুরুভার থেকে মুক্ত হয়ে জেনী আর এক জগতে ফিরে আসে। আগের সেই জগতে তার মনে হচ্ছিল, কেন সে এমন মোটা? কেন এত দীর্ঘ তার দেহ? কেন তার গাত্রবর্ণ এত শুভ্র? সেই যে পৃথিবী সে পৃথিবীতে চলতে পারে একটা শিশু, একটা কোমলা কিশোরী, সেই শুখনো মানুষটা, আর প্রচ্ছন্ন শৃগাল। এখন সে কি আর করবে? আপনাকে নিয়ে যাবে ঘুমের জগতে? মৃত্যুর পথে এ ছাড়া কি আর করা যাবে, কি করতে পারবে?

আপনাকে টেনে নিয়ে এল জেনী হোটেলের ভিতর, সেই ঘরটায়।

মার্সেল শীত আর শ্রান্তিতে বিহ্বল। জেনীর যেন জ্বর এসেছে মনে হয়। বিছানায় দেহটা মেলে দেয়, খাটটা যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মার্সেল আলোটা নিভিয়ে শুয়েছে। সে হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। জেনীকেও ঘুমিয়ে পড়তে হবে। জানলার ভিতর দিয়ে ভেসে আসে শহরের গুঞ্জন, প্রাচীন পরিচিত গানের সুর। জেনীকে এবার ঘুমতে হবে। সে এক এক করে গণনা করছে, কালো কালো অসংখ্য তাঁবু। চোখের পরদায় সারি সারি উট ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর অন্তরের অভ্যন্তরে পাক খাচ্ছে নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। আমি এখানে এসেছি? কেন এলাম? কেন? এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই জেনী একসময় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একটু পরেই জেনীর ঘুম ভেঙে গেল। সীমাহীন স্তব্ধতা চার পাশে। শহরের সীমানায় রাতের এই স্তব্ধতা ভেদ করে শোনা যায় কুকুরের কাতরানি। শীতের জন্য জেনীর দেহ কাঁপছে, স্বামীর উষ্ণ স্পর্শের আশায় সে ঘেঁসে আসে, আধো ঘুম আধো জাগরণের পাতলা মেঘের মাঝে ভেসে বেড়ায় জেনী। এই অবস্থায় নিরাপত্তার দিক থেকে মার্সেলের দেহটাই নিরাপদ বন্দর, তাই জেনী সেই বন্দরেই নোঙর ফেলে, তাকে নিবিড় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে। কথা বলছে, সে কথা হাওয়ায় ভাসছে, মুখ থেকে ঠিক যেন বেরিয়ে আসছে না, কথা থামে না, কিন্তু কি যে সেই কথা তার এক বর্ণ বোঝা যায় না। স্বামীর দেহের উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করে জেনী, এমনই চলেছে বিশ বছর ধরে, শুধু এইটুকু পাওনা। সন্তানহীনা রমনীর নিঃসঙ্গ দিনগুলির মাঝে এই পাওয়াটুকুও পাওয়া। মার্সেল তাকে হয়তো ভাল-বাসে না, হয়তো তার ভালবাসায় ঘৃণা মেশানো আছে, সে ভালবাসার আকৃতি কি এমন গম্ভীর ঃ কেমন ওর মুখখানা? ওর মুখটা কেমন যেন? এই ভালবাসাবাসি অন্ধকারের মধ্যে, এ ভালবাসা স্পর্শের ভালবাসা, অনুভবের ভালবাসা। কিন্তু এই অন্ধকারের এইটুকু ভালবাসা ছাড়া আরো ভালবাসা আছে কি? মার্সেলের সান্নিধ্যটুকুরও প্রয়োজন আছে, এই প্রয়োজনটুকুর জন্য সে বেঁচে আছে। এই জ্ঞানটুকু তাকে বাঁচিয়েছে, প্রয়োজনের জ্ঞান। অনেক দিন, অনেক রাত, রোজ রাত, এই মানুষটা বুড়ো হতে চায় না, চায় না মরতে, আর ওর মুখে সেই এক ভাবের অভিব্যক্তি, (এই অভিব্যক্তি অন্য মানুষের মুখেও ফুটে উঠতে দেখেছে জেনী), সেই সব উন্মাদের এই অভিব্যক্তি, যাদের মুখ ঢাকা আছে জ্ঞানের মুখোসে, যতক্ষণ

না পরিপূর্ণ উন্মাদনা তাদের গ্রাস করে ততক্ষণ মুখের এই মুখোস খসে না। এর পর ওরা আপনাকে বিসর্জন দেয় কোন এক নারীদেহের গভীরে। কামনা-বিরহিত জীবনের ভয়ঙ্করকে সেই গহনে সমাধিস্থ করতে পারে, নিশীথ নৈঃশব্দ্য আর নিঃসীম শূন্যতা এই ভয়ঙ্করের ভয়াল আকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে।

জেনীর মনে হয় মার্সেল তার স্পর্শের প্রভাব থেকে মুক্তি চায়। তাকে ভালবাসে না। ততখানি তার ভয় যেটুকু জেনী নয়। হয়তো অনেক পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সঙ্গপরশহারা রাত কে কাটাতে পারে? যারা আছে প্রবাসে, আর ছন্নছাড়া মানুষের দল, প্রতি রজনীতে মরে তারা গভীর মরণে, মৃত্যু তাদের শয্যাসঙ্গিনী। স্বামীর আদরের নামটি মনে মনে উচ্চারণ করে জেনী। মার্সেল কি চাপা কান্নায় গুমরে উঠছে? জেনী তাকে ডাকে, বার বার তার প্রিয় নাম ধরে ডাকে। স্বামীকে সে চায় তার শক্তি, তার খেয়াল, সব কিছু জেনী চায়। মরণকে সে ভয় করে, (এই মৃত্যুভয়কে জয় করলেই বোধহয় সুখ পাওয়া যায়)। না--না—না—সরে আসে জেনী, স্বামীর কাছ থেকে আপনাকে সরিয়ে নেয়, জয় করার শক্তি তার নেই, কোন দিন সে পারবে না জয় করতে, সুখও তার জীবনে আসবে না, মৃত্যুকে সে বরণ করবে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করার আগেই। জেনী সেই অন্ধকারে দেখতে পায় কুড়ি বছর ধরে যে ভার সে বয়ে চলেছে তার চাপে আজ সে রুদ্ধশ্বাস, এই শ্বাস থেকে ত্রাণ চাই। এই প্রচণ্ড সংগ্রামে সকল শক্তি প্রয়োগ করেও মুক্তি নেই, কিন্তু আর কেউ যদি নাও চায়, মুক্তি তার চাই-ই।

•

জেনী উঠে বসে, অনেক দূর থেকে কিসের যেন ডাক শোনা যায়, কিন্তু যে ধ্বনি ভেসে আসে সে শুধু মরুকাননের ক্লান্ত কুকুরের ক্রন্দন। জেগে ওঠার সঙ্গে শোনা যায় তালবনের হাওয়ায় ভেসে আসা জলধারার মৃদু মর্মর। এ হাওয়া আসছে দক্ষিণ থেকে, যে দক্ষিণাঞ্চলের আকাশ পরিবর্তনহীন, যেখানে বসেছে মরুভূমি আর নিবিড় নিশার পরিণয়সভা, সেই বাসরের কাছে জীবন গতিহীন, সেখানে নাইকো জরা, নাইকো মৃত্যু—হাওয়ার এই তরঙ্গস্রোত কখন গতিহারা হয়ে শুকিয়ে যায়, ঠিক অবস্থাটা জানা যায় না। জেনী ভাবে তার কানে কি কোনো আহ্বান সত্যি পৌঁছেচে, এমন এক আহ্বান যাতে সাড়া দেওয়া যেত, অথবা তার মুখরতা নীরব করে দিতে পারত, আজ এখনই

যদি এই আহ্বানে সাড়া না দেওয়া যায় তাহলে কোন দিন কি এর অর্থ জানা যাবে, জেনী মনে মনে ভাবে। এখনই, এই মুহূর্তে এই ডাকে সাড়া দিতে হবে, নিঃসন্দেহে এছাড়া আর কিছু করার নেই—

জেনী শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবে, যাবে কি যাবে না, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাপপর ধীরে ধীরে রাত্রির সেই অনন্ত নৈঃশব্দ্যে পা বাড়িয়ে দেয়, জেনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

তালবন আর আরবী বস্তীর মাথা ছাড়িয়ে ঘন কালো আকাশের গায় অসংখ্য নক্ষত্রের রত্নহার আর জনমানবহীন পথ ধরে অতি বেগে চলেছে জেনী। সারাদিন সূর্যের সঙ্গে হামলা করে হিমেল হাওয়া এখন লড়ছে নিশীথিনীর সঙ্গে। প্রখর শীতের বাতাস জেনীর অন্তরকে যেন দহন করছে, দুর্গের দিকে এগিয়ে চলেছে জেনী। পথের বাঁকে নিরালা আলোর দীপ্ত চমক, তিনটে আলো তার পিছনে মাথা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আবার মিলিয়ে গেল। অনেক কষ্ট করে, প্রাণপণে এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে, দুর্গের সেই ছাদে এসে দাঁড়াল জেনী। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার, শীতে অবশ দেহ মেলে দাঁড়াল ছাদের উপর। তারপর নির্নিমেষে রাত্রির সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে।

জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ বা অন্য কিছু জেনী বা এই নৈঃশব্দ্যকে চঞ্চল করে না একটুও। হিমস্পর্শে কখন যেন পাথরগুলি বালুকণায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। একটু পরে জেনীর মনে হয় আকাশ যেন অতি ধীরে আবর্তিত হচ্ছে, প্রখর শীতের এই নিরালা রাত্রে কত নতুন তারা ফুটে উঠেছে, তারা যেন সব সময়েই জেগে উঠেছে, জ্যোতির্লোকের এই অসংখ্য জলন্ত কণিকা আবার দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই আলোর আলেয়া জেনীর চিন্তাধারা আচ্ছন্ন করে তোলে। মনে হয় সে যেন এই গতিবিভঙ্গের সঙ্গে তাল রেখে সবল হয়ে উঠছে। এই যে অতি ধীর গতিবেগ এ যেন তার মনের প্রতীক, তার মনের মধ্যে চলেছে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্ব হিমবন্যা ও কামনার কান্নার। তার চোখের উপর এক একটি নক্ষত্র মরুর বুকের রুক্ষ পাথরের মাঝখানে পড়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে, আর এই খসে পড়া তারার আলোয় হৃদয়ের শতদলের এক একটি পাপড়ি ভাসিয়ে দিচ্ছে। অতি দ্রুত নিশ্বাস নেয় জেনী, এই মুহূর্তে সে ভুলে যায় শীতের কাঁপন, অন্যজনের দুর্বহ ভার আর জীবনের তুচ্ছতা এবং পাগলামি। এতকাল যে-ভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আত্মগোপন করেছে ভয়কে

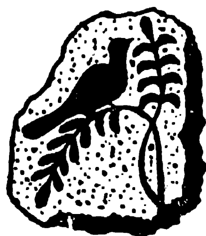
হয় করার জন্য,, তার হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য, এতদিনে সেই লুকোচুরির অবসান ঘটেছে। এই সঙ্গেই জেনী পায় উৎসের সন্ধান, তার তনুতে তনুতে প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হয়, উদ্ভিদ যে প্রাণরস আহরণ করে রবিরশ্মি থেকে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে এই অপসৃয়মান আকাশপারাবারের পানে চোখ মেলে রইল জেনী, কবে এই শ্রান্ত পাখনা শান্তিপারাবারে পাবে দুদণ্ডের সুখ, স্তব্ধ অন্ধকারে হবে পুনরুজ্জীবন, তারই প্রতীক্ষায় জেনী আকুল হয়ে আছে। জ্যোতিঃসমুদ্রের শেষ তারাগুলি একে একে মরুসাগরের মহাশূন্যে ডুবে যায়। তারপর আসে শান্তি ও স্বস্তি। রাতের শিশির এক অসহ্য কোমলতায় ভরে দেয় অশান্ত নারীকে। জেনীর শরীর এখন আর হিমের তাড়নায় আকুল নয়, অনেক মৃদু হয়ে এসেছে তার আঘাত। একটা সকরুণ আলাপে জেনীর স্বপ্নস্বরূপ আকুল হয়ে ওঠে, তার সমগ্র অস্তিত্বের প্রাণকেন্দ্র অবগাহন করেছে নিশির শিশিরে, এর একটু পরেই এই মাটির মানবীর তপ্তাপ দেহের ওপর আকাশ চন্দ্রাতপ বিস্তার করে।

জেনী ঘরে ফিরে এল।

মার্সেল এখনও তেমনই ঘুমিয়ে আছে। জেনী আবার শয্যায় আশ্রয় নেয়। মার্সেল যেন চাপা কান্নায় গুমরে উঠছে। তারপর অস্পষ্ট কত কথা বলে যায়। জেনী বুঝতে পারে না তার একবিন্দু।

একটু পরে উঠে গিয়ে মার্সেল ঘরের জোর পাওয়ারের আলোটা জ্বেলে দেয়, তারপর বোতল থেকে একটু সোডা নিয়ে মুখে ঢেলে দেয়।

আবার বিছানায় প্রবেশ করার সময় মার্সেল জেনীর দিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে, এতক্ষণে জেনী কান্নায় ভেঙে পড়েছে। জেনী কাঁদছে, আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছে না সে। জেনী শুধু বলছে, না না, কিছু নয়, এ সব কিছু নয়।



উইলিয়ম সারোয়ান

বাঁচার মত বাঁচা

বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে, ছেলেটি মেয়েটিকে বল্‌ল, বাঁচার মত বাঁচা বল্‌তে আমি বলি—

এই বলে সে আর একটু হুইস্কি গলায় ঢালে।

তারপর প্রশ্ন করে, বিরক্ত করছি না ত'?

মেয়েটি বলে, তুমি জানো আমি বিরক্ত হই না।

আমি যে কথা বল্‌ছি তাতে তোমার তেমন মন নেই। ছেলেটি বলে।

—খুব মন আছে আমার। মন দিয়েই ত' শুন্‌ছি। মেয়েটি জবাব দেয়।

ছেলেটি বলে, বাঁচার মত বাঁচা বল্‌তে আমি যা বলছিলাম, বাঁচতে গেলে সব সময়—এই বলে সবটা হুইস্কি গলায় ঢেলে ছেলেটা ওয়েটারকে ডাকে—

আরো দুটো লাগাও, সে হুকুম করে।

ছেলেটাকে বেশ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট এবং সুখী দেখাচ্ছে, এদিকে আবার সে বিভ্রান্ত এবং ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত।

সে বল্‌ল—আমি যা সব সময় বলি, বাঁচার মত বাঁচা একে বলে।

মেয়েটি কোনও কথা বলে না। কারণ তার শঙ্কা জাগ্‌ছে মনে ছেলে মাতাল হয়ে পড়বে, তারপর ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনেক হাঙ্গা পোয়াতে হবে, তা ছাড়া মেয়েটির ভয় সে নিজেও ত' একটু মাতাল হ উঠ্‌তে পারে। মেয়েটি যদি কিছু বলে আর ছেলেটি যদি ওর ভয়ের কথ বোঝে তাহলে হয়ত নম্র হবে আর নয়ত নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে উঠে চড়া গলা কথা বল্‌তে সুরু করবে।

সহসা ছেলেটি বলে উঠে, আমার কিন্তু এ সব ভাল লাগে না, আমার দুঃ হয় বল্‌তে, কিন্তু আমি আর তোমাকে একটুও ভালবাসিনা।

এই নিছক সারল্যের জন্য মেয়েটি কৃতজ্ঞ, মনে মনে কিন্তু আহত, এক মুহূর্তে আর কোনো কথা না বলেই মেয়েটির উঠে যাওয়ার বাসনা হয়, আর জীবনে কখনো ছেলেটির সঙ্গে সে দেখা করবে না। অথচ সে জানে তা হবার নয়।

এই একটা কাজ, (মেয়েটি বেশ জানে), সে কখনও করতে পারবে না।